

1953

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

চতুর্দশ বর্ষ : : ত্রিতীয়, ১৩৫৯

১৩২

পৃষ্ঠা

বিষয় সূচী

অধ্যক্ষের মৌলি	১
কলেজ প্রসঙ্গ	২
সাক্ষেত্রিক মাহিতি	১৬
বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও রবীন্দ্রনাথ	২৪
প্রষ্টার মৃত্যু (কবিতা)	২৯
বৃষ্টচূড়ি (কবিতা)	৩১
পদ্মা (কবিতা)	৩২
কলনা	৩৩
ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান	৩৭
ম্যাপ (কবিতা)	৪২
ভুলের শর্প (কবিতা)	৪২
ছুটির গান (কবিতা)	৪৩
বিজ্ঞাপনের অর্থনীতি	৪৫
ব্যাংকডম	৫১
গ্রন্থপরিচয়	৫৬
আৰাদের কথা	৬৩
EDITORIAL	১
THE CONCEPT OF ECSTASY IN THE LIGHT OF SANSKRIT POETICS	৯
SINCLAIR'S NEW EPISTEMOLOGY	১২
A TRIP TO TOTOPARA	১৭
SATISH C. MUKHERJEE AND THE DAWN MAGAZINE	২০
AS CIVILISATION ADVANCES POETRY DECLINES	৩২
MIRZA RAJA JAI SINGH	৩৪
LINGERING IMPERIALISM	৪১
AN APOLOGY FOR STATISTICS	৪৯
THE PRINCIPAL'S WELCOME ADDRESS	৫৩

চিত্রসূচী

প্রাণপন্থি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ	}
প্রাণপন্থির শুভাগমন সংক্রান্ত চিত্রাবলী	
COLLEGE UNION COUNCIL (1951-52)	}
ছাত্রাবাসে রাষ্ট্রপতি	
"THE CALL OF THE WILD"	
"A QUIET COVE"	

ব্রিত্তাপন

প্রতি সংখ্যার জন্য টাঁদার হার :—

ভারতের মধ্যে (ডাকমাশুল নিয়ে)	২॥০ টাকা
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য—	১॥০ "
ভারতের বাইরে	৪ শিলিং

সাধারণতঃ বৎসরে ছুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপকসমূহের নিকট এই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত এবং অন্যান্য বিবিধ রচনা সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য, প্রকাশিতব্য রচনাগুলির প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার মান ও গ্রন্থিতের উপযোগী হওয়া বাছনীয়। একান্ত বিশেষজ্ঞ-বোধ্য রচনা এই পত্রিকার পক্ষে অনুপযোগী। উপযুক্ত ডাকটিকিটসমেত শিরোনামালিখিত লেফাফা সঙ্গে না পাঠালে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

রচনা পাঠাতে হলে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি পালন করা প্রয়োজন :—

কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তলিপিতে অথবা টাইপ করে লেখা দিতে হবে। শব্দ এবং পংক্তির মধ্যে এবং পৃষ্ঠার শিরোদেশে এবং বায়পার্শ্বে উপযুক্ত ব্যবধান থাকা আবশ্যিক। বিভিন্ন সঙ্কেতের পরিবর্তে সংখ্যালঁকরণ পদটীকা বাছনীয়। লেখকের সম্পূর্ণ নাম দিয়ে রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে।

পত্রিকাসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশনাবিভাগের সম্পাদকের সঙ্গে পত্রালাপ করা যেতে পারে।



SIGNED PORTRAIT PRESENTED BY RASTRAPATI DR. RAJENDRA PRASAD
AS A MEMENTO OF HIS VISIT TO HIS OLD COLLEGE ON THE 24TH DECEMBER, 1952.



The Rastrapati, with some of his old fellow-boarders, in the room he occupied for some time at the
Eden Hindu Hostel, where he was in residence from 1902 to 1907.

[By courtesy of the "Hindusthan Standard".]

The Rastrapati greeted with conch-shells as he enters the Reception Pandal accompanied by the Principal.

(By courtesy of the "Amaria Bazar Patrika".





Sri Debendranath Sen, a former Professor of History in this College and an old teacher of the
Rastrapati, speaking at the reception.

[By courtesy of the "Hindusthan Standard".]



The Principal presenting the Rastrapati with a specially bound volume of the Presidency College Register.

{Photo. : D. Saha, First Year Arts.



The General Secretary presenting the address of welcome on behalf of the College Union.

{Photo. : B. Barman, Third Year Arts.



The Rastrapati replying to the addresses of welcome.

By courtesy of the "Hindusthan Standard".



A View of the Reception Pandal.

[By courtesy of the "Hindustan Standard".

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

কাল্পন, ১৩৫৯ ০০

চতুর্দশ বর্ষ

০০ মার্চ, ১৯৫৩

অধ্যক্ষের বাণী

আমাদের এই মহাবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার পর একশত ছত্রিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং ইহার যে বিভাগটি পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে পৃথক স্বতালাভ করে, আগামী আড়াই বৎসরের মধ্যে তাহার একশত বৎসর পূর্ণ হইবে। এই কলেজের সন্দীর্ঘ জীবনের মধ্যে ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৯০২ সালে একটি ন্তৃন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণীত হয়। একটি তৃতীয় আইন অধুনা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এই বৎসরের মধ্যেই কার্যকৰী হইবে।

এই কলেজের বিরাট ঐতিহ সর্বজনবিদিত, কিন্তু ইহার ভবিষ্যতের কথা আমাদের অধিক চিন্তনীয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতির জন্য স্বত্বাবতঃই আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন অধিক স্থানসংকুলান এবং আর্টস্বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের গবেষণার সুবিধা ও ব্যবস্থা—বিশেষ করিয়া অর্থনীতির গবেষণার জন্য পৃথক কতকগুলি ঘর ও উপস্থিতি আয়োজন। ইহা ছাড়া, বর্তমান ভারতে বিজ্ঞানশিক্ষা ও ও গবেষণার স্থচনাক্ষেত্রে এই কলেজ প্রসিদ্ধ। আমাদের এখনকার বিজ্ঞানবিভাগগুলি যদিও গবেষণার স্থানাম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলেও বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে বর্তমান স্থানাভাব উন্নতির পথে বাধা স্থষ্টি করিয়াছে।

যাঁহারা দেশে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নকামী, এই কলেজের ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য তাঁহাদের ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। স্বতরাং, কলেজের অগ্রগতির জন্য এবং তাহার স্থানাম অক্ষণ রাখিবার জন্য প্রয়োজন একটি স্বচিহ্নিত পরিকল্পনা। শীত্রই এইরকম একটি পরিকল্পনা কলেজ হইতে প্রস্তাবিত হইতেছে। সরকারের আশামুরূপ সাহায্যের উপর ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে।

শ্রীয়তীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

কলেজ পত্রিকা

আমাদের এই কলেজপত্রিকা চতুর্দিশ বর্ষে পদার্পণ করল। কলেজের প্রাচীনত্বের আভা আজ এর উপর এসে পড়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই বিশাল বিদ্যায়তনের প্রশংসন প্রাণ-প্রবাহের বিষয়ে একটা সামগ্রিক চেতনাস্থষ্টি করার প্রয়াস, তার প্রচলনগতিকে বাণীর সার্থক মাধ্যমে একটা পরিমিত কিন্তু অথও রূপদানের প্রচেষ্টা এই পত্রিকাকে নিজস্ব দীপ্তির মহিমাতেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার প্রদীপলালিন নির্বর্থক নয়। এই কলেজের কর্মসূচিটা সহজেই চোখে পড়ে—বিচিত্র উপকরণের বাহ্যে তার উক্ত প্রকাশ। কিন্তু হওয়াটাই আশ্রয়ের আদর্শ, করাটা নয়। তাই কর্মের মুখ্য আবেষ্টনীর বাইরে স্বচ্ছ মুক্তির আনন্দে খেখে হয়ে-ওঠার অবকাশ, সেখানে প্রদীপ জেলেছে এই পত্রিকা—এই প্রাচীন মহাবিদ্যালয়ের বাহ্য কর্মচার্কল্যের অন্তরালে তার নিঃসঙ্গ, নিভৃত সন্তানে আলোকিত করার ভার সে নিয়েছে।

গ্রন্থিবৎসর এই প্রাচীন পত্রিকার রূপায়ণের দায়িত্ব হয় এক নৃতন সম্পাদকের উপর। তার পক্ষে এটা শুধু প্রকাশনার নয়, একটা প্রকাশের অভিজ্ঞতা। প্রাচীন এবং নবীনের সময়ে সজীবতার সংক্ষর হওয়া সত্ত্ব, কিন্তু যে ঐতিহ্য এই পত্রিকার পোষণ-পদ্ধতি, তাকে অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব এই সাধনার মুখ্য অঙ্গ। স্বরের বিদ্যু, এ দায়িত্ব সম্পাদকের একার নয়—সেই ঐতিহ্যের সার্থক প্রকাশের প্রচেষ্টাতে এই কলেজের অন্তীত বা বর্তমানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাঁদেরই সহায়ত্ব আছে তাঁদের সকলের। বিলম্বে সরুষ্ট আজ্ঞাপ্রকাশের দৈন্য ও প্রাণি থেকে মুক্তিলাভের আশায় নববর্ষে এই পত্রিকা তার সকল কল্যাণকারীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁদের পূর্ণসহযোগিতা প্রার্থনা করেছে। এ শুধু নববর্ষের শুভেচ্ছাবিনিয়ন নয়—যে প্রদীপকে আমরা প্রতীকরণে বরণ করেছি, তার স্থির এবং অক্ষয় জ্যোতিতে আহ্বান্তাপনের আহ্বান।

* * *

এক একটা বৎসর চলে যায়—চাতুর্দশের আগমন ও নির্গমনের মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনার উপচার্যমান স্তুপ নিয়ে কলেজের জীবন বহে চলে। সেই প্রবহমণ স্নেতের উপরে তার ঐতিহ্যবৃত্তি মাঝে মাঝে ভেসে উঠলেও তার সমস্কে সমষ্টিগত চেতনা অশ্বুট থেকে যায়। যতই আমরা কালের সামনের দিকে এগিয়ে চলি একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন সন্তাৱ বিষয়ে চেতনা ততই বিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক, এমন কি নির্জীব হয়ে আসতে থাকে। সেই চেতনা এবং তারই সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব এবং আদর্শকে সংজীবিত করে তুলতে হলে আহ্বানিক অবগাহনের জন্যে মাঝে মাঝে অতীতের গর্তে নিহিত মূল উৎসের পথে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। এবার বর্ষশেষে এই রকম প্রত্যাবর্তনের এক উপভোগ্য ঝর্ণেগ আমরা

পেয়েছিলাম। গত ২৪শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ডক্টর বাজেন্দ্রপ্রসাদের আগমন আমাদের কলেজের বর্তমান ছাত্রসমাজের পক্ষে একটি বিশেষ উপলক্ষিসমূক্ত অভিজ্ঞতা।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র এবং অধ্যাপকের বিপুল সমাবেশে এই দিনের মিলনোৎসবের পিছনে ছিল আয়োগপ্লাকার প্রেরণা। যুগান্তরের পরিপ্রেক্ষণিকায় এই অনুষ্ঠানের উপর যেন যান্ত্রিক মর্যাদা এসে পড়ে—যেন আমরা এক স্মৃতির ঘন্টের আয়োজন করলাম, তার প্রধান পুরোহিত হলেন আমাদের সেদিনের অতিথি রাষ্ট্রপতি। যে যুগে এই মহাবিদ্যালয়ের স্বাক্ষর নিয়ে অনেকেই জাতীয় সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন—ঝাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এই সংগ্রামের অগ্রতম বিজয়ী বীর আমাদের রাষ্ট্রপতি—সেই যুগের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বেদন যেন দেই যুগের দীক্ষাকে উপলক্ষি করার প্রেরণা দেয় আমাদের। পরীক্ষাশালায় এবং কর্মজীবনে সাফল্যের চেয়ে উচ্চতর আদর্শে আমাদের ছাত্রদের উৎসাহ নাই এ বৃক্ষ ধারণা হয়তো আজ প্রচলিত। কিন্তু আমাদের কলেজেরই ছাত্র ছিলেন রাষ্ট্রপতি এবং ছাত্রজীবনের সর্বোচ্চ সম্মানও তিনি লাভ করেছিলেন। জাতির ভাগ্যগঠনে আমাদের দেরা ছাত্রদের অংশ থাকবে না এ বৃক্ষ নৈরাশ্য ভিত্তিহীন।

জাতির কল্যাণে এই কলেজের শিক্ষার্থুক অবদানের ঐতিহ্য অক্ষণ্ট রাখতে হলে তার আত্মপ্রসাদের দাবী মেটানো দরকার। এই অর্ধশতাব্দীতে জাতির রাজনৈতিক জীবনে যে যুগান্তর এসেছে শিক্ষাজীবনে তার বাপক সাড়া মেলে নাই। এই অসংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য পাই আমাদের এই প্রাচীন শিক্ষায়তনের বর্তমান সংকটে। বহুদিনের সংক্ষিপ্ত অভাবে এবং যুগোপযোগী উপকরণের গ্রয়োজনে এই কলেজের ব্যাপক প্রসারের সমস্যা আজ নিছক প্রাগের দাবীতে এসে দেকেছে। রাষ্ট্রপতি যখন তাঁর পুরাতন কলেজকে স্মরণ করে আমাদের মাঝে এলেন তখন কলেজের এই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে এই মিলনোৎসবের মধ্যে একটি প্রচন্দ অভয়পত্রী কল্পনা করা অসঙ্গত নাও হয়ে থাকতে পারে। শুধু অতীতের স্মৃতিপূজাই আমাদের সেদিনের উৎসবের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। জাতির ভাগ্যনিয়ন্তার উপস্থিতির দুর্ভ মুহূর্তে তাঁর এবং আমাদের মাতৃসমা বিদ্যাভূমির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা গোপন করা কঠিন এবং এই স্থপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের নীরব, অসহায় আবেদনকে স্ফুট করে তোলার প্রলোভন স্বাভাবিক। তিনি যে একজন পুরাতন ছাত্র, আমাদেরই একজন—এই চিন্তায় আশাসের আকর্ষণ আছে। এই প্রসঙ্গে কলেজের আত্মিকাশের আকাঙ্ক্ষা যিনি প্রথম দরদ দিয়ে অহত্ব করে তার সর্বাঙ্গীণ পরিবর্ধনের পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন সেই পুণ্যশ্লোক অধ্যক্ষ হেনরী জেম্স-এর 'কলেজ হল'-সংক্রান্ত একটি আবেদনের কথা মনে পড়ে। অবসরগ্রহণের অনেক পরে এই পত্রিকার চতুর্দশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় (মার্চ, ১৯২৮) তাঁর "The College Hall" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি উত্তর পাবার আশায় প্রশ্ন করছেন—“Is the idea that old Presidency College men might make a gift to the College of its

Hall of Assembly, an idle dream ? Or is it a true vision ?" যদি অধ্যক্ষ জেম্স তাঁর উদার মানসনেত্রে দেখতে পেতেন এই কলেজের একজন ছাত্র একদিন ভারতের রাষ্ট্রপতি হবেন তাহলে তাঁর উদ্বেগ হয়তো শান্ত হোত। আজ কলেজের সমস্যা অধ্যক্ষ জেম্স-এর সময়ের থেকে অনেক বেশী জটিল হয়েছে—তার যে দিকটা শুধু ধরণাড়ীর চাহিদা তার আয়তনও বিপুলতর। রাজপুরুষের দুর্ভ আচুক্লাই এক্ষেত্রে একমাত্র আশা এইরূপ প্রসিদ্ধি। তবু যা অধ্যক্ষ জেম্স সমগ্র প্রাক্তনছাত্রমণ্ডলীর নিকট প্রত্যাশা করতে যথেষ্ট সাহস পান নাই, আজ তার চেয়ে বৃহত্তর অভাবও মাত্র একজন প্রাক্তনছাত্রের ইচ্ছায় দূর হতে পারে এই আশা পোষণ করা হয়তো নির্যাক নয়। স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও আজ অর্দীম নয়, তবু রাজেজ্বের কল্পকৃত্বাত্তিতে নির্ভরশীল হওয়াই আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ—এ ক্ষেত্রে আমাদের সৌভাগ্য যে বর্তমান দুর্দশায় আমাদের এই ভিক্ষা সন্তানের কাছে মাতার অভাবমোচনের প্রার্থনা অপেক্ষা অধিক অসম্ভব নয়।

*

*

*

কিছুদিন আগে অধ্যাপকমণ্ডলী থেকে অবসরগ্রহণ করেছেন দুজন ধাঁদের সদ্বে এই কলেজের যোগ ছিল নিবিড় এবং দীর্ঘকালব্যাপী। গণিতবিভাগের স্থযোগ্য অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস ভড় সুনীর্ধকাল কলেজের পরিচালনাকার্যে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে এসেছেন আয়ব্যয় পরীক্ষার ভাববহনে অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও কর্মনির্ণায়ক পরিচয় দিয়ে। কর্মসচিবরূপে তাঁর দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রেমচান্দ-রাষ্ট্রচান্দ-বৃত্তিধারী এই সুনী অধ্যাপনায়ও স্বনাম অর্জন করেন। তাঁর বহুমুখী নৈপুণ্যের একটি মনোগ্রাহী নির্দর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একবার আমাদের কলেজের শিল্পকলাপ্রদর্শনীতে স্বহস্তে অঙ্কিত ছবি এবং উচ্চশ্রেণীর স্থানীয় দেখিয়ে ইনি সকলকে চমৎকৃত করেন। এই নীরব অঙ্কন কর্মীর অভাব আমরা বহুক্ষেত্রে নিয়ত অনুভব করি।

স্বায়নবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার সেনের অধ্যাপনায় ও গবেষণায় যাতি স্ববিদিত। Jute Chemistry-সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর মূল্যবান দান উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানাগারের বাইরেও ইনি বহুমুখী দক্ষতার অধিকারী। খেলাধূলায় তাঁর এত উৎসাহ যে গাজও তিনি কলেজের খেলার মাঠে আসতে ভোলেন না। ইনি নিজে খেলোয়াড় ছিলেন, বিশেষ করে ভালো ক্রিকেট খেলতেন। সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁর অধিকার আছে। ছাত্র-জীবনে ভালো অভিনেতা ছিলেন—কলেজের নাট্যাভিনামে তাঁর সোঁসাই উপদেশ বিশেষ উপযোগী হত। আমরা জেনে স্বীকৃত হলাম যে কলেজ থেকে অবসরগ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে Forensic Laboratory পরিচালকপদে নিযুক্ত করেছেন। স্মরণ হতে পারে, কিছুদিন আগে সরকারী অন্তরোধে তিনি বিলাতে Forensic Chemistry সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিদর্শন করে আসেন। নবপ্রতিষ্ঠিত Forensic Laboratory গড়ে তুলতে হবে তাঁকেই। আমরা তাঁর পূর্ণাঙ্গল্য কামনা করি।

শ্রীগুরুদাস ভড়ের অবসরগ্রহণে আয়ব্যয়পরীক্ষকের শুরুদায়িত্বার গ্রহণ করেছেন ভূতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়। গণিতবিভাগের গভীর ক্ষতি আরও বর্ধিত হয়েছে ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ মিত্র খড়গপুরে Indian Institute of Technologyতে যোগদান করায়। অধ্যাপক ভড়ের স্থানে নবাগত ডক্টর নন্দলাল ঘোষকে আমরা সাদৃশ অভ্যর্থনা জানাই। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান সাময়িকভাবে পূরণ করছেন শ্রীকামিনীকুমার দে এবং তাঁর শৃঙ্খলানে এসেছেন শ্রীশামাসাধন মুখোপাধ্যায়। Astronomical Observatoryর স্থূলোগ্য সহকারী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস সুদীর্ঘকাল কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করলেও কলেজ তাঁকে ছেড়ে দিতে পারে নি। গত জুলাই মাসে আংশিকভিত্তিতে তিনি পুনর্নিযুক্ত হয়েছেন।

রসায়নবিভাগের প্রধান অধ্যাপকের স্থান পূরণ করেছেন কৃতী অধ্যাপক ডক্টর প্রতুলচন্দ্র রঞ্জিত। জামসেদপুরের National Institute of Sciencesএর ভূতপূর্ব Research Fellow, ডক্টর শ্বেতীরচন্দ্র সোম এই বিভাগে যোগদান করেছেন। ক্ষণগ্রন্থ থেকে এসেছেন শ্রীজগদীশ রায়।

খড়গপুরে Indian Institute of Technologyতে যোগদান করার জন্য আরেকজন অধ্যাপক আমাদের কলেজ থেকে বিদ্যুগ্রহণ করেছেন। তিনি হচ্ছেন উত্তিদ্বিত্তাবিভাগের অধ্যাপক, ডক্টর নীরদকুমার সেন। এঁদের মত স্থূলোগ্য অধ্যাপকের অভাবে আমাদের কলেজের গভীর ক্ষতি। কিন্তু নবপরিকল্পিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তোলার কাজে আমাদের কলেজের বিশিষ্ট অংশ থাকবে এটা খুবই সন্দেহ।

উত্তিদ্বিত্তাবিভাগের লেকচারার শ্রীশামাশক্তির ভট্টাচার্য সম্পত্তি Indo-German Industrial Co-operation Scheme অন্যান্য পশ্চিম জার্মানীতে Bonn বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীনিরঞ্জন পাল। আজকাল বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভের যে নানারকম পরিকল্পনা হয়েছে তাঁর স্থূলোগ্য আমাদের পদার্থবিদ্যা-বিভাগের লেকচারার শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যও পেয়েছেন। তিনি আমেরিকায় Indiana প্রদেশের Notre Dame বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী গবেষকরূপে উচ্চশিক্ষালাভ করেছেন।

পদার্থবিদ্যাবিভাগে শ্রীবজেন্দ্রনাথ ঘোষের স্থান পূরণ করেছেন শ্রীহিমাংশুকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুশীলচন্দ্র সরকারের জায়গায় এসেছেন শ্রীরামবিহারী চক্রবর্তী। ভূতত্ত্ব বিভাগের স্থূলোগ্য সহকারী শ্রীবিনয়কুমার ঘোষ পদত্যাগ করায় তাঁর স্থানে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীকমলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

আমাদের কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই দেশের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষামূলক সমিতি বা অধিবেশনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে থাকেন। এই বৎসরে উল্লেখযোগ্য খবর এই যে, আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবারও বঙ্গীয় উত্তিদ্বিত্তাসমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং দর্শনের অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

গত ডিসেম্বর মাসে মহীশূরে অনুষ্ঠিত সপ্তবিংশতিতম দর্শনকংগ্রেসে Logic and Metaphysics শাখার সভাপতিত্ব করেন।

কলেজের সক্ষীর্ণ পরিধির বাইরে বৃহত্তর জ্ঞানসাধনায় আমাদের অধ্যাপকদের আগ্রহ কত গভীর তার প্রকৃষ্ট নির্দশন আমাদের ভূজ্ঞানবিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিশীরঞ্জন করের হিমালয়ের হিমবাহ-সমৃদ্ধীয় গবেষণায় আস্তানিয়োগ। তাঁরই নেতৃত্বে তিনি বৎসর গবেষণার পর ভারতীয় ভূগোলবিদ্গণ গত বৎসর পূর্ব-হিমালয়ে এক কোটি বৎসর পূর্বে বিশ্ববাপী হিমানীযুগের অস্তিত্বের ব্যাপক গ্রন্থ পেয়েছেন। এই বিচিত্র তথ্য আবিকারে শ্রীযুক্ত করের মূল্যবান অবদান আমাদের কলেজের গৌরবের বস্ত। আমরা তাঁকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করে তাঁর বৃহৎ গবেষণার সাফল্যাময় পরিণতি কামনা করি।

আমাদের কলেজের বিজ্ঞানশাখার নাম বিভাগে অস্ত্রাণ্ত বৎসরের অনুরূপ পদ্ধতিমূলক ও ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পরিকল্পনারূপীয়া বিবিধ গবেষণা-কার্য পরিচালিত হচ্ছে। গত ‘প্রতিষ্ঠা দিবসে’ প্রকাশিত ‘প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসাদিকী’তে ১৯৫২ সালে এই কলেজে পরিচালিত গবেষণাকারীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

* * *

গত সংখ্যায় ১৯৫২ সালের আই, এ এবং আই, এস্সি পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে আমাদের কলেজের কৃতী ছাত্রদের নাম প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পাসের হার জানানো সম্ভব হয় নি। আমরা পরে জেনেছি, এই দুইটি পরীক্ষায় আমাদের ছাত্রদের পাশের হার যথাক্রমে ৮৭.৩৬% এবং ৮৭.৩৬%। গত বি, এ ও বি, এস্সি পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক। বি, এ-তে প্রথমশ্রেণীর অনাস’ পেয়েছেন ৯ জন এবং বি, এস্সিতে ১৮ জন। আর্টসে স্নাতকদের মধ্যে আমাদের ইতিহাসের ছাত্র শ্রীমান্ত অশিনরঞ্জন দাশগুপ্ত দ্বিশান্বিত লাভ করে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। বিজ্ঞানে গণিতের ছাত্র শ্রীমান্ত স্বপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় আমাদের কলেজের এবং সন্ততঃ বিশ্বিতালয়ের সকল বিজ্ঞানপরীক্ষার্থীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। তাঁদের সাফল্যে আমরা গর্বিত। অর্থনীতি, ইতিহাস, গণিত এবং ভূতত্ত্বে আমাদের কলেজ শুধু প্রথমস্থান অধিকার করেছে তা নয়, প্রথমশ্রেণীর অনাস’ লাভ করেছেন অর্থনীতিতে তিনজন, ইতিহাসে তিনজন, গণিতে সাতজন এবং ভূতত্ত্বে সাতজন।

সংস্থাপ্রকাশিত ১৯৫২ সালের এম, এ ও এম, এস্সি পরীক্ষার ফলাফল যতদূর আমরা অবগত হয়েছি তাতে আমাদের কলেজ থেকে অন্ততঃপক্ষে এম, এ তে সাত জন এবং এম, এস্সিতে ছয় জন প্রথমশ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন। ইতিহাস, অর্থনীতি, ভূ-জ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞা, সংখ্যা-বিজ্ঞান এবং ভূ-বিজ্ঞান আমাদের কলেজ প্রথমশ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেছে। এবিষয়ে তথ্য অসম্পূর্ণ, সেইজন্য ক্রটি থাকা সম্ভব।

পরীক্ষার ফলাফলের পূর্ণতর বিবরণ অগ্রত্ব দ্রষ্টব্য।

* * *

আমাদের কলেজের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন অধ্যাপককে স্মরণ করে অভিনন্দনের শুভ-সূচনার স্বয়েগ এবার আমরা পেয়েছি। স্বামুদ্র্য ঐতিহাসিক শ্রীকুরুভিলা জ্যাকারায়ার সঙ্গে আমাদের কলেজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্বীকৃত। সম্প্রতি UNESCOর পরিকল্পিত মানব-জাতির ইতিহাসকলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। এই বিবাট ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ড (বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ব) রচনার ভার তাঁর উপরে গৃহ্ণ হয়েছে। তাঁর অনগ্রসাধারণ পাণ্ডিত্যের এই আন্তর্জাতিক সমাদরে আমরা গর্বিত। শিক্ষকজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে শ্রীযুক্ত জ্যাকারায়া দিল্লীতে পররাষ্ট্রদপ্তরের ঐতিহাসিক শাখার পরিচালকপদে অধিষ্ঠিত হন। সম্প্রতি আমরা জানতে পেলাম তিনি এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করছেন।

উল্লিখিত মানবজাতির ইতিহাসকলনকার্যে অংশ গ্রহণের জন্য আমাদের কলেজের একজন ষণ্যস্বী প্রাক্তনছাত্রও UNESCOর সাদর আমন্ত্রণ লাভ করেছেন। তিনি হচ্ছেন শুল্পসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। যে আন্তর্জাতিক কমিশনের হাতে UNESCO উক্ত গ্রহপ্রকাশের সম্পূর্ণ ভার দিয়েছেন গত বৎসরে অনুষ্ঠিত তার ভূতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মজুমদার সম্পাদকীয় সমিতির সদস্যপদে মনোনীত হন। আমাদের প্রাক্তনছাত্রের এই বিশিষ্ট সম্মানলাভে আমরা গৌরব অর্হতা করি। আমাদের কলেজের সঙ্গে শ্রীযুক্ত মজুমদারের সংযোগের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তিনি কলেজের পরিচালকসমিতির একজন প্রাক্তন সদস্য।

সম্প্রতি আমাদের দ্রুজন বিশিষ্ট প্রাক্তনছাত্রের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। শ্রীদিলীপ দেন শুধু আমাদের কুকুরী প্রাক্তনছাত্রই নন, এই কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন কিছুদিন। তিনি লণ্ঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ উপাধিপ্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় ঘোগদান করেছেন। তাঁর "Spenserian Imitations and Imitators: 1700-1771" শীর্ষক thesis-এর পরামর্শক ছিলেন Prof. B. W. Davies এবং Prof. James Sutherland —শ্রীযুক্ত সেনের মৌলিকগবেষণা এই দ্রুজন খ্যাতনামা অধ্যাপকেরই প্রশংসন্মা অর্জন করেছে। তাঁকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাই এবং তাঁর শিক্ষকজীবনে ঘোলাভ কামনা করি।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত ১৯৫১ সালের I. A. S. ইত্যাদি পরীক্ষার ফলাফলে আমাদের কলেজের যে সব প্রাক্তনছাত্রের সাফল্য ঘোষিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন এই পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক, শ্রীসুব্রীদ্ধনাথ গুপ্ত। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্টের পর তাঁরই উল্লেখে বাংলা-অংশের প্রাধিকারণে আমাদের কলেজ পত্রিকার নবরূপায়ণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। বর্তমান প্রচলনপটে বাংলা শিরোনামার রূপসংজ্ঞাও তাঁরই স্বত্স্তুচিত।^১ বল। বাহল্য, শ্রীযুক্ত গুপ্ত একজন নিপুণ শিল্পী। তাঁর সাফল্য আমাদের বিশেষ আনন্দের বস্তু। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা হইল।

*

*

*

১। প্রচলনপটের 'পন্থ-পদ্মীপ' লাঙ্গন ১৯২৯ সালে প্রাক্তনছাত্র শিল্পী শ্রীচারু রায় রূপায়িত করেন।

গত ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর সুবেদ্রনাথ দাশগুপ্তের মৃত্যুতে সমস্ত দার্শনিকসমাজ শোকাভিভূত। আমাদের কলেজের পক্ষে এই শোক অত্যন্ত গভীর। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দর্শনের অধ্যাপক ও মুখ্যাধ্যাপক এবং রবীন্দ্র-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতিকর্পে এই কলেজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তাঁর স্মৃতি আমাদের গর্বের বস্ত। ইংরাজী এবং বাংলায় রচিত অন্যন চলিগ্রাম গ্রন্থ—দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আয়োর্ধ্ব, নন্দনতত্ত্ব, সমালোচনা-সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং অবদানের আংশিক নির্দেশন। দেশে বিদেশে তাঁর বিরাট মনমূল প্রতিভা সমানিত হয়েছে—পাশ্চাত্য জগতে তাঁর খ্যাতি স্বীকৃত। জীবনের শেষভাগে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসরচনায় তিনি আত্মনিরোগ করেছিলেন—জীবনের শেষ দিনেও তিনি এই স্বীকৃত গ্রন্থের পক্ষমত্ত্বের উপর কার্য ব্যাপ্ত ছিলেন। এই জ্ঞানসাধকের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

গত জুন মাসে শ্রীমোহিতকুমার সেনগুপ্তের মৃত্যুতে এই পত্রিকার শৈশবের স্মৃতির উপর বিশাদের ছায়া এসে পড়েছে। তিনি দ্বিতীয়বর্ষের সম্পাদক ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি ভারতে এবং ভারতের বাইরে স্বনাম অর্জন করেন। ভারত সরকারের অর্থনীতি ও সংযোগ (Communications) দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারিকর্পে তাঁর কার্য-কুশলতা ভারতের নানাস্থানে স্বীকৃত। বিলাত এবং আমেরিকাতেও তিনি একাধিকবার ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। লঙ্গনে অনুষ্ঠিত Tele-Communications Conference-এ তাঁরই উত্তীর্ণিত পরিকল্পনা বর্তমানে কার্যকরী হয়েছে। ১৯৪৭ সালে তিনি Deputy Auditor-General-এর পদে উন্নীত হন। কিন্তু শুধু কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠাই মোহিতকুমারের একমাত্র পরিচয় নয়। ধীরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁর অসামান্য সৌজন্য ও চারিত্রিক মহৱ তাঁদের মৃৎ করেছে এবং মাঝে হিসাবে তাঁর স্মৃতি আমাদের বরেণ্য।

বিশিষ্ট আইনজ্ঞ পরলোকগত শুরু আব্দৰ রহিম আমাদের একজন প্রাক্তনচাতৰ। ১৮৮৬ সালে তিনি এই কলেজ থেকে এম. এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। বিচারকর্পে খ্যাতি অর্জন করে তিনি ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সাল অবধি Bengal Executive Council-এর সদস্য নির্বাচিত হন। পরে দীর্ঘকাল তিনি Indian Legislative Assembly-র সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৭ সালে অঞ্চলোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক D. C. L. উপাধি প্রদান করেন।

কলিকাতার মেয়ার এবং বিশিষ্ট সলিসিটার পরলোকগত শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র আমাদের কলেজের একজন কৃতী প্রাক্তন চাতৰ (১৯০৫-১৯১১)। ১৯১১ সালে তিনি এম. এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথমশ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বাংলাদেশের বিখ্যাত 'পঞ্জনেত্র গোষ্ঠী'র অংতর্মন্তবে গণ্য হতেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য-পার্টির তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের Incorporated Law Society-র তিনি সভাপতি ছিলেন। শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে এবং আইন ব্যবসায়েই

তাঁর পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। এই সহরে শিল্প এবং সংস্কৃতির সাধনায় তাঁর দান কর্ম নয়। সঙ্গীত এবং নাট্যকলার উৎসাহী রসগ্রাহী ছিলেন তিনি।

আমাদের কলেজের এই সকল বিশিষ্ট প্রাক্তনছাত্রদের মৃত্যুতে আমরা গভীর-শোক প্রকাশ করি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

* * *

গত কয়েক মাসের মধ্যে দেশে এবং বিদেশে কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষীর মৃত্যুতে শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জগৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আমাদের দেশে লোকান্তরিত হয়েছেন গান্ধীদর্শনের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা শ্রীকিশোরীলাল মসুরওয়ালা, যশোরী কবি ও সমালোচক শ্রীমোহিতলাল মজুমদার এবং একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্প্রতি দর্শন-জগতের ক্ষতিই বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্যদেশে বিখ্যাত ইতালীয় দার্শনিক Benedetto Croce এবং আমেরিকা-প্রবাসী স্প্যানিশ দার্শনিক ও সাহিত্যিক George Santayana এই দুইজন মনীষীর তিরোধান বিশেষ স্বর্ণসমাজের গভীর শোকের বিষয়। সাহিত্য-জগৎ থেকে অপসারিত হয়েছেন বিখ্যাত ফরাসী কবি Paul Eluard এবং বিংশশতাব্দীর অগ্রগণ্য ফরাসী সমালোচকদের অগ্রতম Charles Maurras। বিশিষ্ট শিক্ষাক্রতী, আইনবিশারদ এবং ভারতের Federal Court-এর সর্বপ্রথম গ্রান বিচারপতি Sir Maurice Gwyer-এর মৃত্যু আমাদের দেশের পক্ষে গভীর শোকাবহ। বহুদিক থেকে তাঁর কাছে এ দেশের ছাত্র ও শিক্ষকসমাজ গভীরভাবে ঝুঁটী। আধুনিক দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁরই অগ্রতম স্থাপ্তি। বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ् René Grousset-র মৃত্যুতে ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে গভীর ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কিছুদিন আগে UNESCO তাঁর উপর মানবজাতির ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ড (৪০০-১৩০০ খঃ অঃ) রচনার ভার দেন। ইংলণ্ডে পরলোকগত হয়েছেন প্রথ্যাত পদার্থবিজ্ঞাবিশেষজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্ এবং 'Nature' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক Sir Richard Gregory এবং Social Credit Plan-এর প্রবর্তক Clifford Douglas। Israel-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট Dr. Chaim Weizmann-এর মৃত্যুতে শুধু রাজনৈতিক জগতেরই ক্ষতি হয়েছে তা নয়। Dr. Weizmann বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও ছিলেন, রসায়নশাস্ত্রে তাঁর অবদান স্বপরিচিত। Jerusalem-এর অনতিকূরে Mount Scopus-এর উপর Hebrew University স্থাপনে তাঁর প্রচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Josef Stalin-এর সাম্প্রতিক মৃত্যু শুধু ব্যক্তিবিশেষের জীবনাবসান নয়, এই শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অগ্রতম। পৃথিবীর বহুস্তম রাষ্ট্রের অগ্রতম শৃষ্টি, ত্রাতা এবং কর্ণধারকরূপে তাঁর অবদান বিশ্ববিদিত—এখানে তা' উল্লেখের অপেক্ষা রাখেন। অসাধারণ রাষ্ট্রনেতা ছাড়া তিনি এক বিশেষ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন—মার্ক্সবাদের প্রামাণিক প্রস্তপজ্ঞীর মধ্যে তাঁর-লেখা ও বক্তৃতাগুলি এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে।

লোকান্তরিত মনীষীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রান্কাঞ্জলি অর্পণ করছি।

* * *

‘আমাদের অভাব অভিযোগ’ কলেজ-প্রসঙ্গের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পত্রিকার এই অংশটি একজন প্রাক্তন সম্পাদকের ভাষায় ‘সাময়িক বিলাপ’ (‘periodical wail’) -এই পর্যবসিত হয়, তবু এটা অপরিহার্য। কতকগুলি অভিযোগ এই পত্রিকার প্রায় জন্মকাল থেকে পুনরাবৃত্ত হয়ে আসছে। এ রকম বড়গোছের অভিযোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Assembly Hall-এর অভাব এবং ছোটখাটে চাহিদার মধ্যে আর্টস বিভিন্ন থেকে বেকার ল্যাবরেটরী পর্যন্ত একটি আচ্ছাদিত পথের জন্য আবেদন। প্রতি বৎসর এত নৃতন নৃতন অভিযোগ সংক্ষিত হতে থাকে যে এই পুরাতন অভিযোগগুলির সমন্বে ক্লাস্টি এসে পড়া স্বাভাবিক। তবু এই নৃতন এবং পুরাতন অভিযোগের মিশ্রসূপের ক্রমবর্ধমান ভার-বহন এই পত্রিকার সময়সীমা দায়িত্বের অঙ্গ। তবে স্থানাভাব ইত্যাদি কারণে শুধু যেসব অগ্রায় ও অভাবের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সচেতন নন অথচ যার আশু প্রতিকার একান্ত প্রয়োজন তাদের মধ্যে কতকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আমাদের কলেজ থেকে সংস্কৃত পঠনপাঠন তুলে দেওয়া অবশ্যই এই রকম একটি অভিযোগের বস্ত। ছর্টাগ্যক্রমে এ বিষয়ে অভিযোগ যথেষ্ট পুরাতন নয়, এই পত্রিকার পাতাতেও নয়। প্রায় তিন বৎসর আগে আমাদের এই শোচনীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে কিন্তু এ পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন দৃঢ় প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়নি বললেই হয়। কিন্তু সরকারের এই ব্যবস্থা নীরবে শিরোধার্য করে নেওয়ার আগে ভেবে দেখা দরকার এতে কলেজের ক্ষতি কর্তৃ হল।

স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সরকারের নির্দেশে দেশের প্রাচীনতম মহাবিদ্যালয় থেকে দেবভাষার চর্চা উন্মূলিত করে স্থানান্তরে রোপণের এই অশোভন উভারে প্রথমেই একটি ক্লাচ অসঙ্গতি প্রকাশ পায়, কারণ ব্রিটিশ বা লীগ আমলেও এই ধরণের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ছিল অচিকিৎসায়। শুধু এই একটি মাত্র বিষয় পড়ে আসার জন্য এই কলেজের ছাত্রদের যে অস্বীকৃতি ভোগ করতে হয় তাতে তাদের সংস্কৃত অধ্যয়নের আকর্ষণ বা আগ্রহ কমে আসে। নিরবেগ পরিবেশে সমাহিতভাবে সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রশংসন। কিন্তু এ কলেজে একটি ক্লাস থেকে প্রায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উর্বরশাসে অগ্য কলেজে উপস্থিতি জ্ঞাপন করেই তৎক্ষণাত এক প্রাচীন সাহিত্যে নিমগ্ন হবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই এই আদর্শের অহুকূল নয়। এই ব্যবস্থায় অরুধাবন অপেক্ষা ধাবনই অধিক হয়ে থাকে। আর এই ধাবন শুধু অবাঞ্ছনীয় মানসিক চাঞ্চল্যেরই পোষক তাই নয়, যানবাহনসংকল রাজপথ অতিক্রম করার সময় প্রায়শঃ বিপজ্জনক ও বটে। দারুণ গ্রীষ্মে ও অবিরাম বর্ষায় রাস্তা পার হয়ে দুই বাড়ীর মধ্যে ছোটাছুটি, দুই কলেজের ঘড়ির এবং ছুটির অনিলের দুরুণ বিশৃঙ্খলা, সংস্কৃতের ছাত্রদের অগ্রান্ত ক্লাসে বিলম্বে সসঙ্গোচ প্রবেশ এবং তার দুরুণ ক্লাসের কাজে বিষ্ণু—এই সব নানারকম বিভূতিগুলির কথা ভাবলে স্বতঃই মনে হয় সরকার যেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের আভাসে

বলে দিচ্ছেন, 'সংস্কৃত পড়ো না।' অথচ এই অস্তুত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল নাকি সংস্কৃত অধ্যয়নের উন্নিতিসাধন! সংস্কৃত পড়ার উৎসাহ এমনিতেই আজকাল ক্ষীণ হয়ে আসছে। তার উপর যে ব্যবস্থার ফলে প্রদেশের শ্রেষ্ঠ কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃতকে পাঠ্যবিষয়জগতে গ্রহণের উত্তম স্বত্ত্বাবতাঃই হ্রাস পায় তার সাহায্যে এই উদ্দেশ্য কিভাবে এবং কর্তৃত্ব সাধিত হবে বোরা কঠিন।

এ ছাড়া, সংস্কৃত কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের সংমিশ্রণের ফলে যে ব্যাপক বৈষম্যের স্ফুর্তি হয়েছে তার কথা ভাবলে এই পরিকল্পনার বৃহত্তর ব্যর্থতা উপলব্ধি করা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে যেসব ছাত্র প্রবেশলাভ করেন তাঁদের প্রয়োজনের মান যে সাধারণের থেকে ভিন্ন একথা মেনে নেওয়া যায়। ফলে এই কলেজে যেসব ক্লাসে সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যোগদান করেন সেই সব ক্লাসে অধ্যাপক এক সমস্তার সম্মুখীন হন। তিনি যদি তাঁর নিজের ছাত্রদের কথা ভাবেন তাহলে তাঁকে ক্লাসে উপস্থিত অত্য এক শ্রেণীর ছাত্রদের উপরে করে পড়াতে হয়। এতে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের কোন উপকারণই হয় না। আবার যদি অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের উপকারে আসতে চান তাহলে তাঁকে স্বাভাবিক স্তর থেকে নেমে আসতে হয়—এতে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা অত্যন্ত থেকে ধান। নিয়ত শিক্ষার এই ভিন্নমানের দ্বন্দ্বে অধ্যাপক এবং ছাত্র উভয়েই ব্যর্থতার ক্ষাণ্টিকে স্বীকার করে নেন। শিক্ষার উন্নতমানের যে ঐতিহ্য আমাদের গর্বের বস্ত তার এই নীরব অবক্ষয় গভীর আক্ষেপের বিষয়।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা এই যে অস্তুতঃপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি, এ পাস কোর্সের সংস্কৃতপাঠ মেন আমাদের কলেজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রাচীন শিক্ষায়তনে দেবভাষার শুভ্য আসনের অকল্যাণ আংশিকভাবেও দূর হোক।

লাইব্রেরি সমষ্টে অভিযোগ 'কলেজপ্রসঙ্গে' নৃতন নয়। এই লাইব্রেরি আমাদের গৌরবের বস্ত এবং সেইজন্য এই মূল্যবান সম্পদের অবহেলা অসহ। যেখানে ব্যাথা সেখানে ব্যারবার হাত পড়ে। সরকারী কলেজের অঙ্গ হয়ে থাকা এই লাইব্রেরির উন্নতির পথে সহায়ক না হয়ে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী কর্তৃত্বের চাপে লাইব্রেরিকে অসহায়ভাবে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তার ছাঁটি উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

লাইব্রেরিতে অনেক মূল্যবান ছন্দোপ্য বই আজ প্রাতান জীর্ণ হতে চলেছে। সেগুলির সংরক্ষণের জন্য নৃতন বাঁধাইএর প্রয়োজন। প্রতিদিনই এই বকম বইএর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সরকারী কলেজ বলে বই বাঁধাতে পাঠাতে হয় আলিপুরে সরকারী দফতরী-খানায়। দেশবিভাগের পর তু বছর ধরে দফতরীখানায় বিশৃঙ্খলার দরুণ কলেজ থেকে বই বাঁধানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারপরেও প্রার্থনা প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হয়, শেষে একসঙ্গে পঞ্চাশটির বেশী বই বাঁধানো যাবে না এই আদেশ আসে। অনেক আবেদন নিবেদন করে এই একদফতর প্রেরণযোগ্য বইএর সংখ্যা একশত করানো হয়েছে। এই বই বাঁধিয়ে ফিরতে

সময় লাগচে এক বছর থেকে দু বছর। যতক্ষণ না একদফা বই বাঁধিয়ে আসচে ততক্ষণ অন্য কোন বই পাঠ্যনো যাবে না। উপস্থিতি লাইব্রেরিতে হাজার সাতেক বই-বাঁধানোর জন্মনী প্রয়োজন। বর্তমান হারে এই সব বই বাঁধাতে সময় লাগবে সত্তর থেকে একশো চালিশ বছর। স্থানীয় দক্ষতাদের বই বাঁধাতে দেওয়ার অনুমতির জন্য বহু অফিস করা সত্ত্বেও উর্বরতন কর্তৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া যায় নি। কিন্তু এতে যে বহু পুরাতন দুপ্রাপ্য বই ন্তৰ বাঁধাই এর অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়ে সরকারেরই মূল্যবান সম্পত্তির অপূরণীয় ক্ষতি হবে উর্বরতন কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে উদাসীন।

লাইব্রেরির সম্পত্তি নষ্ট হতে দেওয়ার আর এক উপায় উর্বরতন কর্তৃপক্ষ উদ্বাবন করেছেন আর্টস লাইব্রেরিতে বই রাখার বর্তমান অন্তুত ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে। ষাটকসে আলো-বাতাসের পথ রুদ্ধ—বছর পাঁচিশ আগে বই রাখার জন্য স্লিপগ্যালারীর ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু খেয়াল হয়নি আলো-বাতাস চলাচলের বন্দেবস্ত করা দরকার। এই অবহেলার ফল এখন আমরা ভোগ করছি—বল্কি জায়গায় গাদা থেকে অনেক মূল্যবান বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরির কর্মচারীদের স্বাস্থ্যহানিও হচ্ছে এখানে বসে কাজ করাতে। কিছুদিন আগে একজন বিশ্বস্ত কর্মদৰ্শক কর্মচারীর অকালমৃত্যুর অগ্রতম কারণ এই বক্ষ অস্থায়কর পরিবেশে দিনের পর দিন কাজ করে যাওয়া। এই ধরণের ঘটনায় অগ্রগত কর্মচারীদের মধ্যে ভৌতি ও উত্তমহীনতার সঞ্চার হয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য হয় বৎসরের অধিক আবেদন নিবেদন চলছে। দেয়ালে বড় বড় গৰ্ত করে বায়ুপ্রবেশের উভতর ব্যবস্থার পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়েছিল। অবশ্যে ১৯৫১ সালে মার্চের শেষ সপ্তাহে অভ্যন্তরে পাওয়া গেল। কিন্তু তখন সরকারের আর্থিক বৎসর শেষ হতে আর দিন সাতেক বাকী। সরকারী কলেজ, অতএব এসব কাজের মালিক হলেন P. W. D.—তাঁরা অবশ্যই জানালেন সাতদিনে কিছু করা সত্ত্ব নয়। পরের আর্থিক বৎসরে আবেদন করে আবার অভ্যন্তরে পাওয়া গেল। এবার P. W. D.র লোকেরা এসে আবিস্কার করলেন পরিকল্পনায় কিছু কারিগরী গলদ আছে, অথচ পরিকল্পনাটি ছিল তাঁদেরই রচিত। পরিকল্পনাসংশোধনের জন্য সেই যে তাঁরা চলে গেছেন আর কোন সাড়াশব্দ নেই। ইতিমধ্যে বই যথেচ্ছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকারী কলেজের লাইব্রেরির এমনিই সৌভাগ্য।

গত কয়েক বৎসর ধরে বিশ্বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের গেজেটপ্রকাশে বিলম্ব ধৈর্যের মাত্রা অতিক্রম করে চলেছে। এই বিলম্বের একটা নমুনাই যথেষ্ট হবে—১৯৫১ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত বি, এ এবং বি, এস. সি পরীক্ষার ফলাফল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে। যাদের বি, এ পাশ করার পরেই কর্মসংস্থানের চেষ্টা করতে হয় বা যাঁরা তখনি কর্মজীবনে প্রবেশ না করলেও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা স্থির করতে ইচ্ছুক হন তাঁদের আশু প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য এই গেজেট ছাড়া আর কোথাও মেলে না। পরীক্ষার যে মোটামুটি ফলাফল প্রথমে প্রকাশিত হয় তাতে পরীক্ষাক্ষীগণের স্থানান্তরে,

বৃত্তিলাভ, পদক বা পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদির কোন বিবরণ থাকে না। এই সব খবরের জন্য যদি এতদিন অপেক্ষা করতে হয় তাহলে বহু ছাত্রের ভবিষ্যৎ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বিড়ম্বনার মূলেও আছে সরকারী হস্তক্ষেপের অবশ্যত্বাবী কুফল। সরকারীপ্রেসের উপর গেজেট প্রকাশনার ভার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজকে এই বিপর্যয়ে জড়িত করেছে। আমাদের প্রার্থনা, অথবা বিলম্ব না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রেস থেকে পরীক্ষার ফলাফলের গেজেট ছাপানোর ব্যবস্থা হোক।^১

বাংলাদেশের ছাত্রদের বিভিন্ন পরীক্ষায় ব্যাপক এবং ক্রস্ত অবনতি লক্ষ্য করে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃমণ্ডলী উদ্বেগাকুল হয়ে উঠেছেন। Public Service Commissions এর কাছে তাঁরা ইদানীং এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানও করেছেন। এই পত্রিকার বজত-জয়ষ্ঠী সংখ্যায় খ্যাতনামা প্রাক্তন অধ্যাপক ত্রীহিরণ্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় “Presidency College—1924-1938” শীর্ষক প্রবন্ধে ১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে নামাদিকে ব্যয়সংকোচ ও ছাঁটাই সহেও আমাদের কলেজের অধ্যাপক সংখ্যা অক্ষুণ্ণ থাকার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—“It has enabled us to separate the honours classes entirely from the pass and to inaugurate a scheme which aims at giving special assistance to promising under-graduates who intend to appear in the public service examinations after taking their degrees.” এই পরিকল্পনা সেই সময় কিছুদূর কার্যকরী হয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু বর্তমানে এর অস্তিত্ব নেই। যখন এই পরিকল্পনা উন্নতিবিত হয়েছিল তখনকার চেয়ে এখন এর প্রয়োজন অনেক বেশী। কারণ, প্রথমতঃ শিক্ষার মান অনেক নেমে গেছে; দ্বিতীয়তঃ, Public Service Commissions এখন কর্মসংস্থানের অনেক বেশী রাস্তা খুলে দিয়েছে। আমাদের কলেজের সেরা ছাত্রদের অনেকেই I. A. S. প্রত্নতি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে চান। গত কয়েক বছর এই সব পরীক্ষার ফলাফল আমাদের কলেজের পক্ষে নৈরাশ্যজনক। উল্লিখিত প্রবন্ধে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী মন্তব্য বর্তমান সমস্যা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—

Candidates appearing in these examinations from Bengal are handicapped for want of proper coaching facilities and it is in the fitness of things that Presidency College with its splendid resources should take the lead in this matter.

আমরা কর্তৃপক্ষকে অতীতের পরিকল্পনাকে অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় কার্যে পরিণত করার কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করি।

*

*

*

১। বিশ্ববিদ্যালয়ে সঞ্চালিত এম., এ এবং এম., এস.সি পরীক্ষার ফলাফলে কতকগুলি বিষয়ে পরীক্ষাক্রমের ক্রমিক স্থান নির্দেশ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এইটাই সঠিক প্রাণী। অস্ত্র সমষ্ট বিষয়ে এবং অনাস্ম পরীক্ষাগুলির সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা বাস্থনীয়।

‘অভাব অভিযোগে’র দীন আবৃত্তির মধ্যে একমাত্র সামুন্দৰ্য পাওয়া যায় এই ভেবে যে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষপদ যাঁরা অলঙ্কৃত করেছেন তাঁদের অনেকেই কলেজের বৃহত্তর অভাবের সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেছেন—ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য পরলোকগত অধ্যক্ষ জেমস। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের নবকলেবেরের স্বপ্ন দেখেছিলেন—কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের আকস্মিক উৎপাতে তাঁর উত্তীর্ণে পরিকল্পনার অপযুক্ত ঘটে। ১৯২৫ সালে বিশ্বযুদ্ধের দুঃস্পন্দনের ঘোর যথন অনেকটা ফিরে হয়ে এসেছে তখন প্রতিষ্ঠা-দিবসে লর্ড লিটনের বাণীতে সংজীবনী মন্ত্রের আভাস পাওয়া গেল। তৎকালীন অধ্যক্ষ Stapleton এবং তাঁর পরবর্তী কয়েকজনের উত্তোলনে অধ্যক্ষ জেমসের Improvement Scheme-এর কিছু কিছু অংশ কার্যে পরিণত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে কলেজের অনেক নৃতন অভাবও দেখা দিয়েছে—অর্থ পুরাতন পরিকল্পনার বৃহদংশ স্থাবিষ্যত প্রাপ্ত হয়েছে। অধ্যক্ষ শ্রীভূপতিমোহন সেন একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোড়নে আবার সব আশা নির্মূল হল। আজ দেশের স্বাধীনতালাভের পরও পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। ব্যর্থতার এই দীর্ঘ ইতিহাসের পরিসমাপ্তির জন্য এই কলেজের সকল শুভাহৃত্যায়ীর উৎসুক্য স্বাভাবিক। সম্প্রতি কলেজের সর্বাঙ্গীণ সম্প্রসারণের একটি বৃহৎ পরিকল্পনাপ্রণয়নে আমাদের অধ্যক্ষের আত্মনিয়োগে আবার আমাদের মনে আশার সংক্ষার হচ্ছে। কিন্তু এই সংখ্যার পুরোভাগে তাঁর প্রদত্ত বাণীতে এই পরিকল্পনার উল্লেখ করে তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি যা বলেছেন তা স্মরণ রাখতে হবে। এই পরিকল্পনা এখনও অসম্পূর্ণ, সেইজন্য এর বিস্তারিত আলোচনা এখন সম্ভব নয়। তবু বর্তমান সম্পাদকের অনুরোধে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁর পরিকল্পনার অংশবিশেষ প্রকাশ করেছেন। নীচের বিবৃতি থেকে তাঁর সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হতে পারে।

এই পরিকল্পনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে কলেজের অবয়বে অঙ্গসংস্থানের বর্তমান বৈষম্য দূর করে আটসু এবং বিজ্ঞানশাখার বিভিন্ন বিভাগের স্বসমঙ্গস স্বতন্ত্র বৃদ্ধিলাভের পথ স্থগম করা। কলেজে প্রবেশ করলেই একটা মন্ত বড় অসঙ্গতি চোখে পড়ে—আটসু বিভিন্নের দ্বারদেশে রসায়নের বিরাট পরীক্ষাশালার অবস্থিতি! রসায়নের উপস্থিতি এই সৌধে সর্বব্যাপী—একতলা, দোতলা, তিনতলায় এর বিস্তৃত আধিপত্য। রসায়নের ল্যাবরেটরিগুলি চারিপাশেও বেষ্টন করে আছে। এই অতিকায় অতিথিকে জায়গা দিতে গিয়ে আটসু বিষয়গুলি স্বরাঙ্গে থেকেও সম্ভব। সেইজন্য বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম সংস্কার হবে রসায়নবিভাগকে একটি নিজস্ব বাড়ী দিয়ে এখানকার শুন্য স্থানে আটসের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিষ্ঠা। রসায়নবিভাগের নৃতন বাড়ী হবে আমাদের খেলার মাঠের পশ্চিমপ্রান্তে। এদিকে আটসু বিভিন্নের একতলায় ছাত্রদের স্বপ্নরিসর বিরামপীটিকার এবং পরিকল্পিত School of Economics-এর আংশিক সংস্থান হবে। দোতলায় বর্তমান অর্থনীতি সেমিনার ক্লাবসভিত্তি হবে ছাত্রীদের বিরামাগারে। তাঁর পাশেই অবস্থিত Chemistry

gallery দ্বাটিতে ইতিহাসবিভাগের বক্তৃতা-কক্ষ এবং সেমিনারের স্থান করা হবে। কলেজের অফিস তাহলে ছাত্রীদের বর্তমান বিরামপীঠিকা থেকে ইতিহাসের বর্তমান সেমিনার ঘর পর্যন্ত বিস্তৃত হবার অবকাশ পাবে।

এই পরিকল্পনার বৃহত্তম নির্মাণসংকল্প হচ্ছে আর্টস বিভিন্নের পিছনে যেখানে এখন Physical Chemistry Laboratory অবস্থিত সেইখানে এক বিরাট চারতলা বাড়ী তৈরী করা এবং মধ্যবর্তী চতুর্কোণ প্রাঙ্গণে (quadrangle) যেখানে টিন-আচ্ছাদিত রসায়ন পরীক্ষাগৃহগুলি অবস্থিত সেখানে আমাদের বহু আকাজিঙ্গত Assembly Hall নির্মাণ। নৃতন যে বাড়ী তৈরী হবে, চারতলা হলেও তার উচ্চতা বর্তমান আর্টস বিভিন্নেই সমান হবে। সংলগ্ন অট্টালিকা দ্বিতীয় বিভিন্ন তলার অসম উচ্চতার জন্য সোপানের সাহায্যে সংযোগ স্থাপিত হবে। নৃতন বাড়ীর একতলায় একটি বৃহৎকক্ষে ছাত্রদের ব্যায়ামাগার এবং অবশিষ্ট স্থানে School of Economics-এর বৃহত্তর অংশ স্থাপিত হবে।

নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় আইন অভ্যাস্যার যদি এই কলেজে আর্টসের স্বাতকোভর বিভাগ খোলার কল্পনা কার্যে পরিণত হয় তাহলে অধ্যাপকসংখ্যার প্রভৃতি বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে। ফলে অধ্যাপকদের বিরামপীঠিকার আয়তনও বাড়াতে হবে ২৩০ং ঘর পর্যন্ত একে বিস্তৃত করে। এই একই কারণে শুধু বর্তমান আর্টস বিভিন্নের দোতলা এবং তিনতলায় অবশিষ্ট জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতাকক্ষের যথেষ্ট সংস্থান অসম্ভব। সেইজন্য নৃতন বাড়ীর দোতলা, তিনতলা এবং চারতলায় নবপরিকল্পিত গবেষণাবিভাগগুলিকে এদের সঙ্গে স্থান বর্ণন করে নিতে হবে। এই সাহচর্য উভয়ের পক্ষে শুভই হবে।

আমাদের আর্টস লাইব্রেরির স্থানাভাব দূর করার জন্য পার্ট-গৃহের পশ্চাদভাগে সামান্য সম্প্রসারণ এবং ছাত্রদের বর্তমান বিরামপীঠিকাটি বই রাখার জন্য ব্যবহার করতে দেওয়ার বেশী কিছু বর্তমানে করা সম্ভব নয়। তবে ভবিষ্যতে লিফ্টের ব্যবস্থা হলে নৃতন বাড়ীর সর্বোচ্চতলে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত করা সম্ভব হতে পারে। পার্শ্ববর্তী উদ্ভিদবিভাগের কিছু অংশ আস্তসাং করে সায়েন্স লাইব্রেরির খানিকটা প্রস্তাব সম্ভব।

বেকার ল্যাবরেটরীতে অবস্থিত ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিভাগের সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং নবপ্রতিষ্ঠিত সংখ্যাবিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানবিভাগ দ্বিতীয় পরিসর বাড়নো দরকার। এই সব বিভাগের অতিরিক্ত সংস্থানের জন্য একটি চারতলা বাড়ীর পরিকল্পনা সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই নিবেদিত হয়েছে। এই বাড়ী তৈরী হবে বেকার ল্যাবরেটরির পশ্চিমে উদ্ভিদ-উদ্যানের স্থানে। কলেজের পশ্চিম প্রাচীরের প্রান্ত অবধি হবে এর বিস্তৃতি। প্রস্তাবিত রসায়নসৌধের সঙ্গে এটি লম্বভাবে অবস্থান করবে, অর্ধাং দুটি বাড়ীর সংলগ্নরূপ হবে L-আকৃতি—অবশ্য উপস্থিত পরিকল্পনা অন্যায়ী মধ্যে প্রায় ৫০৬০ ফিট ব্যবধান থাকবে। এই ছেদ পূর্ণ করার কথা ভবিষ্যৎ প্রয়োজনামূল্যের বিবেচ্য।

Astronomical Observatory-এর নীচে অবস্থিত সব ঘর কলেজ ইউনিয়নকে দেওয়া হবে বিভিন্ন ছাত্রসংঘের ব্যবহারের জন্য। কলেজের নিয়ন্তন কর্মচারীদের নৃতন বাসস্থান নির্মিত হবে আর্ট্স লাইব্রেরির পশ্চিমে জীর্ণ প্রাচীর বরাবর।

আমাদের কলেজের অধ্যক্ষের বাসগৃহ কলেজের সংলগ্ন হওয়াই বাস্থানীয়। খেলার মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে অধ্যক্ষাবাস নির্মিত হবে।

এই সংখ্যায় এই স্কুল পরিকল্পনার আংশিক প্রকাশ হল। কোন সংখ্যায় তার পূর্ণ বাস্তব পরিণতির শুভসংবাদ প্রকাশিত হবে তা সরকারই জানেন।

সাক্ষেতিক সাহিত্য

তপনকুমার বন্দোপাধ্যায়—ষষ্ঠ বর্ষ, বাংলা

পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বিশিষ্ট *form* বা রচনাশিল্প আমাদের দেশের সাহিত্য-ভূমিতে আসিয়া স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে, “সাক্ষেতিক সাহিত্য” বা “Symbolic Literature” তাহাদের মধ্যে অগ্রতম। ট্র্যাজেডি, নডেল, রোমান্স প্রভৃতি রচনাশিল্পের গ্রাম সাক্ষেতিক সাহিত্যও আমাদের দেশে একেবারে নৃতন আমদানী। বরঞ্চ বলা চলে যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অগ্রগত শিল্প-বৈতি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যেও হয়তো ছদ্মবেশে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু *Symbolic Literature*-এর যে অভিনব রূপ পাশ্চাত্য সাহিত্যে দেখিতে পাই তাহা আমাদের সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

বলাই হয়তো বাহল্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই সাক্ষেতিক সাহিত্যের অভ্যন্তর থেকে দীন হয় নাই। কিন্তু এই সাহিত্য-শিল্পটি সাহিত্যসমালোচনার আসরে বিশেষ আন্দোলনের স্থষ্টি করিয়াছে। কেহ ইহাকে সাহিত্যের একটি অপৰ্ণত অক্ষম প্রয়োগ বলিয়া গাল পাড়িয়াছেন, কেহ বা ইহার আবেদনে মুঢ় হইয়া ইহার স্বতি গাহিয়াছেন। কার্লাইল তো স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“It is in and through symbols that man, consciously or unconsciously, lives, works, and has his being; those ages, moreover, are accounted the noblest which can best recognise the symbolic worth and prize it highest.”

যাহা হউক, এই নিম্ন-স্তরের বাহিরে থাকিয়া আমরা এখানে সাক্ষেতিক সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনা করিব।

“সাক্ষেতিক,” এই শব্দটির সহিত আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে, তাই “সাক্ষেতিক সাহিত্য”—এই কথাটি শুনিলে আমরা তাহার একটা সাধারণ অর্থ বুঝিতে পারি। আমরা

মোর্টামুটি বুঝি, “সাক্ষেতিক সাহিত্য” হইল সেই সাহিত্য, যাহার দ্বারা কোন কিছুর একটি সৃক্ষেত্র দেওয়া হয়। “কোন কিছুর একটি সৃক্ষেত্র”, সাক্ষেতিক সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে ইহা একটি মূল্যবান কথা। কথাটিকে ব্যাখ্যা করা যাক।

সৃক্ষেত্র অর্থে আমরা কি বুঝি? সৃক্ষেত্র অর্থে বুঝি ইঙ্গিত, ইশারা। টেশন হইতে ট্রেণ ছাড়িবে, নীল আলোটি জালাইয়া দেওয়া হইল। এই নীল আলোটি একটি সৃক্ষেত্র। যেখানে সেখানে নীল আলো দেখিলেই মনে করি না যে ট্রেণ ছাড়িতেছে; একটি বিশেষ সম্বিবেশের মধ্যে নীল আলোটি ট্রেণ ছাড়ার ঘটনাকে নির্দিষ্ট করিতেছে। অর্থাৎ নীল আলোর কোন একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র অর্থ থাকিতে পারে, যাহা সর্বত্রই এক কিন্তু যখন একটি বিশেষ সম্বিবেশের মধ্যে তাহাকে দেখি, তখন তাহা একটি বিশিষ্ট অর্থগৌরব লাভ করে। তখন নীল আলোটিকে বলি, ইহা একটি সৃক্ষেত্র। তাহা হইলে দেখি, যখন কোন একটি বিষয় অপর একটি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধিত হওয়ার জন্য আপনার নিজস্ব অর্থটিকে কিয়ৎ-পরিমাণে বিসর্জন দিয়া দেই বিষয়ান্তরের অর্থটিকে প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলি সৃক্ষেত্র। এই যে এক বিষয়ের দ্বারা বিষয়ান্তরের অর্থ প্রকাশ ইহাই সৃক্ষেত্র। যুদ্ধ স্বরূপ হইবে, শঙ্খ ধনিত হইল; এখানে শঙ্খের ধনি যুদ্ধের স্বচনাকে প্রকাশ করিতেছে, ইহা তাই যুদ্ধের সৃক্ষেত্র।

এখন যদি এই বিষয়ান্তরের অর্থপ্রকাশের চেষ্টায় বিষয়টি আপনার স্বতন্ত্র অর্থটিকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলে তখন তাহা প্রতীক হইয়া দাঢ়ায়। শঙ্খের ধনি যুদ্ধের স্বচনাকে প্রকাশ করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনার অর্থ হারাইয়া ফেলিতেছে না। আমরা এখানে প্রথমে শঙ্খের অর্থটিকে গ্রহণ করি, তাহার পর যুদ্ধের পরিবেশের সহিত তাহাকে সম্বন্ধিত করিয়া তাহার অর্থকে অতিক্রম করিয়া বিষয়ান্তরের অর্থে চলিয়া যাই। এখানে তাই শঙ্খধনি যুদ্ধস্বচনার প্রতীক নহে, সৃক্ষেত্রমাত্র। কিন্তু যখন একজন রাজার দৃত আসিয়া আর এক রাজার কাছে স্বর্গপাত্রে মুক্ত কৃপাণ ও পুষ্পমাল্য একত্রে মেলিয়া ধরিল এবং রাজাকে কোন একটি গ্রহণ করিতে বলিল, তখন বুঝি যে পুষ্পমাল্যটি সন্দিগ্ধ প্রতীক, তলোয়ারটি সংগ্রামের। এখানে পুষ্পমাল্য ও তলোয়ারের স্ব অর্থ নাই; ইহারা আপনাপন অর্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

এইরূপে দেখি সৃক্ষেত্র ও প্রতীকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা প্রকৃতিগত নয়, পরিমাণগত। সহজের বিষয়টি যদি এমন গভীরভাবে বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত করে যে উপর্যুক্ত সম্বিবেশের অভাব সহেও বিষয়ান্তরের অর্থটি পরিশূল্ট হয়, তখন তাহা প্রতীকে পরিণত হয়। এইরূপে দেখি, কাঠের প্লোব পৃথিবীর প্রতীক, লরেল গাছের পাতা জয়ের প্রতীক, চৱকা কংগ্রেসের প্রতীক, সাম্যবাদীদের পতাকায় কাণ্ঠে ও হাতুড়ি চাষী-মণ্ডুরের প্রতীক। প্রতীকগুলি স্থানিক ও কালিক প্রয়োজনে গড়িয়া উঠে, প্রতীকের অন্তর্নিহিত অর্থ যতই যুক্তিপূর্ণ ও সহজবোধ্য হয়, ততই স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ প্রতীকগুলি সর্বজনীন ও সর্বকালীন হইয়া উঠে।

এই প্রতীক আবার দ্রুই শ্রেণীর। একপ্রকার প্রতীক আছে যাহাতে বিষয় ও বিষয়ান্তরের সমন্বয় স্পষ্ট এবং স্থুতিপূর্ণ। সেখানে অর্থটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এবং প্রতীকটিকে বুঝিতে কাহারও অস্বিধা হয় না। আর এক শ্রেণীর প্রতীক দেখিতে পাই যেখানে বিষয় ও বিষয়ান্তরের মধ্যকার যোগসূত্রটি লোকমানস হইতে অস্থিত হইয়াছে। সেখানেও প্রতীকটি একটি বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত করে, কিন্তু উভয়ের অস্থিত সমন্বয়কে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার দ্বারা অপরের বোধগোচর করা যায় না। দশভূজার মূর্তি যে দশদিকব্যাপী শক্তির প্রতীক তাহা যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু শালগ্রামশিলা কিরণে সহস্র-পদ, সহস্র-শীর্ষের প্রতীক হইতে পারে তাহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে পারি না। জীবনের সহিত ব্যবহারে মানবমন সাধারণতঃ যুক্তি রোঁজে। যেখানে এই যুক্তিকে বিষ্ণুত হইয়া অথবা অস্বীকার করিয়া জীবনকে শুধু মাত্র একটি সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ করি, সেখানে আমাদের ব্যবহারটি সংস্কারে পরিণত হয়। প্রথম শ্রেণীর যে প্রতীকের কথা বলিলাম তাহার আবেদন আমাদের যুক্তিবাদী মনের কাছে, এবং আর এক শ্রেণীর প্রতীকের আবেদন আমাদের সংস্কারগত মনের কাছে। হিন্দুরমণীর সিঁথির সিঁহুর তাহার স্বামীর দীর্ঘায়ুর প্রতীক। কিন্তু এই প্রতীকের অর্থটিকে যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। যে দেশের রমণীরা সিঁহুর ব্যবহার করে না, তাহাদিগকে যুক্তির দ্বারা বুঝানো যাইবে না যে ওই লাল রঙের চূর্ণটির সহিত একজনের দীর্ঘজীবনের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে। এই প্রতীকটির আবেদন আমাদের সংস্কারগত মনের কাছে। সেই সংস্কারের অভাবে প্রতীকটির আবেদন অন্ত মনের নিকট ব্যর্থ হইয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর প্রতীকটি তাই যত বিশ্বজনীন হইয়া উঠে, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীকটি দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ থাকিয়া সে পরিমাণে বিশ্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে না।

প্রতীকের এই যে দ্রুইটি প্রকার ভেদের কথা বলিলাম, ইহাদের মধ্যে গ্রন্থিগত পার্থক্য সহেও একই শব্দের দ্বারা উভয়কে আখ্যাত করা হয়। এখানে আলোচনার স্থিতির জ্যে দ্রুইটি নামের দ্বারা ইহাদিগকে পরিচিত করিব। একটিকে বলিব রূপ-প্রতীক, এই প্রতীকে বিষয়ান্তরের একটি রূপের পরিচয় দেওয়া হয়, সে পরিচয়টি যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মন সহজে গ্রহণ করিতে পারে; অপরটিকে বলিব ভাব-প্রতীক, এই প্রতীকে বিষয়ান্তরের কোন রূপের পরিচয় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না, ব্যঞ্জনার দ্বারা তাহার একটি ভাব মনের মধ্যে জাগাইবার চেষ্টা করা হয়, যে ভাবটিকে আমরা যুক্তিদ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া ধরিতে পারি না।

সংক্ষেত বা প্রতীক সমন্বে উপরে যাহা বলিলাম সেই দিক দিয়া সাক্ষেতিক সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা হইলে কোন একটি সাহিত্য-শিল্পকে কখন সাক্ষেতিক সাহিত্য বলিব?—সাহিত্যটি যখন কোন একটি বিষয়ের রূপ-প্রতীক অথবা ভাব-প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ সেই সাহিত্যের যাহা প্রত্যক্ষ অবলম্বনীয় বিষয় তাহা যখন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত বা ব্যঞ্জনা দেয় তখনই তাহাকে সাক্ষেতিক সাহিত্য বলিতে পারি।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই ইঙ্গিত বা ব্যঙ্গনা দুইভাবে হইতে পারে এবং তাহাতেই সাক্ষেতিক সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ আসিয়া যায়। সাক্ষেতিক সাহিত্যের এই প্রকারভেদের অবতারণার পূর্বে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের ব্যঙ্গনার অবকাশ সাহিত্যে কোথায় সে কথা বুঝিয়া দেখা যাক।

আমাদের জীবনের মোটামুটি দুইটি বিভাগ—একটি বাহিরের, অপরটি ভিতরের। এই বাহিরের বিভাগটি প্রত্যক্ষ রূপ-জগৎ লইয়া আর ভিতরের বিভাগটি অপ্রত্যক্ষ ভাবজগৎ লইয়া। এই অপ্রত্যক্ষ ভাবজগতের আবার দুইটি অংশ ; একটি অংশ নির্দিষ্টকে লইয়া, অপরটি অনির্দিষ্টকে লইয়া। যাহা অনির্দিষ্ট তাহা সব সময়েই অপ্রত্যক্ষ। যাহা নির্দিষ্ট তাহার দুইটি পরিচয়—একটি প্রত্যক্ষ পরিচয় রূপজগতে আর একটি অপ্রত্যক্ষ পরিচয় আমাদের ভাবজগতে, যেখানে ক্লেপেরই একটি ভাবগত অস্তিত্ব রয়িয়াছে। সাহিত্যিক তাহার সাহিত্যের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ রূপজগৎ অথবা অপ্রত্যক্ষ ভাবজগতের কথা বলিয়া থাকেন। সাহিত্যে যেখানে আমরা এই প্রত্যক্ষ রূপ-জগতকে লাভ করি, সেখানে আমরা সাহিত্যকে বাস্তবামূলগামী বলিয়া থাকি, আর যেখানে সাহিত্যে এই অপ্রত্যক্ষ ভাবজগৎটি প্রকাশ পায়, সেখানে আমরা সাহিত্যকে রোমান্টিক এবং মিষ্টিক বলিয়া থাকি।

এখন, এই অপ্রত্যক্ষ অনির্দিষ্ট জগৎকে আমাদের নিকট উপস্থিত করা, সাক্ষেতিক সাহিত্য স্থষ্টির ইহাই মূল কথা। কার্লাইল বলেন—

“In the symbol proper, what we can call a symbol, there is ever more or less distinctly and directly some embodiment and revelation of the Infinite; the Infinite is made to blend itself with the Finite to stand visible, and, as it were, attainable there.”

এই অপ্রত্যক্ষ অনির্দিষ্টের জন্য আমাদের জীবনে একটি তৃষ্ণা দেখা যায়। আমাদের মানবস্বভাবেই আমরা আমাদের অপ্রত্যক্ষ ভাবরাজ্যে একটা অনির্দিষ্টের জগৎ, একটা না-পাওয়ার জগৎ গঢ়িয়া তুলি। এই জগৎটি আমাদেরই একটি অভিনব আকাঙ্ক্ষা হইতে জাগিয়া উঠে। প্রত্যক্ষ রূপ-জগতের সহিত আমাদের প্রাত্যহিক কারিবার, ইহাতে আমরা নির্দিষ্ট কিছুকে লাভ করি, কিন্তু এই নির্দিষ্টকে লইয়া আমরা সন্তুষ্ট থাকি না, আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের অতীতে আরও একটা কিছু অনির্দিষ্টের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলি এবং সেই অনির্দিষ্টকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হই। কিন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ, অনির্দিষ্ট, যাহা নিঃসংশয়ভাবে আমারই একটি বৃহত্তর মানসধ্যানপ্রস্তুত, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে ধরা-ছোয়ার মধ্যে লাভ করা যাইবে কি উপায়ে? তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহার জন্য তৃষ্ণা জাগাইয়া রাখিয়া আমরা তাহাকে বারিবার প্রমাণ করিতে থাকি। এই তৃষ্ণার প্রকৃতিটি আধ্যাত্মিক। সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্তৰে আমরা জীবনের এই তৃষ্ণার একটি শিল্প-প্রকাশ দেখিতে পাই ; দেখি, শিল্পী কেমন করিয়া অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছেন।

বিশেষ করিয়া সঙ্গীতের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সেখানে স্বরের সাহায্যে আমাদের চিত্ত কেমন করিয়া নির্দিষ্টের বক্সন হইতে অনির্দিষ্টের মধ্যে মুক্তি পায়। স্বরের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই বলিয়া তাহা সহজেই অনির্দিষ্টের ব্যঙ্গনা দান করিতে পারে। সঙ্গীতের এই ধর্মটি সাহিত্য-শিল্পাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ণ করিয়াছে। তাহারা সাহিত্যের মধ্যেও এই সঙ্গীতের ধর্মটি প্রবেশ করাইয়া দিয়া সঙ্গীতের যে effect বা ফলশৰ্তি, সেই ফলশৰ্তি দানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিষয়-বস্তু এবং শিল্প-ভঙ্গী উভয় দিক দিয়া তাহাদের সাহিত্য একটি নৃতন পথ ধরিল। কাব্য, এতদিন ধরিয়া সাহিত্য জীবন-কথাকে যে ভাবে বলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাকে আমরা আমাদের এই বাস্তব জীবনবোধের দ্বারা একটি নির্দিষ্টের ব্যঙ্গনার মধ্যে লাভ করিয়াছি। সেখানে কোন অনির্দিষ্টের ব্যঙ্গনার অবকাশ ছিল না বা সাহিত্যও সে অবকাশ রচনা করিয়া লয় নাই। কিন্তু এখন তাহারা সাহিত্যকে সঙ্গীতের গ্রাম অনির্দিষ্টের ব্যঙ্গনার ঘোগ্য করিয়া তুলিতে চাহিলেন। *The Heritage of Symbolism* গ্রন্থে C. M. Bowra বলিতেছেন—

“The essence of Symbolism is its insistence on a world of ideal beauty and its conviction that this is realised through art.....A peculiar intensity is what the symbolists sought to give. In their loyalty to this aim they had to break with many familiar characteristics of poetry. Above all they avoided those public and political themes which were dear to the romantics. For the symbolists absorbed in an ideal beauty, politics is an alien and hostile theme.”

এইরূপে দেখি, সাক্ষেত্রিক সাহিত্য একটি বিশেষ ধরণের জীবনকথাকে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বলিবার চেষ্টা করে। ইতিপূর্বে আমাদের জীবনের তৃষ্ণার যে আধ্যাত্মিক প্রকল্পের কথা বলিয়াছি, সাক্ষেত্রিক সাহিত্য সেই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার শিল্প-প্রয়াস হইতে গঠিয়া উঠিয়াছে। Arthur Symons তাহার “The Symbolist Movement” নামক গ্রন্থে বলিতেছেন—

“It is an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of rhetoric, the old bondage of exteriority.....In attaining this liberty it accepts a heavier burden; for in speaking to us so intimately, so solemnly, as only religion had hitherto spoken to us, it becomes itself a kind of religion, with all the duties and responsibilities of the sacred ritual.”

আমাদের জীবনের যে অংশে এই আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা, যে অংশে এই অপ্রত্যক্ষ, অনির্দিষ্টের জন্য আকাঙ্ক্ষা, সেই অংশ সাক্ষেত্রিক সাহিত্যের ভূমিকা রচনা করিয়া দেয়। আমাদের যে জীবনধর্ম এই অপ্রত্যক্ষের জগৎ রচনা করিতে থাকে, সেই জীবনধর্মের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে না পারিলে সাক্ষেত্রিক সাহিত্যের রসাধান ঘটে না।

সাক্ষেতিক সাহিত্যের এই যে বিশিষ্ট প্রকৃতির কথা বলিলাম, ইহাতে তাহার পরিচয়টি পরিস্ফুট হইবে। অতঃপর পূর্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে সাক্ষেতিক সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকার ভেদটি দেখাইব। সাক্ষেতিক সাহিত্য বলিতে আমরা ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের মধ্য দিয়া সংক্ষেতের কথা বুঝি; এই সংক্ষেত নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট, প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ বিষয় লইয়া হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আমরা ‘রূপ-প্রতীক’ এবং ‘ভাব-প্রতীক’ শব্দ দুইটি ব্যবহার করিয়াছি। সাক্ষেতিক সাহিত্য কখনও রূপ-প্রতীক হইয়া উঠে, কখনও ভাব-প্রতীক হইয়া উঠে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ‘সাক্ষেতিক সাহিত্য’ এই একই নামে অভিহিত করিলে তাহাদের পার্থক্যগুলিকে সহজে ব্রান্তি চলে না। অথচ আমাদের বাঙালি সাহিত্যে এই সাক্ষেতিক সাহিত্যের আবির্ভাব খুব বেশী দিনের নয় বলিয়া, এই বিভিন্ন বিষয়গুলির জন্য বিভিন্ন শব্দ এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। পণ্ডিতেরা এক এক জনে এক একটি শব্দ ব্যবহার করিয়া বিষয়টিকে জটিল ও তুরোধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা এখানে বিষয়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাক্ষেতিক সাহিত্যের বিভিন্ন-রূপগুলিকে (form) বিভিন্ন নাম দিবার চেষ্টা করিব।

সাহিত্যের অবলম্বনীয় বিষয়টি যখন কোন একটি অপর প্রত্যক্ষরূপের সংক্ষেত দেয় তখন সেই সাহিত্যকে ‘রূপ-প্রতীক’ বলিতে পারি। প্রত্যক্ষরূপ সব সময়েই নির্দিষ্ট, তাহার মধ্যে কোন অনির্দিষ্ট কিছুর স্থান নাই। এই শ্রেণীর সাহিত্যের সংক্ষেতকে আমরা যুক্তির দ্বারা অনুসরণ করিতে পারি। ইংরাজীতে যাহাকে Allegory বলা হয়, ইহা অনেকটা সেই প্রকার। অনেকে Allegory-র অর্থে ‘রূপক’ কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু রূপক কথাটিকে এ অর্থে ব্যবহার না করিয়া আরও গভীর অর্থে ব্যবহার করিতে পারা যায়। তাই এ ক্ষেত্রে রূপক কথাটি ব্যবহার না করিয়া রূপ-প্রতীক কথাটি ব্যবহার করিলাম।

সাহিত্যের অবলম্বনীয় বিষয়টি যখন কোন একটি অপ্রত্যক্ষ ভাবের সংক্ষেত দেয় তখন সেই সাহিত্যকে ভাব-প্রতীক বলিতে পারি। অপ্রত্যক্ষ ভাব দুই প্রকারের হইতে পারে; একটি নির্দিষ্ট, অপরটি অনির্দিষ্ট। ভাব-প্রতীকের এই দুইটি শ্রেণীকে পৃথক সংজ্ঞা দিতে হইবে। যেখানে অপ্রত্যক্ষ ভাবটি নির্দিষ্ট বিষয়কে ব্যক্তি করে সেখানে সাহিত্যকে ‘সাক্ষেতিক সাহিত্য’ এই নামে অভিহিত করিব। এখানে ‘সাক্ষেতিক’ কথাটিকে এই বিশিষ্ট অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের ‘অচলায়তন’, ‘মুক্তধারা’, ‘তাসের দেশ’ এই শ্রেণীর সাহিত্য। ইহার মধ্য দিয়া একটি নির্দিষ্ট অপ্রত্যক্ষভাবের সংক্ষেত দেওয়া হইয়াছে। এই সংক্ষেতটি আমরা যুক্তির দ্বারা অনুসরণ করি; কিন্তু রূপ-প্রতীকের দ্বারা এখানে যুক্তিটি অত স্পষ্ট নয়, বিষয়টি ভাবগত বলিয়া এখানে সংক্ষেতটিকে আমাদের বোধের দ্বারাও অনেকখানি গ্রহণ করিতে হয়।

আবার অপ্রত্যক্ষ ভাবটি যেখানে অনির্দিষ্ট বিষয়কে ব্যক্তি করে সেখানে সাহিত্যটিকে ‘রূপক’ এই নামে অভিহিত করিব। রূপক অর্থে বুঝিব যাহা পরিপূর্ণভাবে, নির্দিষ্টভাবে,

রূপ লাভ করে নাই, অথচ যাহার মধ্যে রূপের একটি ভাব রহিয়াছে, অনিদিষ্টকে নির্দিষ্ট করিবার একটি আভাস রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'রাজা', মেটারলিঙ্কের 'বু বার্ড' প্রভৃতিকে রূপক সাহিত্য বলিতে পারি। এখানে বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়া আমরা এক অনিদিষ্ট ভাবের আভাস পাই। এখানে সেই সক্ষেত্রটি যুক্তির দ্বারা অহুসরণ করা যায় না, আমাদের এক আধ্যাত্মিক সংস্কারের কাছে ইহার আবেদন। সাহিত্যিক এখানে নানাভাবে আমাদের মধ্যে সেই সংস্কারকে জাগাইয়া দিতে চাহেন। যুক্তি হইতে আমাদের মনকে সরাইয়া আনিয়া আমাদের চিত্তকে স্থরের অধিগত করিয়া দেন এবং তাহাতেই কেমন একটা ধ্বনির মধ্যে আমাদের চিত্ত মুক্তি লাভ করে এবং সেই মুক্তিকে যুক্তিকে তাগ করিয়া একটা সংস্কারের অধীন হইয়া পড়ে। সেই সংস্কারটিতেই অনিদিষ্টকে স্পর্শ করিয়া যাওয়া আমাদের বসিক চিত্তের পক্ষে সম্ভব হয়। তখন,

"The visible world is no longer a reality and the unseen world no longer a dream." (Yeats).

সাক্ষেত্রিক সাহিত্যের এই যে একারভেদে দেখাইলাম, ঠিক এই ছাঁচের মধ্যেই যে সকল সাক্ষেত্রিক সাহিত্যকে গণ্য করা যাইবে সে কথা বলিতে পারি না। সাহিত্য শিল্প-প্রেরণা ও বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে শিল্প-রূপ লাভ করে। সব সময়ে সেই শিল্পকে কোন একটি বিশেষ ছাঁচের মধ্যে ফেলিয়া তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সাক্ষেত্রিক সাহিত্যের মূল প্রকৃতিগুলি সমস্তে সাধারণ ভাবে কতকগুলি কথা বলা চলে, কিন্তু বাঁধাধরা অলঙ্কা-শাস্ত্র তাহার জগৎ রচনা করিয়া দেওয়া যায় না। সাক্ষেত্রিক সাহিত্য মূলতঃ সঙ্গীত-ধর্মী, তাহা সব সময়েই অলঙ্কার শাস্ত্রের বক্ষন হইতে মুক্তি পাইতে চাহিতেছে। এ ক্ষেত্রে সাক্ষেত্রিক সাহিত্যের পরিচয়কে ছাঁচের মধ্যে বাঁধিয়া দিতে চাহিলে তুল হইবে। উপরের শ্রেণীবিভাগকে তাই চরম বলিয়া দাবী করিবার অবকাশ নাই।

অতঃপর সাক্ষেত্রিক সাহিত্যের শিল্পভঙ্গী ও রসের আবেদন সমস্তে কয়েকটি কথা বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করিব। সাক্ষেত্রিক সাহিত্য যখন 'রূপ-প্রতীক' হইয়া উঠে তখন ছোট গল্লের আকারে, কাহিনীমূলক রচনার মধ্য দিয়া অথবা নাটকের আকারে তাহার শিল্প-প্রকাশ দেখিতে পাই। সেখানে বক্তব্য বিষয়ের ব্যঞ্জনা খুব গভীর নহে। তাহা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ার্থকে প্রকাশ করে এবং সেই বিষয়ার্থটিকে যুক্তি ও বুক্তির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের রসাস্থান ঘটে। এই বিষয়ার্থটি জীবনের কোন তত্ত্বকে বা নীতিকে প্রকাশ করে, যে তত্ত্ব বা নীতি শিল্পীর জীবনবোধের একটি পরিগতি বা conclusion যাত্র। "রূপ-প্রতীক" হইতে তাই আমরা যে রস পাই, তাহা এই বিচিত্র রূপময় জীবনের আস্থাদন-জনিত নহে, তাহা জীবনের কোন তত্ত্বজ্ঞান বা নীতিজ্ঞানজনিত। এখানে জীবনের কোন চিত্ত যদি আসিয়া যায় তবে তাহাকে গোণ করিয়া যে নীতি বা তত্ত্বটি তাহার সক্ষেত্র, সেই নীতি বা তত্ত্বটিকে মুখ্য করিয়া ধরিতে হইবে। অর্থাৎ জীবন এখানে সাহিত্যের অবলম্বন নয়, তাহা সাহিত্যস্থির উপায় মাত্র। তাই উদ্দেশ্যসাধনের জগৎ যতটুকু জীবনকথা

প্রমোজন, জীবনের চিত্ত, তাহার অধিক এখানে পাওয়া যায় না। সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ইহার মূল্য তাই খুব বেশী বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

সাংকেতিক সাহিত্য যখন “ভাব-প্রতীক” হইয়া উঠে, তখন নাটকের আকারে তাহার শিল্প-প্রকাশ দেখিতে পাই। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, ইহার ছাইটি নাম দেওয়া যায়—সাংকেতিক নাটক ও রূপক নাটক। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও শিল্প-তঙ্গীর দিক দিয়া উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। এই শ্রেণীর নাটককে সাধারণনাটকের সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায় না। ইহাতে সাধারণভাবে নাটকের মূল ধর্মটি বিচ্ছান্ন, তাহা হইল ঘটনার পারম্পর্য বিধানে অভিনয়ের দ্বারা একটি কাহিনীকে রূপদান করা। কিন্তু সাধারণনাটকের মতই ইহাতে ঘটনার প্রাধান্ত ও বৈচিত্র্য নাই, চরিত্র-চিত্রণেও বিশেষ প্রয়াস নাই। এখানে কতকগুলি ভাব আর কতকগুলি ভাবের অনুগামী মাত্র। এই ভাব পরম্পরায় মূল ভাবটি পরিশেষে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে বিচিত্র জীবনবন্ধ দেখানো ইহার উদ্দেশ্য নয়, একটি বিশেষভাবে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। এই ধীরে ধীরে ভাবকেন্দ্রের আবরণ উন্মোচন করার মধ্যেই দৃশ্য-দৃশ্যাস্তরের অবতারণা করা হয় এবং তাহাতেই শিল্পের একটি নাটকৰূপ ফুটিয়া উঠে। এখানেও জীবনের বাস্তবঘটনা-প্রবাহকে অঙ্গীকার করা হয় এবং জীবনের সহিত একটি যে নিবিড় রক্তমাংসের সম্পন্ন আমরা অনুভব করি এখানে আমরা সব সময়ে তাহা পাই না। ‘সব সময়ে’ কথাটি বলিলাম এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাহার সাংকেতিক নাটকে বা রূপক নাটকেও মানব-জীবনের গভীর দৰ্শন দেখাইয়াছেন। সেখানে ভাববস্তুকে (নির্দিষ্ট অথবা অনির্দিষ্ট) কেন্দ্র করিয়া যে সকল পার্শ্বচরিত্রের ক্রিয়া দেখিতে পাই, তাহারা সকলেই মানব। তাহারা তাহাদের স্ব স্ব হৃদয়বৃত্তির বৈশিষ্ট্য লইয়া এক একটি বিশিষ্ট জীবনবন্ধের স্থচনা করিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই জীবনবন্ধ, তাহা অতিমানবিক লোকে প্রতিষ্ঠিত, যদিও নাটকের পাত্র-পাত্রীর আবিভোতিক জীবনের দ্বন্দ্ব সেখানে স্থান পায় নাই।

রূপক নাটকের রসের আবেদন মূলতঃ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আনন্দবোধে। সেখানেও হয়তো জীবনের কোন একটি দার্শনিক তত্ত্ব অন্তে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু “রূপপ্রতীকে” যেমন জীবনের তত্ত্বটিকে সোজান্ত্বজি সংক্ষেতের আবরণে উপস্থিত করা হয়, এখানে সেরূপ করা হয় না। এখানে একটি আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা চেতনার মধ্য দিয়া জীবনতত্ত্বটিকে আমাদের বোধগোচর করিয়া দেওয়া হয়। রূপপ্রতীকে জীবন-তত্ত্বটিকে সোজান্ত্বজি জানানো হয়, এখানে বিভিন্ন ব্যঙ্গনার দ্বারা তাহাকে আমাদের মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হয়। তাই এখানে বাস্তব জীবনকে সব সময় না পাইলেও, আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত হইয়া আমাদের রসিক চিত্তের যে একটি মুক্তি ঘটায়, তাহাতেই আমাদের রসের সাক্ষাৎ হয়। এই রস-ব্যঙ্গনা দান করিয়া রূপক নাটক সাহিত্যসংসারে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও রবীন্দ্রনাথ

বিনয় চৌধুরী—চতুর্থ বর্ষ, ইতিহাস

নৃতন বছরের হালখাতা তৈরীর আগে পুরাতন বছরের হিসাব মেলাবার দায় আছে—সাধারণ দোকানদারির ব্যাপারে এর সমাধা মোটা মোটা অঙ্কের সহজ স্ফুর্তে। কিন্তু সাহিত্যের ব্যাপারে, কোন মহৎ শিল্পীর ঐতিহ্যবিচারের ক্ষেত্রে খতিয়ানটা তত সোজা নয়। কেননা সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের মধ্যেও ঘটে পরিবর্তন। পুরাতন যথন স্বভাবের মত সত্য হয়ে যায় তখন পুরাতনকে স্বারণ করার কোন গরজ স্বভাবতঃ থাকেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের মূল্যবিচারের প্রশ্নটা স্বভাবের মত সহজ হয়ে যাওয়া পুরাতনের মূল্যবিচারের প্রশ্ন। সাহিত্যের ভাবাদর্শে ও আঙ্গিকে, সমাজের সমস্তার রূপে ও গুরুত্বে, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় রবীন্দ্রনাথের যুগ থেকে আজকের যুগের তফাং থথেষ্ট। ইতিহাসের মোড় ফিরেছে—এক বিশেষ অধ্যায়ে ছেদ পড়েছে—স্বরূপ হয়েছে নৃতন ইতিহাস সুষ্টির অভিযাত্তা। যে রেনেসাঁসের প্রতিভূত রবীন্দ্রনাথ তা আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। যুগের সমস্যা আজকের সাহিত্যে যেমনটি প্রকটভাবে ঝুঁপায়িত হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথে ঠিক ততটা নেই। কালিদাসের যুগে ফিরে যাবার স্বপ্নে যে রোমান্টিক আত্মি, তার বদলে ঝাড় বাস্তবকে স্বীকৃতি জানাবার প্রয়োজন আজকের সাহিত্যে বেশী। সাহিত্যে সাধারণ মাঝের ভিড় জমেছে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রাচীন ভারতীয় সাধনার উপর ঝোঁকটা করে গেছে, ভারতের ভাবী সমাজ-বিপ্লবকে নৃতন মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে স্বরূপ করেছি। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের মূল সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জেগেছে। কল্পোলযুগের রবীন্দ্র-বিরোধিতার ক্ষীণ রেশ এখনও পাওয়া যায় কোন কোন সাহিত্যসমালোচনায়। কল্পোলযুগের ঝাঁপতাল আজকে না থাকলেও ঢিমে তেতালাতে স্বরের অনুরণন মেলে।

প্রশ্ন উঠতে পারে রবীন্দ্র-বিরোধী পক্ষের থেকে যে, ভারতীয় ইতিহাসের যে রূপ রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়েছে তা ভারতীয় ইতিহাসের আসল ও সত্যরূপ নয়। বেদ-উপনিষদের যুগ, ও উমবিংশ শতাব্দীর মাঝখনকার যে বিবাট ইতিহাস, যে মন্তিত বেদনার কাহিনী—রবীন্দ্রনাথে তার পরিচয় নেই। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ইতিহাসের মূল গতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতীয় ইতিহাসের দৈর্ঘ যাত্রায় এই একটি মাত্র স্বরই কি সেতারের নায়কীর স্বরের মত আর সব স্বরকে ছাপিয়ে গেছে? প্রশ্ন উঠতে পারে, আজকালকার সাহিত্যে জীবনের ব্যাপ্তির যে ঝুঁপায়ন, নৃতন আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা—রবীন্দ্রসাহিত্যে তার অভাব। সমাজের যে রূপ, ব্যক্তির বিচিত্র অনুভূতির

যে রূপ রবীন্দ্রনাথে আমরা পাই তা তাঁর কবিকল্পনার রঙে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছে। নির্বিশেষ, নৈর্যত্তিক এ রূপ—তাতে রিয়ালিজমের অঙ্গহানি।

রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে হবে এক বিশেষ ঐতিহাসিক পটভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথ যে রেনেসাঁস যুগের কবি তা একান্তভাবেই সমসাময়িক ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন ও ভাবগত—তাতে বর্তমানের সব প্রয়োজনকে এক বিশেষ ভাববাদী দর্শনের কাঠামোয় ফেলার প্রচেষ্টা আছে। বৃটিশশাসনের সঙ্গে সঙ্গে যে নৃতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে উঠল, তার পরের অবগুর্ণাবী পরিণতির দিক থেকে সমস্তাকে দেখার কোন প্রেরণা ছিল না ভারতীয় রেনেসাঁসে—কেননা নৃতন যে শ্রেণী রেনেসাঁসের প্রতিভু ছিল তার বিকাশ ব্যাহত হয়েছিল পদে পদে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে যদি আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ সংজ্ঞ ও স্বাভাবিক হতো তাহলে পুরাতনের প্যাকবাস্কে নৃতনকে এঁটে দেবার কোন প্রাণস্ত চেষ্টা হতোনা। উপনিবেশিক দেশে সামাজিকবাদীশক্তির স্বার্থে সমাজ-বিপ্লবের সে রূপ সার্থক হতে পারে না। ভারতবর্ষেও তা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আধা-সামন্ততাত্ত্বিক রূপের সঙ্গে সন্তাবনাপূর্ণ বুর্জোয়া অর্থনৈতির বড়রকমের একটা অসঙ্গতি তখনকার ভারতীয় সমাজবিপ্লবকে চিহ্নিত করেছে ও পরের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। একটা বিশেষ অর্থনৈতির বনিয়াদ ধ্বনে পড়েছে—অথচ নৃতন একটা সংহত রূপ নিয়ে গড়ে উঠেনি। তখনকার যে শ্রেণী-বিচ্ছাস তার মধ্যেও অসঙ্গতির আদল স্পষ্ট। তাই জাতীয় আন্দোলনের শিকড় বাংলার মাটির গভীরে পিয়ে পেঁচানো সভ্য ছিল না—নৃতন যে শ্রেণীর স্থষ্টি তার সঙ্গে ছিল না বাংলার নাড়ীর যোগ। নবজাগৃতির বিশেষ অধ্যায়ে পুরাতনের দিকে ফিরে তাকানো খুব স্বাভাবিক। ইতিহাসে দেখা যায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের বিশেষ এক যোগ আছে। আর এ বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পুরণোর দিকে আসক্তি যিযিয়ে পড়ে একান্ত প্রত্যক্ষ মুদ্রাতন্ত্রের হিপোটিজমে। কার্লাইলের ভাষায় “Cash-payment is the sole nexus between men and men.” সেক্সপীয়রের টাইমস অফ এথেন্সে ও গ্যেটের ফাউন্টের প্রথম অঙ্কে এ মুদ্রাতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। পুরাতন বিধি-বিধানের জায়গায় স্থষ্টি হয় নৃতন কানুন-কানুনের। মাঝের ভাষায়—

“All fixed, fast-frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away—all new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profane, and man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life and his relations with his kind.”

ভারতীয় রেনেসাঁসের রূপের আলোচনায় বুর্জোয়া বিকাশের এই ব্যাহত দিক আমাদের শক্ত করতে হবে। নৃতনের যে বীজ উদ্গমের আশায় আলোবাতাসের জ্য দিন গুণছিল তার চারপাশে আবরণ স্থষ্টি করল মধ্যযুগীয় একবাশ বিধি-বিধান। তাই

রবীন্দ্রনাথের রূপ একান্তভাবে ভাবগতই হয়ে থাকল। বুর্জোয়াশ্রেণীর জাগত চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশের রূপ কোথাও ফোটেনি। ন্তুন যে শ্রেণীর স্থষ্টি তার মধ্যে না ছিল সামন্তত্ত্ব থেকে জাতীয়তাবাদের পথে উন্নয়িত রাজনৈতিক চেতনার বিকশিত রূপ, না ছিল নৃতনের পথে মুক্তির উদ্যাদন, না ছিল জীবনের ব্যাপ্তি। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্বমুখ্যতার মধ্য দিয়ে সমাজশক্তির যে ঐক্যরূপ সাহিত্যে রিয়ালিজমের গোড়ার কথা তা এ অবস্থায় সম্ভব ছিল না। কবিতায় ছাড়া রবীন্দ্রনাথ গল্প-উপন্যাসে স্থানে সমাজের রূপ ফোটাতে চেয়েছেন স্থানে তা পরিপূর্ণভাবে সার্থক হতে পারেনি। কবিতায় কবি প্রায়শঃ কালনিরেপক্ষ, কিন্তু উপন্যাসে মানুষ কালনির্ভর। একটা বিশেষ যুগের পটভূমিকায় মানুষের রূপ ফুটে উঠে এ উপন্যাসে। উপন্যাস আবার ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বের থেকেই স্বীকৃত—আর ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তির প্রাধান্য বুর্জোয়া যুগ থেকেই। তাই উপন্যাস বুর্জোয়া যুগের বিশেষ এক অবদান। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ব্যাপ্তির যে অভাব, মানুষের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর-পরিকল্পনার ক্রিয়ার্থের যে অভাব—তার গোড়াকার কথা এই ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা। উপনিবেশিক দেশে জীবনের প্রকাশ ব্যাহত ও সংকীর্ণ। সাহিত্যের মধ্যে যে সত্য তার রূপায়ন তখনই কেবলমাত্র সম্ভব হয়, যখন শিল্পীর পক্ষে সে সত্য জল-বায়ুর মত স্বাভাবিক হওয়ার স্থূলোগ থাকে। ফরাসী ইতিহাসের এক বিশেষ যুগে বালজাক স্বাভাবিক—যদিও সহজ নয়—কেননা একটা জীর্ণ অতীতের গলিত রূপ তাঁর চোখের সামনেই ঘটেছিল। স্থানে ইতিহাসের বিকাশ সঙ্কুচিত নয়; গতি অবরুদ্ধ নয়—রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাজের সে চেহারা সংহতরূপে প্রকাশ পাবার স্থূলোগ ছিল কম। এফনকি শরৎচন্দ্রের মধ্যেও রিয়ালিজমের রূপ সত্য হতে পারেনি যদিও তাঁর সাহিত্যে আরও সাধারণ মানুষের স্থান আছে। সাহিত্যে রিয়ালিজমের মনি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে “truthful reproduction of typical characters under typical circumstances” (এঙ্গেলস) তাহলে টাইপচারিত্র ও পরিস্থিতি দ্রুটোরই অভাব শরৎ-সাহিত্যে। তবুও রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা সব ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে আসল সত্যের দিকে অঙ্গুলিপাত করেছিল। জাতীয় জীবনের গভীরে আপন স্তরের ঘোর পাওয়ার যে চেষ্টা, সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজের আত্মিক সঙ্গতি খুঁজে পাওয়ার যে চেষ্টা ‘গোরা’র মধ্যে, বাংলা সাহিত্যে তা রবীন্দ্রনাথের বিরাট অবদান। উপনিবেশিক দেশে রাজনৈতিক চেতনার স্তর এত নৌচু থাকা সত্রেও ‘গোরা’র মধ্যে আছে বিরাট সন্তান আন্দোলনের দোলায় আলোড়িত স্তরার রূপায়ন। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার পক্ষেই কেবলমাত্র এটা সম্ভব ছিল। ব্যক্তির ব্যক্তিস্বকে আপন মহস্তে প্রতিষ্ঠা করার যে দাবী ‘গোরা’য়—তা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী অবদান। মানুষ হিসাবে মানুষের মূল্য দেওয়ার জন্য উদার মানবিকতাবোধ, তা রবীন্দ্রকীর্তির একটা বিশেষ দিক।

জাতীয় আন্দোলনের বিশেষ এ রূপটা বাদ দিলেও ইতিহাসের বিশেষ নিয়মে যে শ্রেণী

গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারত বা কিছুটা পেরেছিল, তা হলো সামস্ততন্ত্রের জীর্ণ খোলস ফেটে ন্তুন বুর্জোয়া শ্রেণী—ইতিহাসের এই বিশেষ সময়ে বুর্জোয়ারাই প্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক। আর এই আন্দোলনের মধ্যে ক্ষয়ক-শ্রমিকের আন্দোলন চাপা পড়ে গেছে। ঐতিহাসিক নিয়মে সমাজে যে শ্রেণী প্রধান হয়ে উঠেছে—সে শ্রেণীর অসঙ্গতির চরম স্তর না আসা পর্যন্ত অন্য আন্দোলন সাধারণতঃ ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে না। অন্যান্য আন্দোলন বিশেষ এই শ্রেণীর হাতিয়ার রূপেই ব্যবহৃত হওয়া সন্তুষ্ট। রিফর্মেশন-যুগে অ্যানাব্যাপ্টিজ্ম, ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর আন্দোলনে লেভেলার, ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে জ্যাকোবিন আন্দোলন তখনকার ইতিহাসের ধারাকে ভিন্ন পথে চালিয়ে দিতে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়ত্বাবাদের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এক উদার বিশ্মানবতাবোধ। এ উদারতা তাঁর কবিতায় ও গানে যে ব্যাপ্তি এনেছিল বাংলা সাহিত্যের তা সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথের যে মানবিকতাবোধ তাঁর ভিত্তি হল জীর্ণ পুরাতনের বন্ধন-মুক্তি। গেটের ফাউন্টের মধ্যে মুক্তির যে আনন্দ, সে আনন্দ সামস্ততন্ত্রের অচলায়তন থেকে ব্যক্তির মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় এই মুক্তির আর্তি ও আনন্দ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর মহিমা কীর্তন নয়—সে ধর্ম জীবনের ধর্ম—প্রতিটি মুহূর্তে প্রাকৃতির সামৰিয়ে আনন্দের স্পর্শে ন্তুন যে উজ্জীবন-বোধ, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম তাঁরই স্বাক্ষর বহন করছে। রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা একান্তভাবেই আধুনিক। আজ ইতিহাসের মধ্যে শ্রেণী-সংঘাতের যে দ্বন্দ্বিকরণ দেখতে আমরা অভ্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের কাছে ইতিহাস সে রূপে হ্যত ধরা দেয়নি। কিন্তু তাঁর মানবতাবোধ মৃচ কুসংস্কার ও প্রগতি-বিরোধী শক্তিকে আঘাত করতে তাঁকে প্রগোদ্ধিত করেছে। যারা পৃথিবীর বায়ুকে বিষয়ে দিচ্ছে, আলোক যারা নিবিষয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর জলন্ত অভিশাপ উত্তত হয়ে উঠেছে। মানবের অগ্রগতিতে বিশ্বাস হারানোকে তিনি মহাপাপ বলে মনে করতেন। দানবের মৃচ অপব্যয় ইতিহাসে যে কোনো শাশ্বত অধ্যায় রচনা করতে পারবে না এই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী। মহাকালের সিংহাসনে সমাজীন মহাপুরুষের থেকে তিনি শক্তিভিক্ষা করেছেন অগ্নায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের গোধুলি-লগ্নের কবিতাগুলোতে এই “সর্বত্রগামিতা”র ছাপ স্পষ্ট। ব্যথায় ও আনন্দে, অভিশাপে ও অভ্যন্তরে তাঁর প্রতিটি কবিতার মধ্যে লেগেছে আশ্চর্য মহস্তের ছাপ। ঝটিশ সাম্রাজ্যবাদের কর্দম নগ রূপকে, তাঁর লক্ষ্মীচাড়া দীনতাঁর উচ্ছিষ্টতাকে তিনি উদ্ধাটিত করেছিলেন, যুরোপে যুদ্ধের উয়াদনায় উন্মত্তদের তিনি অভিশাপ হেনেছেন, স্পেনের বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন ন্তুন পৃথিবীর গড়বার পথে সোভিয়েট দেশের মহান কর্মপ্রচেষ্টাকে, বিজ্ঞপ করেছেন সাম্রাজ্যবাদী জাপানের হিংস্র জাতীয়তা-বাদকে। এই বিরাটমানবতাবোধের ঐতিহ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অমর ঐতিহ—

এই মানবতাবোধের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা সাহিত্যের ব্যাপ্তি অসম্ভব। আধা-সামন্ত-তাত্ত্বিক, গুপ্তনিরেশিক ভাবাত্তবর্ষে থেকে রবীন্দ্রনাথের সংস্কারমুক্ত মন সত্ত্বের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করেছিল। মানুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্হীন ভালবাসা কোনো বিশেষ সংস্কারে অর্গালিত হতে পারেনি।

সাহিত্যের মধ্যে যে ঐতিহ্য-বাদ তার গোড়াকার কথাই হলো ইতিহাসকে অঙ্গীকার না করে পুরাতনের মধ্যে, অতীতের মধ্যে সত্ত্বের যে ঋপায়ন তাকে অভিনন্দন জানানো ও তাকে আত্মসাং করে এগিয়ে যাওয়া—কোনো বিশেষ সংস্কার এই ঐতিহ্যবোধকে খণ্ডিত করলে তাতে ভাবী সাহিত্যেরই ক্ষতি। ম্যাথু আর্গেন্ডের ক্লাসিক্যালঘেষা মন শিল্পীর কবিতাকে স্বীকৃতি জানাতে অসমর্থ। এলিয়টের ঐতিহ্যবাদ সম্পূর্ণ কালনিরপেক্ষ, এজন অনৈতিহাসিক। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আধুনিক সাহিত্য-সংষ্ঠির চেষ্টাতে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি ও পালোঘান-গিরিই শুধু দেখানো হবে। আজকের বাংলাসাহিত্যের যা প্রধান সমস্যা, তা নৃতন নৃতন আধিক নয়, স্বস্ত সমাজ-বোধ ও মানবতাবোধ। আধিক সর্বস্বতা এ যুগের বুর্জোয়াসংস্কৃতির অবক্ষয়েরই লক্ষণ। আধিকের উপর জোর দেওয়ার যে শুচিবায়ুগ্রস্ততা, তা শিল্পীর সংষ্টুপাতার অভাবেরই প্রমাণ—শুধু ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলাবার মতো সৌধীন মজহুরি সাহিত্য নয়। ফ্রান্সে ডার্ডাইজ্ম, স্বর-রিয়ালিজ্ম, ইংলণ্ডে ইমেজিষ্ট আন্দোলন ও গোটা যুরোপীয় সাহিত্যে সিস্টলিজমের প্রসার, নৃতন নৃতন আধিকের পথকে হয়ত খুলো দিয়েছে কিন্তু মানুষের মূল্যবোধের মধ্যে নৃতন কোন বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। টেকনিকের চুলচেরা সম্পূর্ণতার মধ্যে দেউলিয়া মনের নঞ্চাতা স্পষ্ট। আবার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বর্তমানের সমাজসমস্যার সার্বিক প্রতিফলন হয়নি সত্য, কিন্তু আধুনিক সাহিত্যেও তার ঋপায়ন কি সার্থক ও সম্পূর্ণ? গণ থাকলেই শুধু গণ-সাহিত্য বা প্রগতি-সাহিত্য হয় না। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে ব্যাপ্তি এসেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু গণ-সাহিত্য একান্তভাবেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলার ইতিহাসের অনেক পর্ব কেটে গেছে। জাতীয়-আন্দোলন গণ-আন্দোলনের সার্বিক রূপ নিয়েছে; পঞ্চাশের মুস্তক বাংলার সমাজ-জীবনের ভিত শুল্ক কাপিয়ে দিয়েছে; স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জনসাধারণের ঘটেছে মোহমুক্তি; মহাচীনের মুক্তিবিপ্লব সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে পার্শ্বিয়ে দিয়েছে; স্বতরাং সাহিত্যের মধ্যে নৃতন নৃতন সমস্যা এসেছে, সমাজবোধের ঋপ-সম্পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠার স্থোগ আছে যা রবীন্দ্রনাথের সময় সন্তুষ্ট ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভাষার অফুরন্স উত্তরাধিকার আমাদের দিয়ে গেছেন যা না হলে আজকালকার বাংলাসাহিত্যস্থাপিতে বিস্তু ঘটত প্রচুর। প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্যের সঙ্গে ভাবানুভূতির ঐশ্বর্যের নিত্য-সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথ থেকে পেয়েছি আমরা এই প্রকাশভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভাব দীপের চারধারের জলের মত আমাদের বেষ্টন করে আছে—তাকে অঙ্গীকার করা আমাদের অর্হীন মৃচ্ছা ও অহংকারেরই পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ ভাবী বাংলাসাহিত্যের রাজ-দরবারে ধার্বার পথে বিরাট তোরণ-দ্বার। রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে তাঁর বিরাট মানবতাবোধ অনেকখানি ঘূচিয়ে দিয়েছে। মাঝের প্রতি ভালবাসায় ও মমতবোধে রবীন্দ্রনাথ জনগণেরই কবি। আর আধুনিক বাংলার গগ-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিকে আত্মসাঙ করেই এগিয়ে যেতে পারে। সেক্ষণীয়ের যুগের সমস্তার সঙ্গে আজকের ইংলণ্ডের সমস্তার গুণগত তফাং—তবুও এলিয়েটের সেক্ষণীয়বিরোধিতা সহেও ইংরেজীসাহিত্য সেক্ষণীয়কে অস্বীকার করে এগিতে পারবেন। বিরাট প্রতিভার স্বরূপই হল আগামী দ্রুতিম শতকের সম্ভাবনার সংহত শক্তি নিজের মধ্যে বিশ্বিত করা। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও বিশ্বমানবতা-বোধ আগামীকালের ইতিহাসেরই নির্ভূল পদচিহ্ন।

অষ্টার মৃত্যু

অন্তোকরঞ্জন দাশগুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ, আর্টস্

আজ দেখি আমাদের মনের কপাট
বন্ধ আর অন্ধকার ঘরের ভিতর
অঞ্চকে ডাকিনা কেউ ; জানালার শান্তি অবর
দাতে দাত চেপে রাখে, আহা যদি এমন প্রহর
আচম্ভিতে নামে যার ছুই হাতে হাত রেখে দেখা যায় মাঠ
তৃণের নিবিড় প্রেমে, আর যদি দেখা যায় বন
আলোয় আপ্লুত বৃক্ষে ; অবারিত তোরের আকাশ
প্রতিশ্রুত সূর্যে শুধী ।

কিন্তু এই মন
যতোবার পৃথিবীর মুখোমুখি হয়, ইতিহাস
সম্পত্তি দেবে না, সে-ও বেদনায় হয়েছে কৃপণ ।

অথচ ঘুমের স্ফুলে কেটে যায় দিন
কখন জানি না, তবু এটুকুই অনেক বাঁচোয়া,
নাহলে বুঝি-বা এই কলক্ষিত বৃক্ষ-প্রদক্ষিণ
ছবিষহ হতো আরো, এটুকুই ঋগ
শতাব্দীর কাছে । আজ সভ্যতার প্রাণ শীর্ণতোয়া
নদীর মতন, তাতে যাবে না হাত-পা-মুখ ধোয়া ।

কিন্তু যদি অনিন্দ্রার ভীষণ সঙ্কটে
 কোনো এক রাত্রি আসে, আর এক দুর্বোধ্য ইশারা
 ঘরের বিশ্রাম করে ব্যাহত, কালের নদীতটে
 উত্তাল চেউয়ের পর চেউ দেখে মৌকো এসে জোটে
 একে-একে, তারপর হাঁওয়ায় হঠাত
 খুলে যায় হৃদয়ের জানালা-দরোজা,
 গ্রাঁগেতিহাসিক কোনো রাত্রির আকাশ ভরা তার।
 এনে দেয় সেদিনেরো রাত.....
 তাহলে ভালোই হয়, তবু আজ মিথ্যে তাকে খোজা।

আজ শুধু তিমিরের খতু-পরিক্রমা
 আমাদের জীবন্ত জীবনের সাক্ষ দেয়, যদি
 প্রমিথিয়সের মতো দুরাশায় উজ্জলতা করে যাই জমা।
 কিছুই হবে না লাভ, হয়তো এমনি নিরবধি
 অবিচ্ছিন্ন পথাতিবাহন, কোনো মোহানার ক্ষমা।
 বর্ষিত হবে না বুঝি, হয়তো প্রার্থিত সেই প্রাণকষ্টা নদী
 কখনো দেখবো না আর অরণ্যের অযুক্ত-ওষধি
 দেবেনা দেবেনা কেউ, তবু এসো পার হয়ে যাই
 এ সব মৃত্যুর কান্না কাঁটায় সঙ্কুল উপত্যকা।
 এই সব উত্তরাই চড়াই।
 থরো থরো আশঙ্কায় তবে কেন আকা।
 মৈত্রীর মধুর ছবি ? চলো আজ ভবসায় ছবি এঁকে যাবো,
 এই তামসীর তীরে ঘুরে ফিরে আমাদের গান
 শুনে তার কালোজলে পন্থ হবে শুচি ও শ্রেতাভ—
 দীপ্তির সঙ্গে স্মৃহান
 অক্ষয় প্রদীপ জেলে এখানেও সঙ্গীত শোনাবো।

তারোপর মনের কপাটে
 যদি কেউ খিল তুলে আড়ালে লুকায়,
 সম্মোহিত সেই ঘরে দিনরাত হাঁটে,
 আমাদের না-চিনেই হেঁটে হেঁটে যায়,
 অন্য কোনো মুক্তির উপায়
 না পেলেও দে'খে যাবো তখন কেমন দিন কাটে ॥

ବୃତ୍ତଚୂତି

ଶିଶିରକୁମାର ଦାଶ—ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ବିଜ୍ଞାନ

ନଦୀତେ ନେମେଛି କତନିନ ଅବଗାହନେ
କତ ସନ୍ଦାୟ ମହର ପାଇଁ ଆଲ୍ମେ,
ସଥନଇ ଏ ତରୁ ଜଳେହେ ଦାରୁଗ ଦହନେ
ଭରେଛି ତଥନଇ କାଲୋଜଳ ଏହି କଲ୍ମେ ।

ସ୍ଵର୍ଗହୃତ ଅଗୋଚରେ ନଦୀସଲିଲେ
ଦେହ ହ'ତେ ଖ୍ସେ ଭେସେ ଗେଲ ଶ୍ରୋତୋଗତିତେ ;—

ସହସା କଥନ ମୁଖର ମମେର ଦଲିଲେ
ଲେଖା ବାଧା ଗେଲ ଶୁଦ୍ଧ ଅବିରାମ ଘତିତେ ।

ହାରିଯେ ତାକେଇ—ଆଜୋ ତ' ଅପାର ବେଦନା
ସେ ଛିଲ ଜୀବନେ ଆଲୋଭରା କତ ସକାଳେ ;
ପୃଥିବୀର ଆଲୋ-ଅଷ୍ଟରୀ ତା'ର ସାଧନା
ବ୍ୟର୍ଥ କରତେ ପାଇଲନା କେନ ଅକାଳେ ?

ଅନେକ ପ୍ରାଚୀ ଅପରିଣିତ ଏ ମନେତେ
ଜେଗେହେ ତାଦେର ସାଡା ପାଇନିକୋ ତବୁ ସେ ;
ଉତ୍ତରହୀନ ପର୍ବତ ଢାକା ବନେତେ ;
ଉତ୍ତଳା ମାଗରେ—କି କ'ରେ ବୋବାରେ ଅସୁରେ !

କତ ଛାଯାପଥ ତାରା ଏହ ଆଲୋ ଆକାଶେ
କତନିନ ଧରେ ଦେଇ ଆଲୋ ଆସେ ନୟନେ ;
ଆକାଶେର ସ୍ଵର କତ ଭେସେ ଆସେ ବାତାସେ
ସାରାରାତ କାଟେ ଝପାଲି ମଶାରି ବସନେ ।

ମେ ଓ କି ପାରେ ନା ପୃଥିବୀ ଭରାତେ ଶୋଭାତେ
କାନ୍ତାର-କେଣୀ ଧରାର କାନନେ କାନନେ,
ଫେଟାତେ କୋରକ ଶତଦଳେ ମନଲୋଭାତେ ?
କେନ ତବେ ବାରେ କୋରକ ବିରସ ଆନନେ ?

ତବୁ ଚେଯେ ଦେଖି କତ ନଦୀ ଜଳ ମାଗରେ
ଚଲେହେ ଡିଣ୍ଡିୟେ ପର୍ବତ-ବନ ହରସେ ।
ମୋହାନାୟ ତା'ର କଲ୍ଲୋଳ ଶୁଣି ମଜୋରେ
ଶୁଦ୍ଧ ତରଙ୍ଗ ଚଂକଳ ହସ ରତ୍ନେ ॥

পদ্মা

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ, ইতিহাস

দিগন্ত-নিলীন-নীল শামলিম প্রাতের যেখানে
রাত্রি আর প্রভাতের নিত্যদৃত, যেখানে কেবল
সবুজের সমারোহ, যেখা শুধু ছায়া-সুশীতল
শান্তির কুটিরগুলি মর্মরিত মর্মের আজানে,
কনক-ধাগের শ্রোতে হাওয়ার তরণী যেখা আমে
স্বপ্নের সৌরভ-সুর, যেখানে প্রাণের শতদল
গানের কিরণ-স্পর্শে অফুরান আনন্দ-উজ্জ্বল,
হে পদ্মা, সেখানে কেন, কেন তুমি কিসের শক্তানে ?

আমিও বুঝি না হায় স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এই দেশে
তোমারি মতন ঠিক সেদিনের অগতক ক্ষণে
পথ ভুলে ভুল করে কেন যে এসেছি, মোহাবেশে
কেন যে সেদিন আমি সমৃদ্ধত উদ্বৃত ঘোবনে
দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি নির্ম হাতে, এর
অ্য কোন মানে ছিল ?—একমাত্র ঘণ্ট্য কুচক্ষীর
কুটিল চক্রান্ত ছাড়া বলো পদ্মা, বলো আমাদের
আর কে ফেরাতে পারে ঘোবনের আনন্দ-নিবিড়
স্বাভাবিক পথ থেকে ?

—তবু তুমি এখনো দুর্বাৰ
উত্তু-তৱঙ্গ-গীৰ্যা ; স্বিঞ্চ-শ্যাম এই বাংলার
দিগন্তবিস্তৃত কোলে দ্রবান্ত-উন্মুখ শিশু-প্রাণ,
জ্যোতি ঈশানের বজ্র-গাঢ় ভয়াল বিষাণ
এখনো বাজিয়ে যাও আত্ম-হারা তৰঙ্গের রোলে,
কিন্তু আমি পারি না তো তোমারি মতন সেইরূপ
পঞ্জীভূত প্রাণ-মত প্রাণ হতে ? হে পদ্মা তা' বলে
তুমি কী আমাকে কৱবে ক্ষমাহীন বিহৃৎ-বিদ্রূপ ?

স্বীকার্যঃ অক্ষম আমি, তোমারি মতন পূর্ণ-প্রাণ
 মতপ্রাণ প্রাণ-শিশু নই আমি আজ, জেনো তবু
 একদিন তোমারি মতন তীব্র তেজে দীপ্তিমান
 ছিলাম, চঞ্চল-চিত্ত হিমাদ্রির শক্তির প্রতিভূ
 ছিলাম দেদিনো জেনো, তারপর কোন কুচকুচীর
 কুটিল চক্রান্ত-ফলে হয়ে গেছি তোরের শিশির,—
 সে কথা জানি না, তাই অবরুদ্ধ শক্তির বেদন।
 তোমারি তরঙ্গ-ভঙ্গে মনে হয়, যায় মেন শোনা।

আমার আস্তার আর্তি অপ্রকাশ, তাই তুমি তার
 সার্থক সুন্দর রূপ মনে হয়—হে পদ্মা আমার ॥

কল্পনা

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়—পঞ্চম বর্ষ, ইংরাজী

মিথ্যাকে যখন আমরা 'কাল্পনিক' আখ্যা দিই তখন মাঝের কাছে কল্পনার ওয়েজনীয়তা ভেবে দেখি না। কল্পনাকে সাধারণতঃ মতিভ্রমের উদাহরণ ধরা হয়, আর না হয় মাহিত্যিকের জন্য এর খানিকটা উপযোগিতা স্বীকার করা হয়—তার বেশী নয়। কিন্তু কল্পনা শুধু অস্ত্রিমতির অসুস্থতার প্রকাশ নয়—বা মানসিক শক্তির চপলতার বিকাশ নয়। মাঝের ক্রমোন্নতির প্রতিটী ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মৌলিক কার্যাবলী সম্পাদন করে কল্পনা। কল্পনা চিন্তাশীল প্রাণীর পক্ষে অপরিহার্য।

মাঝের জীবন যে বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উপনীত হতে পেরেছে তার মূলে আছে কল্পনা। যা সে পেয়েছে তাইতেই মাঝুষ সম্মত হতে পারে নি। সে আরও ভাল জিনিসের কল্পনা করে এসেছে। এক বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়েও সে আরও স্থথের অপর বাস্তবের স্থপ দেখতে পেরেছে। গুহা ত্যাগ করে কুটীর নির্মাণ করবার আগে কুটীরবাস যে বেশী স্থুতির হবে সে কথা আদিম মাঝুষ কল্পনা করে নিয়েছে। মাঝুষ যদি সংস্কার দ্বারা চালিত হ'ত তা হলে এখনও সে বর্বর হয়ে থাকত। সহজাত সংস্কারকে সে উপেক্ষা করেছে বলেই আজ সভ্যতার স্তরে এসে পৌছেছে।

এক সময় গেছে যখন বন্ধ মাঝুষ ও বন্ধ পশু একই সঙ্গে বাস করে এসেছে। আনন্দক্ষার জন্য মাঝুষ পশুর কাছ থেকে যথাসন্তব আত্মগোপন করে এসেছে, আর কল্পনা

করেছে নতুন শক্তির যে শক্তিতে সে পশ্চের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। এই কল্পনাই জ্ঞান দিল অস্পেক্টে। এখন মাঝুষ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হ'ল। আগে খাদ্যের জন্য তাকে গ্রহণ করার অপেক্ষা করতে হ'ত—অস্ত্রধারী মাঝুষের পক্ষে পশ্চে হত্যা করে ক্ষমিত্বাত্তি করা সহজ হল। প্রচণ্ড শীত ও গভীর অন্ধকারকেও জয় করার কথা মাঝুষ কল্পনা করল। ফলে সে আগুন জ্বালতে শিখল। এই আগুনের উত্তাপ ও আলোক তার পক্ষে অনেকথানি স্বস্তিদায়ক হল। জলাশয়ের জল তাকে হাতছানি দেয়। জলে ভাসবার কথা তার মনে উদ্বিদ হল। গাছের গুঁড়ি কেটে নৌকা তৈরী হল। মাঝুষ অন্তর্থ সারাবার কথা কল্পনা করল, ওবধের স্ফটি হল। কল্পনা চলেছে, এগিয়ে চলেছে—এ যাত্রার শেষ নেই, এ গতির বিরাম নেই। স্ফটি হয়ে চলেছে আকাশধান, আকাশবাণী ও আণবিক বোমার।

মাঝুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের মধ্যে কল্পনা অগ্রতম। যা কিছু বড় ও ভাল কাজ মাঝুষ করেছে তার মূলে আছে কল্পনা।

চঞ্চল, স্বন্দরের পিয়াসী মাঝুষ তার নিজের দেশটাকু দেখেই পরিচ্ছন্ন হতে পারে নি। মানসন্মতে সে দেখেছে দেশ-দেশান্তরের ছবি। তার কল্পনা তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে নতুন দেশে। নব নব জনপদ হয়েছে আবিস্কৃত। বিপুল পৃষ্ঠীর পরিক্রমা শেষ করে মাঝুষ এখন আশপাশের গ্রহ-উপগ্রহে যাবার কল্পনা করছে। হয়ত' অন্তর্ভুবিশ্বতেই এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে। বাস্ত্বহারা মাঝুষ মঙ্গল-গ্রহে গিয়ে নতুন উপনিবেশের স্থাপনা করবে।

আনাগত, ভাবীকালের কথা যে রকম আমরা কল্পনা করতে পারি সেই রকম কল্পনায় আমরা ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়েও ফিরে যেতে পারি। প্রাচীন ইতিবৃত্তের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কল্পনা আমাদের এক বলকেই দেখিয়ে দিতে পারে। আমরা উন্মাদক জনতার বাদবিত্তণ থেকে বহুদূরে আশ্রমের শাস্ত্রপরিবেশে তপস্তারত আর্দ্ধ ঋষিদের দেখতে পারি। দেখতে পারি অহিংসার প্রাচারক বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধদেবকে। দেখতে পারি বিশুদ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়কে পরিত্যাগ করে ধর্মপ্রাণ নিমাইয়ের গৃহত্যাগ। কল্পনার সাহায্যে আমরা দেখি ত্রুশবিদ্ধ যীশুশ্রীষ্টকে—ক্ষমাস্থন্দর তাঁর দৃষ্টি। আমরা দেখি সত্যের জন্য মৃত্যু-বরণ-রত সফ্রেটিসকে—সম্মিত তাঁর আনন। আমরা দেখি যন্ত্রণাকাতের মুমুর্ব শয্যাপার্শে সেবারত ফ্রেনেস, নাইটিসেলকে—যুক্তিমতী করণ।

কল্পনার প্রাচুর্য থাকা খুবই ভাল, কিন্তু কল্পনার অপব্যবহার ভাল নয়। কল্পনা যাতে বিলাসে পরিণত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। কল্পনা যখন আমাদের উত্তোলী করে তোলে তখনই তার সার্থকতা, কল্পনা যদি শুধু অলসতায় পর্যবসিত হয় তা' হলে তা' অর্থহীন মনোবিকার মাত্র। যাদের কল্পনাশক্তি নেই তারা সত্যিই অমুকম্পাৰ পাত্র। তারা কবিতা পড়তে পারে না, অকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে খুঁজে পায় না সৌন্দর্য, অমনে তাদের আনন্দ নেই, খেলায় নেই উৎসাহ। কল্পনা না থাকলে জীবনের কৌতুক, সত্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অনেকথানি থেকেই আমরা বঞ্চিত হই।

শিশুর কল্পনাশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চেয়ারে বসে সে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়েছে কল্পনা করে, পুতুলকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে মনে করে অচিন্ত দেশের রাজকুলার ঘূর্ম ভাঙালে। তার মন বলে—হেথো নয়, হেথো নয়, অঘ কোন খানে। তাই মনোরম এই ভুবন থেকেও স্বন্দরতর ভুবন সে স্থষ্টি করে নেয়। তার মনোবনে যে ফুল ফোটে তার সৌরভ শ্রেষ্ঠ পার্থিব পৃষ্ঠের সুগন্ধের চেয়েও মধুরতর। শৈশবই বোধ হয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। ওয়ার্ডোয়ার্থ বলেছেন, 'Heaven lies about us in our infancy'.

শেক্সপীয়ারের মিড্সামার-নাইটস্ক্রীম নাটকে আছে—

The Innatic, the lover and the poet
Are of imagination all compact.

প্রমত, প্রেমিক ও কবির কল্পনার রাজ্যে বাস। এই দিক দিয়ে এই তিনি জন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠিতাবে জড়িত। শেক্সপীয়ার এই সত্যই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বন্দর ভাব ও ভাষায় একাশ করেছেন।

মানুষ যখন পাগল হয় তখন তার মনোরাজ্যের কোন রকম শৃঙ্খলা থাকে না—তার কল্পনা বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে যায়। তাই লেডী ম্যাকবেথের হাতে রক্তের গন্ধ থেকে যায়—যে গন্ধ আরবের সমস্ত স্বরভিও দূর করতে পারে না। তাই ওফেলিয়া ফুল আর গানের মাঝখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, তাই লীয়ারের চোখে প্রষ্টার গণেরিলে হয় ক্লপাস্ত্রিত।

প্রেমিকের চোখে থাকে প্রগমের অঞ্জন। তাই তার প্রিয়জনকে সে স্বর্গীয় রৌপ্যর্ধে মণ্ডিত দেখে। তাই যক্ষ তাঁর প্রিয়াকে কল্পনা করে—

...যুত্তিবিষয়ে স্থষ্টিরাত্মে ধাতুঃ।

তাই শুকুতুলা সদৃশে দুঃস্মনের উত্তি—

স্ত্রীরত্নস্থিতিপরা প্রতিভাতি সা মে।

তাই জুলিয়েটের দ্যুতিতে রোমিওর চোখ ঝলসে যায়—

But, soft! what light through yonder window breaks?

It is the east, and Juliet is the sun.

প্রেমিক তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর মানসীকে রচনা করে, তাই সে অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা।

কবি কল্পনার সাহায্যে তাঁর কাব্য স্থষ্টি করেন। যাঁদের এই কল্পনার উল্লেখযোগ্য স্ফূর্তি নেই তাঁরা যত বড় ভাষাশিল্পীই হ'ন না কেন সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর কবি হতে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ ল্যাটিন সাহিত্যে হেস্পেস ও ইংরাজী সাহিত্যে পোপের নাম করা যেতে পারে। কবির কল্পনাই তাঁকে ও তাঁর কাব্যকে মহস্ত দান করে। তাই মধুস্মন কল্পনাকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন—

তুমিও আইস দেবী,
তুমি মধুকরী কলনে ।

মিল্টনের মহীয়সী কলনাই তাঁর মহাকাব্যকে অমরত্ব দান করেছে। কবি কলনার শাহায়ে
নতুন জিনিস স্থষ্টি করেন—পুরাতনকে করেন নবজীবনদান। কবির কলনার এই দিক্ষা
লক্ষ্য করেই সংস্কৃত আলক্ষ্যারিক বলেছেন :

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকং প্রজাপতিঃ ।
যথাস্টৈ রোচতে বিখং তথেদং পরিবর্ততে ॥

শেক্সপীয়ার কবির ‘দিব্যোন্মাদ-ঘূর্ণিত-দৃষ্টি’র কথা উরেখ করেছেন। বাস্তবের যেসব জিনিস
প্রতিদিনকার ব্যবহারে ক্ষিট, কবি সেইসব জিনিসের ওপর কলনার আলো ফেলে তাদের
উজ্জ্বল করে তোলেন। যেগুলি সুন্দর সেগুলিকে তিনি সুন্দরতর করতে চান। তাই
তিনি বলেন :—

নবীন আঘাতে রঁচি নব মাঘা
এঁকে দিয়ে যাব যন্তর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্ত কায়া
বাসন্তীবাস-পরা ।
ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব ।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় কবির কলনাই সবচেয়ে বড় কলনা। কারণ কবি তাঁর অমর
কাব্য স্থষ্টি করে মহুষ্যত্বের মহিমা প্রচার করেন—মানুষকে আশা ও উৎসাহ দেন। দৃঢ়-
হৃদিশা তিনি দূর করতে পারেন না, তবে কঁটিবনের মধ্যে ফুলটা ফুটে থাকে তার দিকে
তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেন। কিন্তু কঁয়েকজন আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বলছেন যে মানুষ
যদি নিজের সঙ্গে দ্বিতীয়ের একান্ত কলনা করতে পারে, যদি মানুষের হৃদয়তন্ত্রী অনন্তের
স্রুরে বাজতে থাকে, তা হলে সে মহামানবে পরিপন্থ হতে পারে—তখন সে পার্থিব দৃঢ়-
দৈন্যের উপরে চলে যেতে পারবে। আর এই মহামানবই একদিন পারবে ধরার ধূলিতলে
স্বর্গের রূপমা স্থষ্টি করতে ।

ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান

অংশুরঞ্জন সেন^১

ইতিবৃত্তের প্রবাহপথে একটা সমাজ-প্রগতির দীপ্তি আবর্তচঙ্গল করে তোলে মানব-মানসকে। স্বদ্ব অতীত হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত এই অশ্রান্ত কল্লোলই ইতিহাসের দিশাবী আলো হয়ে ওঠে। নানা ঘাত-প্রতিষাতের মধ্য দিয়ে মাঝুষ এগিয়ে চলেছে শাস্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের দিকে। সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মহৱ সজীব আলেখ্য হয়ে ওঠে ইতিহাস-সচেতন মনে। তাই সমাজ-ব্যবস্থার প্রাথমিক যুগে আত্মবিকাশের নানাপথ যখন উপস্থিত হোল মাঝুষের সামনে, সমসাময়িক ইতিহাসেও দেখা গেলো তার প্রকাশ। আবার ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি যখন স্তুত হয়ে আসে, তখন সেই প্রাণহীন আবর্জনাকে দূর করতে আবির্ভাব হয় কোন অজ্ঞের ব্যক্তির, যিনি দুর্গমকে করে তোলেন স্বগম, দুর্ভক্তে উপলব্ধ।

আদিম যুগ থেকে স্বীকৃত করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মাঝুষের অঙ্কুট চেতনা বিকাশ লাভ করেছে প্রকৃতির সংস্পর্শে এসেই। এইভাবে সে চিনেছে তার পারিপার্শ্বিককে, চিনেছে গোটা পৃথিবীকে। আর এর থেকেই জন্ম নিয়েছে নতুন ভাব, নতুন শক্তি, নতুন আদর্শ। স্বতরাং প্রকৃতির অভিজ্ঞতালক্ষ জ্ঞান আর সমাজ ও মাঝুষের স্বার্থকে অধিক পরিমাণে ক্রপায়িত করে তোলার শক্তিই মাঝুষের ব্যক্তিত্বকে করেছে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসে ধাঁরা ব্যক্তির মর্যাদা আর অক্ষয় মহুঘৃতের কথা বিবৃত করেছেন, তাঁদের মধ্যে কার্লাইলই ছিলেন বিখ্যাত। বহুদিন ধরে ইতিহাসকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখার অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছিলো মাঝুষের। সেই ষটনারাশির স্তুপ হতে বেরিয়ে আসাই হোল কার্লাইলের প্রধান কীর্তি। তিনিই প্রথম গুণীর ব্যক্তিত্ব আর অজ্ঞের পৌরুষের কথা উদ্ঘাটিত করলেন আমাদের কাছে। সেদিন থেকে খুঁজে গেলো ইতিহাসের আর একটি নতুন পথ।

কিন্তু সমসাময়িক কালের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করলেও কার্লাইলের ঐতিহাসিক মর্যাদা আজ লুপ্তপ্রায়। জীবন ও বহির্জগতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট অসম্মতি, যার ফলে তাঁর প্রভাব ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তিনি রাজনীতিতে ছিলেন একজন উদারনৈতিক, কিন্তু কর্তৃত্বেও বিশ্বাস করতেন। তিনি একদিকে নৈতিক উন্নতির পক্ষপাতী, আবার অন্যদিকে বাস্তব অগ্রগতির বিরোধী। এর ফলে তিনি বিজ্ঞানকে করলেন উপহাস। আরও আশর্যের ব্যাপার হোল এই যে, যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে তিনি নতুন বিজ্ঞানকে বিদ্রূপ করলেন, প্রাচীন ধর্মকেও বিচার করলেন সেইভাবে।

১ প্রাক্তন ছাত্র (১৯৪৭-৫১)।

অপরদিকে সত্যই ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান নীতি ও ধর্ম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই যেতে হোল তাঁকে। কারণ, যে বাস্তব অগ্রগতির বিরোধিতা করেছিলেন তিনি, তা তাঁর নৈতিক লক্ষ্যগুলোর রূপান্তর ঘটাতে বাধ্য। ফলে দেখা গেলো তাঁর গেঁড়ামীর এক হাস্যান্তর সমাবেশ। তিনি সম্মান করলেন কেপ্লারকে, অবিশ্বাস করলেন নিউটনকে, উপহাস করলেন ফেরাদকে, আর অবজ্ঞা করলেন ডারউইনকে। তাঁর চোখে মাঝুষ হোল সত্য, দিব্য ও অনন্তের অঙ্গুলগঞ্চকারী। এক কথায় বলতে গেলে এঁরা পারমার্থিক ছাড়া আর কিছুই নন। নৈতিক মূল্যের দ্বারা মাঝুষকে বিচার করাই হোল কার্লাইলের উদ্দেশ্য।

কার্লাইলের মতে সমাজের অধিকাংশ মাঝুষই নির্বোধ আর নিজেদের দোষ-গুণ সংশোধন করতে একেবারে অক্ষম। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের কুসংস্কার, অগ্নায়, অবিচার দূর করাও তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। স্বতরাং তাদের ঠিকপথে চালিত করতে হলে এমন কোন স্বয়েগ্য নেতার প্রয়োজন যিনি তাদের নিজ ইচ্ছান্বায়ী পরিচালনা করতে পারবেন। এটাই হোল উদারনৈতিক কার্লাইলের ব্যক্তি-বিচারের নিরিখ। কিন্তু এ ধরণের ব্যক্তিকে সমাজের পক্ষে কি রকম বিপজ্জনক তা' প্রমাণ হয়েছে বিসমার্ক আর হিটলারের জার্মানীতে। বিসমার্ক তাঁর “প্রাশিয়ানাইজেশান” নীতির অবলম্বনে সমস্ত রাষ্ট্রকে প্রবর্ধিত করে যে জার্মানী গড়ে তুলেছিলেন, তার এক শতাব্দী পরে হিটলার তাঁরই পদাঙ্ক অঙ্গুলণ করে একমায়কভাবে করলেন স্বপ্রতিষ্ঠিত। এইভাবে ফ্যাসিস্ট নার্থী বাহিনী গড়ে উঠল জার্মানীতে। এই একগুঁয়েমীর ফলে জার্মানীর হোল চরম পরাজয়, কারণ এই ভয়ঙ্কর নীতি স্থায়ী হতে পারে না বেশী দিন। আর এরই ফলে তাদের আর্ম ও ব্যক্তিগত ঘটলো অপমত্য।

এই প্রবল ব্যক্তিদের ব্যর্থতার সন্ধান মিলবে ইতিহাসে। অবশ্য জনসাধারণ যে তাদের নেতাদের অঙ্গুলণ করতে চায় না তা' নয়। বেশীর ভাগ মাঝুষই স্বন্দর অস্ত্রশস্ত্রে সজিত, প্রচণ্ড শক্তিশালী আর কৃতী নেতাদের অঙ্গুলণ করতে চায় সর্বদা। কিন্তু প্রকৃত কারণ আরও বেশী জটিল ও কষ্টসাধ্য। প্রথমতঃ স্বয়েগ্য ব্যক্তি তাঁর কাজের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত হ'ন না সব সময়ে। জুলিয়াস সীজার তাঁর বন্দুদের সমর্থন হারিয়েছিলেন, অপরদিকে রোমে তাঁর শক্তেরও আয়ত্তে আনতে পারেন নি। ফলে তাঁর জীবনপ্রদীপ নিবে গেলো চিরদিনের মতো। এইভাবে নেপোলিয়নেরও হয়েছিলো পতন। দ্বিতীয়তঃ, স্বয়েগ্য ব্যক্তি বংশের ধারাকে রক্ষা করতে পারেন না। অলিভার যা' লাভ করেছিলেন, রিচার্ড ক্রমওয়েলকে হারাতে হোল তা'। আবার বিসমার্ক যা' লাভ করেছিলেন, বেথমেন-হেলগোর্গে, তা' ডুবিয়ে দিলেন বিশৃঙ্খলার অন্দকারে। তৃতীয়তঃ, জনসাধারণ তাদের নেতাদের দর্শনযাত্রাই স্বীকার করে নিতে প্রায়ই অক্ষম হয়। যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি সকলেরই গোচরীভূত। কারণ, তাঁর কার্য বাস্তবক্ষমতার নির্দশন—যা' অগ্রাহ করা যাব না।

আবার যিনি কোন চার্টের প্রতিষ্ঠাতা তিনি অধিকাংশ মাঝুমের দ্বারা উপেক্ষিত ও অস্বীকৃত হতে পারেন। কারণ, তাঁর স্থিতি ভাবের মধ্যেই নিহিত যার সঙ্গে বাস্তবের নেই কোন সংযোগ। একথা ঠিক যে ব্রহ্ম-সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে পোপ আর বিশপের প্রাণ্য ক্ষীণ হয়ে পড়েছে অনেকখানি। তখন থেকে যন্ত্র ও যন্ত্রীই হয়েছে মাঝুমের ভাগ্যের নিয়মামক। তাই পুরানো ঘুণে-ধৰা শক্তি আর স্থায়ী হোল না বেশী দিন, ধীরে ধীরে নতুন আদর্শ তার স্থান দখল করলো। এভাবে পুরোহিতের ব্যক্তিত্বের মূলে ধরলো ফাটল, আর তার জীবনের মান গেলো। তলিয়ে একটা ব্যর্থতার অঙ্ককারে।

কার্লাইলের ঐতিহাসিক ব্যক্তিবিচার অত্যধিক ধর্মভাবাচ্ছন্ন। অবশ্য ইতিহাসের বিশিষ্ট কয়েকটি ব্যাপারে ধর্মও জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু সমস্ত কিছুর মূলে ধর্ম-সংযোগ করা নিতান্ত অগ্রায় ও অশোভন। তাই তাঁর বীর হলেন ভগবানের প্রতিনিধি, যিনি অসংখ্য নির্জীব নির্বোধ মাঝুমের নেতা। একমাত্র ভগবানই এই বিরাট জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি মহাবীর, তাই মর্ত্যের অগ্রায় ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন কয়েকজন ছোটখাটো মাঝুম বীরকে। স্বতরাং ভগবানই একমাত্র শক্তিশালী অতিমানব ও পুজ্য মহাপুরুষ আর এই পৃথিবীটাও চিরকাল একই রকম, এর কোন পরিবর্তন নেই। অথচ ইতিহাসের অর্থই হোল পরিবর্তন। কিন্তু কার্লাইল শেষ জীবনে তাঁর এই আন্ত নীতি উপলক্ষ্য করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে জনসাধারণ ততটা নির্বোধ নয় যতটুকু তাঁর অভিমত। তারা সত্যিই শৌর্যে-বীর্যে স্বনিপুণ, এমনকি তাদের প্রিয় নেতার জন্য প্রাণবিদ্র্জনেও অক্ষম নয়। ইতিহাসই এর সাক্ষ্য দেয়।

সমাজ-অগ্রগতির মূলে ব্যক্তির অবদান নির্ভর করে সেই ঘণ্টের বিশিষ্ট অবস্থার ওপর। কর্মসূবিধায়ে নেপোলিয়নের আবির্ভাবই এর চূড়ান্ত উদাহরণ। তাঁর ব্যক্তিগত শক্তির কাছে তাই অগ্রায় সেনাপতিদের স্থান ছিলো তুচ্ছ। তাঁর কারণ তাদের শক্তিমত্তা সম্ভাবনা থেকে বাস্তবে ঝুঁপাইত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন জেগে উঠে। যে নেপোলিয়নের শক্তি ও প্রতিপত্তির ফলে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিলো, তাঁকে ছাড়া কি তা' সম্ভবপর হোত না কোনদিন? মোটেই তা' নয়। যখন সমাজ তার বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদের সামনে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করে তখন তাঁদের মন সেই সমস্যা সমাধানের প্রতি নিবিষ্ট হয়। তাঁরপর যখন তার সমাধান হয় তখন তাঁদের দৃষ্টিও অন্য সমস্যার প্রতি আকৃষ্ণ হয়। স্বতরাং গুরীর কার্যের গতি এগিয়ে চলবে যুগ্ধর্ম অর্হ্যায়ী; তাঁর দৃষ্টি অন্যদিকে নিবন্ধ হবে না সেই সময়ে। নেপোলিয়ন যদি সেনাপতিত্বের পরিবর্তে সন্ধীত-চর্চার অভ্যেস করতেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি রাষ্ট্রের কর্ত্ত্বার হতে পারতেন না ভবিষ্যতে।

যেসব মনীয়ী রাজনৈতিক ও শাসনতাত্ত্বিক সমস্যা ছাড়াও শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে নিজেদের প্রতিভাব ছাপ রেখে গেছেন, তাঁরাও ছিলেন সমাজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা,

অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণ বা স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত। তাই Renaissance-যুগের অন্য শিল্পী লিওনার্দ-দা-ভিকি, মিকেল এঞ্জেলো প্রভৃতির স্মৃতিতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে জরাজীর্ণ শাসনসত্ত্বের দাগত্ব হতে মুক্তির চেতনা আর স্বাধীন মানুষের আনন্দেচ্ছান। আবার এই যুগেই গড়ে উঠলো স্বত্ত্বাঙ্গী কবি সেক্সপীয়রের মহান সাহিত্য। তিনি নতুন যুগের মুক্ত মানুষকে জানালেন অভিনন্দন। তাঁর অপরাজেয় শিল্পীব্যক্তিত্ব বাস্তব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হতে বিচ্যুত হয়নি কোনোদিন। অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজ উপস্থানের মধ্যে নিয়ে এলো এক অভূতপূর্ব রূপাস্তর। স্বপ্রসিদ্ধ উপস্থানিক স্থান আর চার্ল্স ডিকেন্সের বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টি ও পুরাতনের বিকল্পে তাঁদের বিদ্রপ ও শ্লেষ নতুন যুগের বাণীকে করে তুললো আরো স্বন্দর, আরো সার্থক। বিশেষ করে ডিকেন্স ফরাসীবিপথের উৎপীড়িত ও শোষিত মানুষের কাহিনীকে ধেরকম মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর রচনায়, তা' তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বকে অমর করে রেখেছে পৃথিবীর ইতিহাসে। এই-ভাবেই জনস্বার্থের সঙ্গে জড়িত থেকে যুগে যুগে ব্যক্তিত্ব এগিয়েছে আপন সার্থকতার পথে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দেখি একই উদাহরণ। ভারতের সমাজ-ব্যবস্থা বহুকাল ধরে স্থায়ী ছিলো। কিন্তু সমাজ স্থাগুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না একজায়গায়। তাই উনিশ শতকে এলো বিরাট পরিবর্তন। মধ্যযুগের অচল সংস্কারের বিকল্পে প্রচণ্ড আঘাত হান্তেন রামমোহন রায়। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভারত এগিয়ে গেলো ঐক্যের পথে। তিনি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল মানুষকে দিলেন গভীর সম্মান। এমন একটা সময়ে তাঁর আবির্ভাব হয়েছিলো যখন আমাদের আর্থিক ও মানসিক শক্তি গেছে আড়ষ্ট হয়ে। তাই পেদিনকার মানুষ তাঁকে শক্ত বলে তিরক্ষার ও উপহাস করেছিলো। কিন্তু তিনি বিনূমাত্র ভক্ষেপ না করে আমাদের দেখিয়েছিলেন ভারতের অস্তর্নিহিত চিরস্তন সত্যকে। ভারতের সাধন-সম্পদের দ্বার তিনিই খুলে দিলেন মানুষের সামনে। তাই নবযুগের অগ্রন্ত রামমোহনকে আজও সারা ভারতের মানুষ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাঁর মহিমা ছেয়ে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত। স্বতরাং ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মূলে ছিল রামমোহনের কঠোর উদ্যম ও অঙ্গেয় ব্যক্তিত্ব।

এইভাবে ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা রয়েছে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। একজন গুণী ব্যক্তি যে তাঁর ব্যক্তিগত গুণরাশির জন্য মহৎ তা' নয়, তাঁর মহত্ত্বের কারণ হোল যে তিনি যুগের পাওনা মিটিয়ে দেন যুগকেই। কার্লাইলের ভাষায় এঁরা সমাজের জন্মদাতা। এই যথার্থ উক্তির জন্য কার্লাইল ধন্য। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে একজন গুণী মানুষ প্রকৃতপক্ষে নতুনের স্বচনাকারী, কারণ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি অগ্রে চাইতে তীক্ষ্ণ ও প্রবল। তাই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ অনেকখানি, প্রায় আকাশ-পাতালের দূরত্ব। একটা সমাজ যখন ভেঙ্গে যায় তখন তা'র চিহ্ন স্থল্পিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাঁর মানসমষ্টিতে। আবার আগামী দিনের নতুন নতুন সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতিও তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ হয়।

স্বতরাং, তাঁকে একজন বীর বলা যেতে পারে। কিন্তু তিনি এই অর্থে বীর ন'ন বে নিজ ইচ্ছারূপী তিনি স্বাভাবিক ঘটনাশ্রেতকে প্রতিহত কিংবা পরিবর্তিত করতে পারেন। তাঁকে বীর আখ্যা দেওয়ার প্রধান কারণ হোল যে তিনি প্রয়োজনীয় অথচ অচেতন পদার্থকে প্রকাশ করেন স্বষ্টি ও সচেতনতাবে। এখানেই নিহিত আছে তাঁর সমস্ত মহৱ, এখানেই তাঁর সম্পূর্ণ ক্ষমতা।

স্বতরাং ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনারাশি ও মহান ব্যক্তিরাই হলেন সেই সেই যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জ্ঞানের প্রমাণ ও নির্দর্শন। কিন্তু অবস্থার মহৱ গতির জ্যে এইসব গুণী ব্যক্তিদের দায়ী করা চলে না, কারণ পরিবর্তন ধীরে ধীরে আসাই স্বাভাবিক। আবার এই পরিবর্তন কখনো আপনা হতেই উদ্ভৃত হয় না। তাই ধাঁরা বিরাট বিরাট সামাজিক সমস্তাগুলোর সমাধানে রত থাকেন, এখানে তাঁদের মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন হয় সবসময়েই। কিন্তু এও মনে রাখা উচিত যে কেবলমাত্র বিখ্যাত ব্যক্তিদের জ্যাই বিশাল কর্মক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত নয়। এর দ্বার তাঁদের জ্যে উন্মুক্ত যাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সর্বদা তীক্ষ্ণ ও সজাগ, আর যাদের দ্বাদের দ্বাদের প্রতিবেশীদের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল। স্বতরাং “বিখ্যাত” শব্দটাই হোল একটি সমস্ক-বাচক সাধারণ ভাব। আমরা পবিত্র বাইবেলেও দেখেছি এর উদাহরণ। সেখানে বলা হয়েছে, “সেই মানুষই বিখ্যাত যিনি পরের জ্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।” স্বতরাং ব্যক্তিস্বরে ব্যক্তিচারের হাত থেকে এঁরা মৃত্তির আস্থাদ নিই সমাজের বুকে জন্ম নিয়েছেন। সমাজ এঁদেরই চায়—কারণ, ব্যক্তিস্বরে স্বাভাবিক রূপ এঁরাই ফিরিয়ে আনতে পারেন।

এইভাবে ব্যক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান স্বপরিষ্কৃত হয়ে উঠেছে ইতিহাসের পাতায়। পৃথিবীতে এরকম বহু মহত্তের আবির্ভাব হয়েছে আর শেষে সমানরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁদের বিসর্জন হয়েছে অতলস্পর্শ বিস্তৃতির মধ্যে। প্রত্যেক মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে একটা স্বাতন্ত্র্য। তাই তাঁদের গতিশক্তির বৈচিত্র্য এক নয়। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তা'র পথ অনেক। অঙ্গের মতো একজনের পশ্চাতে আর-একজনের চলার কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না। ব্যষ্টি আর সমষ্টির শক্তির মানদণ্ডে রয়েছে বিরাট প্রভেদ। যা' হোক, নতুন দিনে এইসব গুণীদের ব্যক্তিত্বই সমাজে স্বীকৃত হবে—কারণ, জীবনের সহজ সংযোগেই এঁরা সাহিত্য, শিল্প, দর্শন স্থাপ করেছেন, নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মহুয়ার তাঁদের কাজের মধ্যে রেখে গেছে আপনার ছাপ। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁদের ধরে রাখতে পারে না, তাঁদের ব্যাকুলতাই দেখিয়েছে তাঁদের পথ। জয় তাঁদের স্বনিশ্চিত, কারণ তাঁরা পুরাতনের ধর্মসকারী ও চিরন্তনের পুজারী। কিন্তু আকাশে তাঁরাই হলেন আলোকের দৃত।

স্বপ্ন

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য—প্রথম বর্ষ, আর্টস্

ছায়াটাকাৰ বাণী ব'য়ে শেৰ হ'য়ে দিন ঈ আসে,
সবুজ স্বপনে ভৱা মাঠ আজ সুমাবে এখন ।
ডুবে যাওয়া আলোকেৰ কণাটুকু স্মৃতিপটে ভাসে
বিস্মৰণেৰ তীৰে ভেসে ভেসে চ'লেছি যখন ।

আধাৰেৰ পাখা ঢাকা আকাশেৰ পানে চাই যবে
জানি না কখন আমি ব'সে আছি স্বপনেৰ রথে !
তাৱাৰ দলেৰ মাঝে যাজ্ঞা মোৰ যেন শুক্র হবে—
বনানীৰ মাঘা ছেড়ে স্বপ্ন চলে অজানাৰ পথে ।

সন্দৰে রহস্যটাকা মাটি-ছোঁওয়া দিগন্তেৰ পারে
মন-তটীৰ কোন ছলো ছলো জোয়াৰেতে ভেসে ;
মধুৰ বৰ্ণলীমাখা কল্পনা-স্বর্গেৰ এক ধাৰে
ধীৰে ধীৰে সেইখানে স্বপ্ন এসে থামে মোৰ শেষে ।

ভুলেৰ স্বপ্ন

বটকুফও দে—ষষ্ঠি বৰ্ষ, রাজনীতি

এ-ও ভুল ? এ-ও যদি ভুল, তবে কেন হে হৃদয়,
ঘুৰে-ঘুৰে ছড়া কেটে ক্লান্ত হাওয়া ! এতোটা সময়
কেন যিথে দুরাশাৰ মৃগায় মূর্তিৰ ধ্যান, বলো—
যদি-বা প্রাণেৰ স্পৰ্শ নমিত চোখে-ও ছলোছলো
না হ'লো, তা' হ'লে আৱ কবিতাৰ নায়িকাৰ নাম
নৃপুৰেৰ মতো তাৱ কানে-কানে যতো শোনালাম—
তা' দিয়ে কী হবে ? সেই ভোৱেৰ বিভোৱ বৈভবে
আকা ছবি, শিশিৰেৰ মুক্তো-মুখ, কী হবে ঈ সবে !

আমি যে আকাশ থেকে চুপি-চুপি আলতো ভীৰু পা'য়
 ব'রে ষাই, ব'রে গিয়ে তোমার ঘুমের মন ছুঁই,
 সাবা রাত খুঁজে-খুঁজে তারাদের বাগানের জুঁই
 জড়ো করি, ক'রে দিই তোমায়, তবু কী নিৰপায়
 এক সে পথিক-গ্রাণ তোমারই স্বপ্নের গানে কবি
 পারবে না হ'তে ? তবে, সব ভুল ? সত্য আৱ সবই !

এ-ও ঘদি ভুল, তবে আৱ কেন, কেন হে হন্দয়
 উপমার মিথ্যে রং-এ কৰো তাকে লীলা-কৃপতী,
 কেন আৱ সময়ের তৌক্ষ তৌৰে তোমার সঞ্চয়
 দেলে যাও অকৃপণ ! তাতেই কী মৃত্যুৱ মহতী !

হয়তো । হয়তো নয় । সবই ভুল । তবু সে ভুলেৱ
 তৌৰেৱ পথেৱ রেগু দুই হাতে কামনা কুড়ায়,—
 তাৰপৰ হিসেবেৱ হাতেখৰ্বে সন্ধ্যা-শিশুলেৱ
 পায়েৱ প্ৰণাম লাভ । শান্তি, চুপ, শান্তিৰ ছায়ায় ॥

ছুটিৰ গান

সুস্মাত গঙ্গোপাধ্যায়—পঞ্চম বৰ্ষ, বিজ্ঞান

আবাৰ কলেজ ছুটি হলো, ফেৰ দীৰ্ঘদিনেৱ
 জগ্যে কলেজে শান্তি নামলো,
 দূৰপথে যেতে শান্তি কলেজ একটু থামলো
 নিঃশ্বাস নিতে, দৱিয়াৰ বাঁকে
 একটু ভিড়লো নৌকো । অনেক যাত্ৰিজনেৱ
 উচ্চ কষ্ট থামলো, তৌৰেৱ ঘন অৱগ্রে
 শৰ্ক্ষ্যাৰ মাঘা নামে—সেই ফাঁকে
 নামলো সবাই মুক্তিৰ হাওয়া পাৰাৰ জগ্যে—
 একটু শান্তি—
 থাকে ঘদি সেই ঘন বনানীৰ
 স্পন্দি ছায়াৰ শান্তি নিবিড়

ভীক অনুরাগে, দীর্ঘ পথের দাঢ় টেনে টেনে
 পাড়ি দিতে, এই শরীর-মনের জমামো ক্লান্তি
 একটু হারাতে, একটু ভুলতে
 জলের কান্দা, নতুন রাতের তারা হুঁঘে-ছেনে
 বনের ছায়ায় সবুজ পাতার কুঁটির তুলতে ।

তবু কি শান্তি এখানে ? এখানে
 বিজন বনের অলস সন্ধ্যা।
 মুক্তির হাওয়া বারায় ? চপলা অলকানন্দ।
 কি শান্তি ঢালে ?
 এখানে পাহাড়ী জ্যোৎস্না তাদের উমনা প্রাণে
 কতটুকু আলো ছড়ায় ? বলো তো মনের পাঞ্জা
 সরিয়ে হৃদয় ছোটে কিনা এই স্মরণের পালে
 হাওয়া দিয়ে সেথা—যেখানে অতীতে হাজার মালা
 দাঢ় টেনেছিলো একসাথে, হাতে
 হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে, এর গলায় ও গলা
 মিলিয়ে চলার গান গেয়েছিলো । সেই পথ চলা
 মনে ক'রে এই রাত্রির নীড়ে
 যদি উমনা হও আজ, যদি সেই একসাথে
 গান মনে পড়ে, যদি সে অতীতে ফিরে যেতে চাও,
 তবু দোষ দেবো তোমায় ? শান্ত গাছের ভীড়ে
 শ্রান্ত হৃদয় হয় যদি আজ এগিয়ে চলার স্বপ্নে উধাও ?

বিজ্ঞাপনের অর্থনীতি

অর্থনীতি কুমার সেন—চতুর্থ বর্ষ, অর্থনীতি

বর্তমান যুগকে বিজ্ঞানের যুগ না বলে বিজ্ঞাপনের যুগ বলাই উচিত। পথে ঘাটে, ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে, টামের চূড়ায়, দেয়ালের মাথায় বিজ্ঞাপনের আজ ছড়াচাঢ়ি। এখানে লাল আলো জলছে নিভচে, ওখানে রামধনু দিয়ে ছবি আৰু হচ্ছে, আবার ওপাশে হকারেরা গলা ফুলিয়ে চাঁচাচ্ছে। খবরের কাগজের আকেকই তো বিজ্ঞাপনে ভর্তি। কোলকাতায় রাস্তার পাশে এমন কোনো দেয়াল দেখেছেন কি, যার উপর বিজ্ঞাপনের ট্যাকশালের ছাপ এখনও পড়ে নি? চিকার করে জিনিসের গুণাবলী কীর্তন করা, অথবা গুটিকয় লোককে সঙ্গ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া তো নিয়ন্ত্রিতিক ব্যাপার। এযুগে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব যে অস্বীকার করে তার অন্তর্দৃষ্টির হয়তো প্রশংসা চলতে পারে, কিন্তু তার বহিদৃষ্টির তারিফ করতে আমি নারাজ।

বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক লোকেরই ভুল ধারণা আছে। তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞাপনের খরচটা মূর্খতারই নামান্তর, কারণ সেই টাকায় বেশী জিনিস তৈরী করলে লাভ হবে বেশী। তাঁরা ভুলে যান যে জিনিস তৈরী করা আর তা বিক্রী করা এক কথা নয়। আপনি হয়তো তিন হাজার টাকা দিয়ে হাজার বোতল তেল বানালেন এই ভেবে যে পাঁচটাকা করে বিক্রী করে অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা ভুলে ফেলবেন। বাজারে ছেড়ে দেখলেন পাঁচ টাকায় কুড়িটা খন্দেরও জোটে না। বাধ্য হয়ে দাম কমাতে লাগলেন,—শেষে হয়তো একটাকা সাড়ে তিন আনা করে সব বেচে দিতে হোল। আপনি লাল না হয়ে লালবাতি জাললেন। এর জায়গায় যদি বিজ্ঞাপনের জন্য কিছু খরচ করতেন তবে হয়তো প্রচুর লাভ করতে পারতেন। চাহিদা বাড়ানো হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কাজ আর এর জন্মেই বিজ্ঞাপনের চাহিদা। চাহিদা বাড়ে হৃভাবে—অনেক লোকে নতুন করে জিনিসটা কেনা শুরু করে, আবার অনেকে রামের দোকান ছেড়ে দিয়ে শামের কাছ থেকে জিনিসটা কেনা শুরু করে। প্রথমটাকে আমরা বলব “লোকজোটানো” বিজ্ঞাপন, আর দ্বিতীয়টাকে “লোকভাঙানো” বিজ্ঞাপন। লোকজোটানো বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সব ধরণের বাজারেই (market) হয়ে থাকে। কিন্তু লোকভাঙানো বিজ্ঞাপনের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী হয় এমন সব বাজারে যেখানে অনেক লোকে মিলে একই ধরণের জিনিস বিক্রী করছে (Monopolistic Competition)। সেখানে প্রত্যেকের জিনিসের সঙ্গে অগ্রে জিনিসের তফাত সামাঞ্চিত,—তাই বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারলে বিক্রী বাড়বে প্রচুর।

অর্থনীতির দিক দিয়ে বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হোল, তার সঠিক পরিমাণ ঠিক করা। বিজ্ঞাপনে কতটা খরচ করা হোল, তার উপরে অনেকাংশেই ব্যবসার ওষ্ঠা পড়া নির্ভর করে। বিজ্ঞাপনের অভাবে বিক্রী কম হতে পারে,—আবার বিজ্ঞাপনের ছড়াচাউলিতে দেনার দায়ে “ইন্সল্ভেসী কোটে” ঘাতাঘাত শুরু করতে হতে পারে। সেইজ্যাই বিজ্ঞাপনের তাকমাফিক পরিমাপটা জানা নিতান্তই দরকার। অর্থনীতিবিদেরা যে সমস্ত “ফরমূল” বানিয়েছেন, তার একটি নিয়ে আলোচনা করা যাক।

মনে করুন আপনি মাথার তেলের ব্যবসা করবেন—শ'খানেক টাকা খরচ করার ইচ্ছা। এই ১০০ টাকা আপনি নানাভাবে খরচ করতে পারেন। ৮০ টাকা তেল তৈরী করতে চেলে হয়তো ৪০ বোতল তেল তৈরী হোল। ২০ টাকা খরচ করলেন বিজ্ঞাপনের পিছনে। ধরুন তার ফলে ৪০ বোতল বিক্রী হল ৪ টাকা দরে ১৬০ টাকায়। আপনার লাভ হোল নগদ ৬০টি টাকা। এর বদলে ৮৫ টাকা তেল তৈরীতে খরচ করলে হয়তো হোত ৪২ বোতল। বিজ্ঞাপনে বাকী ১৫ টাকা খরচ করে বিক্রী হোল প্রতি বোতল ৩০ টাকা দামে। সব মিলে উঠল ১৪৭—আপনার লাভ হোল মোটে ৪৭টি টাকা। ঐরকম নানাভাবে এই ১০০ টাকা খরচ করা চলে। স্বীকৃত জন্য কয়েকটি সন্তানাকে ছকে পেঁথে ফেলা যাক। ধরে নেওয়া গেল যে ৫ টাকার কম খরচ বাড়ানো কমানো সম্ভব নয়।

মোট খরচ	তেল তৈরীর খরচ	বিজ্ঞাপনের খরচ	জিনিসের পরিমাণ	দাম	মোট আয়	লাভ
১০০	৮৫	১৫	৪২	৩।।০	১৪৭	৪৭
১০০	৮০	২০	৪০	৮।।	১৬০	৬০
১০০	৭৫	২৫	৩৮	৮।।০	১৭।।	৭।।
১০০	৭০	৩০	৩৫	৫।।	১৭৫	৭৫
১০০	৬৫	৩৫	৩২	৫।।০	১৬৮	৬৮

এই হিসাব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জিনিস তৈরী করতে ৭০ টাকা আর বিজ্ঞাপনে ৩০ টাকা খরচ করে লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী—গোটা ৭৫টি টাকা।

মোট খরচের পরিমাণটা মনে করুন এবার কমানো হোল। আপনি ঠিক করলেন যে সব মিলে ৯০ টাকা খরচ করবেন—তেল তৈরী আর বিজ্ঞাপন দেওয়া ওরই অন্তর্ভুক্ত। ১০০ টাকা খরচের যেমন একটা ছক উপরে বানানো হয়েছে, ৯০ টাকারও ঐরকম একটা ছক বানানো যেতে পারে। তাতে হয়তো দেখা গেল যে ৬৫ টাকার জিনিস তৈরী করতে আর ২৫ টাকা বিজ্ঞাপন দিতে খরচ করে টাকা উঠছে সবচেয়ে বেশী—ধরুন ১৬০ টাকা। তাহলে ৯০ টাকা সবচেয়ে সেরাভাবে খরচ করলে ৭০ টাকা অবধি লাভ করা যেতে পারে। আবার এইভাবে হিসাব করে দেখলেন যে ১১০ টাকা যদি খরচ করেন, তবে তার থেকে ১৯০ টাকা অবধি তুলতে পারেন। অর্থাৎ ১১০ টাকার সেরা লাভ হচ্ছে

৮০ টাকা। এই যে আলাদা আলাদা পরিমাণে খরচ করা হচ্ছে, এরও একটা তালিকা বানানো যেতে পারে।

মোট খরচ	সবচেয়ে বেশী আয়	সবচেয়ে বেশী লাভ	জিনিস তৈরীর খরচ	বিজ্ঞাপনের খরচ
৯০	১৬০	৭০	৬৫	২৫
১০০	১৭৫	৭৫	৭০	৩০
১১০	১৯০	৮০	৭৫	৩৫
১২০	১৯৫	৭৫	৮০	৪০

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যখন মোট খরচ ১১০ টাকা তখন লাভ হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। ১৫ টাকা জিনিস তৈরীতে আর ৩৫ টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করে নগদ আশ্চর্য টাকা লাভ করা যাচ্ছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞাপনের “বাস্তুনীয়” (Optimum) খরচ।

এই প্রক্রিয়ায় হিসাব ঠিক করা নিয়ে নানা আপত্তি উঠেছে। একদল অর্থনীতিবিদ্রা দেখিয়েছেন যে ৩৫ টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ করা হবে বলে কিছুই বলা হোল না। নানারকম বিজ্ঞাপন আছে—এক একটার এক এক রকম ফল। বিজ্ঞাপন তো আর হিন্দী সিনেমার গান নয় যে একটার সঙ্গে আরেকটার তফাও বের করা যাবে না। দেখে যতটা কঠিন মনে হয় আসলে কিস্ত সমস্তাটি তত বড় নয়। আমরা এতক্ষণ যে নিয়ম অনুসরণ করছি, তাতেই এর জবাব মিলবে। ৩৫ টাকার বিজ্ঞাপন বলতে আমরা বুবিয়েছি ঐ টাকার সবচেয়ে বেশী ফলপ্রদ বিজ্ঞাপন। এমন অবস্থায় পৌছুতে হবে যে, কোন বিশেষ ধরণের বিজ্ঞাপনের খরচ বাড়িয়ে অন্য ধরণের পিছনে খরচ কমিয়ে এর থেকে বেশী টাকা তোলা সম্ভব নয়। তাই এ সমস্তাটির সমাধান করা খুব কিছু কঠিন বলে ভুল হবে।

আরেকটা আপত্তি উঠেছে লাভের মূল্য নিয়ে। আমরা এতক্ষণ ধরে এসেছি যে শুধু লাভ বাড়ানোই ব্যবসাদারের লক্ষ্য। কিস্ত অন্তিমেও তার নজর রাখা দরকার। যাবসায় বেশী দিন টিঁকে থাকা, ঝুঁকি কমিয়ে ফেলা, স্থানে দিনঘাপন করা—এসব দিকেও তার নজর রাখতে হয়। তার উপর লাভ বলতে শুধু এই মুহূর্তের লাভ বোঝায় না। আজকের বিজ্ঞাপনে হয়তো মাস ছয়েক বাদে কেনা বাড়তে পারে। লোকের মনের মধ্যে ছাপ রেখে যাওয়া বিজ্ঞাপনের কাজ, আর সেই ছাপের ফলে চাহিদা যেমন এক্ষুণি বাড়তে পারে, ছমাস বাদেও তেমনি পারে। তাই আমাদের হিসেবে প্রচুর গলদের অবকাশ আছে।

এর থেকেও বড় প্রশ্ন করেছেন অনেকে। ঠাঁরা বলেন যে বিজ্ঞাপনের খরচ বলে আর্দ্দে কোন আলাদা হিসাব নেই। বই বিক্রী করে যে ব্রাউন পেপারে দোকানদার সেটা মডেল সেটাও তো একটা বিজ্ঞাপন। সাহেবী দোকানে “সেলসগ্লার”টি যে ফিক করে একটু হাসল, এর মধ্যেও বিজ্ঞাপনের আমেজ আছে। এমন কি কোন জিনিসকে ভাল ভাবে তৈরী করাও তো তার একটা বিজ্ঞাপন। বইয়ের চকচকে মলাট দেখে কেনার ইচ্ছা আমাদের স্বাক্ষর হয় (‘আন্কালচর্ড’ আঁধ্যা পাবার ভয়ে আমরা তা নাই বা স্বীকার করলাম)!

এমন কি গল্পের বইএর গল্পটা ভাল হওয়াও তো তার একটা বিজ্ঞাপন। তাই বিজ্ঞাপনের খরচ বলে আলাদা কোন হিসাব ঠিক রাখা সম্ভব নয়। যে খরচে লোকের চাহিদা বাড়ে তাকে যদি বিজ্ঞাপনের খরচ বলি, তবে গ্রায় সব খরচই বিজ্ঞাপনের খরচ।

আবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন ব্যবসাদারকে যে আমরা এতক্ষণ সবজাত্তা বলে ধরে রেখেছি, তার ভিত্তি কতটুকু? বিজ্ঞাপনে কর্তৃ খরচ করলে কি দামে জিনিসটা বিক্রী হবে, তা সে জানবে কেমন করে? তাই তার পক্ষে ভেবেচিন্তে সেরা হিসাবটা বের করা নিতান্তই অসম্ভব।

এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এতক্ষণ ধরে আমরা যে নিয়ম খাড়া করলাম তার মূল্য খুব বেশী নেই। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যবসাদারেরা এ নিয়ম মোটেই অহুমানণ করে না। তারা দাম বা খরচ বাড়িয়ে কমিয়ে দেখে তার ফল কি হচ্ছে। এই “ট্রিয়াল এণ্ড এরুন” পদ্ধতিতেই তাদের হিসাব ঠিক হয়। আমাদের নিয়মটার মূল্য শুধু এইখানেই যে ব্যবসাদার যদি লাভটাকে চূড়ান্ত বানাতে চায় তবে তার ঠেকে শেখার মধ্যে দিয়েই নিজের অঙ্গাতে সে এই নিয়মটি অহুমানণ করবে।

এর পরে আসা যাক একটা বড় প্রশ্নে—বিজ্ঞাপন থেকে সমাজের কি লাভ হয়? অনেকে বলে থাকেন যে বিজ্ঞাপনের ভিত্তি দিয়ে আমরা অনেক খবর পাই। কোথায় কি সিনেমা চলেছে, কোন দোকানে জুতোর দাম কমেছে এসব খবর আমরা বিজ্ঞাপন মারফতই পেয়ে থাকি। কিন্তু এর উন্টে দিকটাও আছে। বিজ্ঞাপনে খবরের থেকে “অথবা”ই আমরা বেশী পাই। বিজ্ঞাপনের কাজ নয় বিজ্ঞাপনকে আপন করা—তার কাজ হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ লোককে ধোকা দিয়ে বিক্রী বাড়ানো। “নিউ সান্ডুভ্যালী” যে নতুন সান্ডুভ্যালী নয়, “ফেমাস সান্ডুভ্যালী” যে সেই প্রদিক্ষ সান্ডুভ্যালীর থেকে সংযোগমুক্ত, “অরিজিনাল সান্ডুভ্যালী” যে আসল সান্ডুভ্যালী থেকে বিচ্ছিন্ন,—সেকথা অনেকেই জানে না। বলুন তো কোলকাতায় লক্ষ্মীবাবুর সোনা ওর চাঁদিকো অস্লি দোকান কটা আছে? বিজ্ঞাপনের বহু দেখে দ্বিগুণ দাম দিয়ে আপনি যে হাত ঘড়িটা কিনলেন, বাড়ী এসে হয়তো দেখবেন সেটা দ্বিগুণ স্পীডে চলছে। জেফারসন যতই বলুন না কেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনেই একমাত্র সত্যি কথা পাওয়া যায় (“Advertisements contain the only truth to be relied on in a newspaper”), আমরা জানি কল্পনাশক্তির উপরাক সেরা পরিচয় মেলে বিজ্ঞাপনে।

এ সব আলোচনা ছেড়ে এবার ঢোকা যাক খাস অর্থনীতিতে। কেম্ব্ৰিজের এক অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছেন যে অযোগ্য ব্যবসাদারেরাই (inefficient producers) বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে বেশী খরচ করে। এর ফলে লোকে অযোগ্য কোম্পানীর কাছ থেকে বেশী জিনিস কেনে। ফলে, ভাল প্রতিষ্ঠানের জায়গায় খারাপ প্রতিষ্ঠানই বাড়বার বেশী সুযোগ পায়। তাই বিজ্ঞাপনের ব্যবহারে সমাজের ক্ষতির পরিমাণ, লাভের অক্ষ থেকে অনেক বেশী।

এর উভয়ে বিজ্ঞাপনের সমর্থকেরা বলে থাকেন যে বিজ্ঞাপনের একটা ভালো দিক লোকে অনেক সময়ে ব্যবহৃত পারে না। বিজ্ঞাপনে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হয়। বিজ্ঞাপন তৈরীর কাজে কিছু লোক চাকরী পায়। এই সমস্ত লোক আবার এই অর্জিত টাকার কিছু অংশ খরচ করে। যে সব জিনিস কিনতে এ টাকা খরচ হয় সে সব জিনিস তৈরীতে লাভ বাড়ে—তৈরীও বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে। এতেও কিছু লোকের চাকরী জোটে। তারা আবার তাদের রোজগার কিছু খরচ করে। আবার কিছু নতুন লোকে চাকরী পায়। এই ভাবে বেড়ে চলে চাকুরে লোকের সংখ্যা (multiplier process)।

বেকার সমস্যার আর এক ভাবেও সমাধান হতে পারে। বিজ্ঞাপনের দুরণ লোকে জিনিস কেনে বেশী—ফলে সেই সব জিনিস তৈরীও হয় বেশী। কাজেই বেশী লোকের চাকরীর সংস্থান হয়।

কিন্তু ব্যাপারটাকে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আসলে তা নয়। ব্যবসাদারেরা যদি লাভ বাড়া সত্ত্বেও একজোট হয়ে ঠিক করে, জিনিস তৈরী বাড়ানো হবে না? এক্ষেত্রে যেহী জিনিস কেনার ইচ্ছার ফলে জিনিসের দামই শুধু বাড়বে, আর বাড়বে ব্যবসাদারের মুনাফা—বেকার সমস্যার কোনও সমাধান হবে না। যেখানে একটি ব্যবসাদারই কোন জিনিস তৈরী করছে (monopoly), অথবা যেখানে বেশ কয়েকজন ব্যবসাদারে মিলে ঠিক করেছে যে তারা একজোট হয়ে কাজ করবে (monopolistic combine), সেই সব বাজারে বিক্রী বাড়ার চেয়ে দাম বাড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই সমস্যাটি নিয়ে পূরো আলোচনা একটু বাড়াবাঢ়ি হয়ে পড়বে,—তবে এটুকু দেখা গেছে যে সাধারণতঃ চাকরী বাড়াবার উপায় হিসাবে বিজ্ঞাপনের দান খুব সামান্যই।

আর তাচাড়া যদিই বা ধরে নিই যে “লোক জোটানো” বিজ্ঞাপনে জিনিস কেনা বাড়ে, “লোক ভাঙানো” বিজ্ঞাপনে তো আর তা হয় না। থাস্কামডাকামডিতে দেশের লাভ করছে। তার উপর সত্যিই যদি অযোগ্য ব্যবসাদারেরা এতে স্ফুরিত পেয়ে যায়, তবে যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কাই আছে।

এইজগেই আজ পৃথিবীর আর সব দেশেই বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে এর একটি বিশেষ খোলা হয়েছে এই কাজের জন্য। সেখানকার বিশেষজ্ঞরা বিবেচনা করেন কোনো বিজ্ঞাপনে অন্যায়ভাবে আত্মপ্রশংসা করা হয়েছে কিনা। একবার পৃথিবীবিশ্বায় এক গুঁড়ো দুরের কোম্পানী বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে সারাদিনের খাটুনীর ফলে এক রকম অস্থ হয় (“Night starvation”) যাতে সারারাত শুমের মধ্যেই জীবনী-শক্তি (energy) ক্ষয় হতে থাকে। ফলে—ভোর বেলাতেই ক্লাস্টি বোধ হয়, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফেল করে, ইত্যাদি। এ অস্থ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছি গুঁড়ো দুধ খাওয়া। ডাক্তারেরা এই রকম এক নতুন অস্থথের খবর পেয়ে তো অবাকু। খোজটোজ করে যখন বেরোল যে এই অস্থ পরিপূর্ণভাবেই এই দুরের কোম্পানীর কল্পনাপ্রস্তুত, তখন এই ধরণের

বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হোল। আরেকবার এক নামকরা সিগারেট কোম্পানী দাবী করেছিল যে ঐ সিগারেট পান করলে গলার উপকার হয়। তাকারেরা এই অভিয আবিশ্বাস করায় এই ধরণের বিজ্ঞাপনও তুলে দেওয়া হয়। আবার ধরন পেটেন্ট ওয়ুধে অ্যায় প্রচারের কথা। তু মিনিটে যান্না আরোগ্য, তিন মিনিটে হাপানি নীরোগ,—এ সমস্ত বিজ্ঞাপনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কর্তৃক তাত্ত্ব জানাই আছে। বিলেত, আমেরিকা প্রত্তি দেশে নিয়ম করা হয়েছে যে “পেটেন্ট” ওয়ুধের গায়ে তার রাসায়নিক “ফরমুলা” লিখে দিতে হবে। এই রকম নানা উপায়ে অসাধু বিজ্ঞাপন বন্ধের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই জাতীয় দু একটা নিয়মে আর কর্তৃকৃত বা করা সম্ভব?

ধনতাত্ত্বিক দেশে যতদিন বাজার নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকবে, ততদিন লোকভাঙ্গনে বিজ্ঞাপন বন্ধ করা অসম্ভব। ঐ বিজ্ঞাপন বন্ধ করার চেষ্টা হলে ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে অচণ্ড প্রতিবাদ উঠবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হয়তো সেই প্রতিবাদ উপেক্ষা করা উচিত হবে, কিন্তু তা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ধনতাত্ত্বিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদের মূল্য অনেক।

আরেকটা গুরু রইল—লোকভাঙ্গনে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে লোকজোটানো বিজ্ঞাপনের তফাত করবো কি করে? একটিকে বন্ধ করতে গেলে আরেকটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। “জগুবাবুর রসগোল্লা—আহা, যেন অমৃত!”—এই বিজ্ঞাপনে রসগোল্লা কেনা হয়তো অনেকে নতুন করে শুরু করতে পারে, আবার অনেকে দাশুবাবুর দোকান ছেড়ে জগুবাবুর থেকে কেনা আরম্ভ করতে পারে। তাই নিয়ম করে লোকভাঙ্গনে বিজ্ঞাপন বন্ধ করার উপায় খুব সামাগ্রী। ধনতাত্ত্বিক সমাজে এই বাজে খরচটুকু বাঁচাবার উপায় নেই। সমাজতাত্ত্বিক রাষ্ট্রে অবগু সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ। সরকার থেকে সেখানে কারবার চালানো হচ্ছে—তাই জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব নিজেরাই ঠিক করতে পারেন দেশের প্রয়োজনের জন্য কর্তৃ বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত। কিন্তু ধনতন্ত্রে সেই স্থানের অভাব স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায়। তাই বর্তমান সমাজব্যবস্থার পক্ষে বেশ খানিকটা অ্যায় বিজ্ঞাপনকেও দরকারী বলে ধরে নিতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছুটা বিজ্ঞাপন সমাজের পক্ষে দরকারী, আর কিছুটা অদরকারী বাজে খরচ মাত্র। কর্তৃ প্রয়োজনীয় আর কর্তৃ অপ্রয়োজনীয় নির্ভর করে বাজারের অবস্থা আর সমাজের ব্যবস্থার উপর।

সেদিন দেখছিলাম এক ইংরেজ লেখক বিজ্ঞাপনকে গালাগাল দিয়েছেন “অমাহুষিক” বলে। সারা পৃথিবী জুড়ে যখন লোকে খাবারের অভাবে ভুগছে, শীতে কাপড়ের অভাবে জমে যাচ্ছে, রোগে বিনা ওয়ুধে মারা যাচ্ছে, তখন রঙ্গবেরঙের আলো দিয়ে মদের বিজ্ঞাপন দেওয়া তাঁর কাছে পাশাপিক ঠেকেছে। তিনি বিজ্ঞাপনের ভালো দিকটা দেখতে পান নি। বিজ্ঞাপন মাহুষকে দেয় সমাজচেতনা। মা খেতে পেয়ে মরার সময়ে “নিয়ন্ত্রিত লাইটিং” এ ডিনার এবং ভাস্তবের বিজ্ঞাপন দেখে সমাজব্যবস্থা সংস্করণে যথেষ্ট সচেতন হওয়া যায়।

ର୍ୟାନ୍ଡମ୍ (RANDOM)

ଅନ୍ତର ବନ୍ଦେୟାପାଧ୍ୟାୟୀ¹

‘ର୍ୟାନ୍ଡମ୍’ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ହଲେଓ ଶବ୍ଦଟିର ଜନପ୍ରିୟତା ବାଂଲାଯ କ୍ରମଶହୀ ବାଢ଼ିଛେ ଏବଂ ତାର ଗ୍ରହଣ ପ୍ରମାଣ ପାଓଯା ଯାବେ ପାଡ଼ାୟ ପାଡ଼ାୟ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଲୋୟ ଛେଲେଦେର ସେ ଆଡ଼ା ବସେ ତାଇତେ । “ଅୟୁକ୍ତ ଆଜକାଳ ‘ର୍ୟାନ୍ଡମ୍’ ମିଥ୍ୟେ କଥା ବଲଛେ” କିମ୍ବା “ଲର୍ଡ୍ସେ ଉତ୍ତରିଗର ତଥନ ର୍ୟାନ୍ଡମ୍ ପିଟୋଛେ” ଏହି ଧରଣେର କଥା ଏହି ସବ ବଡ଼ ସମାଜସଂସ୍କାରକ ବା କ୍ରିକେଟ୍-ସମାଲୋଚକଦେର ମୁଖ ଥେବେ ହାମେଶାଇ ଶୋନା ଯାବେ । ବସ୍ତୁତଃ ଏ ରକମ ଆରା ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହଜେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ଯେତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ‘ରାଶିବିଜ୍ଞାନେ’ (Statistics) ଏହି କଥାଟିଇ ସେ କଥାଟିନି ମୂଳ୍ୟବାନ ଏବଂ କଥାନି ଓଜନ କରେ ଏକେ ବ୍ୟବହାର କରତେ ହ୍ୟ ଜାନଲେ ଅବାକ ହେଁ ଯେତେ ହ୍ୟ ।

ଓପରେ ସେ କଟି ଉଦ୍ଦାହରଣ ଦିଯେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାବଳେର ଏକେବାରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିର ପରିଚ୍ୟ ଦେଓଯା ହଲ ସେଗୁଲି ନା ହ୍ୟ ବାଦ ଦେଓଯା ଯାକ । ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସଥନଇ କକ୍ତକଣ୍ଠି ଜିନିର ଏକେବାରେଇ ଏଲେମେଲେ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବେଛେ ନେନ ତଥନଇ ଏ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରେନ । କିନ୍ତୁ ରାଶିବିଜ୍ଞାନେର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରା ଯାଯ ସେ ଓପର ଥେବେ ଯା ହସ୍ତ ଏକେବାରେଇ ପକ୍ଷପାତର୍ବିଜ୍ଞାନ ନିର୍ବାଚନ ମନେ ହେଁବେ ଅଞ୍ଜାତସାରେ ତାରଇ ଓପର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେବେର ନିଜ୍ସ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଁବେ—ଅର୍ଥାତ୍ ତାରା ସେ ଅର୍ଥେ ‘ର୍ୟାନ୍ଡମ୍’ ବଲଛେନ ସେ ଅର୍ଥେ ‘ର୍ୟାନ୍ଡମ୍’ ହ୍ୟ ନି ।

ଉଦ୍ଦାହରଣ ଦେଓଯାର ଆଗେ ‘ସ୍ଥାନ୍ତର୍ମୂଳ’ (sample) ବଲେ ଆର ଏକଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦେର ମଧ୍ୟେ ପରିଚିତ ହେଁ ଥାକା ଭାଲ । କୋନ ସମଟି (population) ମଧ୍ୟକେ କିଛୁ ମତୀମତ ପ୍ରକାଶ କରାର ପ୍ରୋଜନ ହଲେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ସମଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ପରୀକ୍ଷା କରା ମୁକ୍ତବ ହ୍ୟ ନା । ଯେମନ ଯଦି କୋନାଓ ଉପଜାତିର ଗଡ଼ ଉଚ୍ଚତା ଜାନା ଦରକାର ହ୍ୟ ତାହଲେ ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକକେ ଧରେ ମାପ ନେଇଯାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ଵର୍ଗେ ତୋ ହେବେଇ ନା, ଏମନ କି ସବ ସମୟ ନିରାପଦତ୍ୱ ନାହିଁ । ତାର ଚେଯେ ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଥେବେ କିଛୁ ଲୋକକେ ବେଛେ ନିଯେ ତାଦେର ଗଡ଼ ଉଚ୍ଚତାଟା ମାପିଲେଇ ଆମ୍ରା ଜ୍ଞାତବ୍ୟବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମୋଟାମୁଟି ଏକଟା ଧାରଣା କରତେ ପାରି । ସୋଜା କଥା—ଭାତ ଗିନ୍ତ ହଲ କିନା ଲୋକେ ଏକଟା ଭାତ ଟିପେଇ ଦେଖେ ଏବଂ ଟ୍ରେଣେ ‘ତାନ୍ଦେନ’ଗୁଲି କେନାର ସମୟ ଲୋକେ ଛଟେ “ସ୍ଥାନ୍ତର୍ମୂଳ-ଗୁଲି” ଥେବେଇ ମନ ସ୍ଥିର କରେ । ସମଟି ଥେବେ ସେ କ’ଜନକେ ପରୀକ୍ଷାର ଜ୍ୟ ବେଛେ ନେଇଯା ହ୍ୟ ତାଦେରଇ ବଲେ ‘ସ୍ଥାନ୍ତର୍ମୂଳ’ ।

ସକଳେଇ ବୁଝିତେ ପାରଛେନ ଏହି ‘ସ୍ଥାନ୍ତର୍ମୂଳ’ଟି ସେ ସମଟି ଥେବେ ନେଇଯା ହଲ ସେଟା ତାଦେର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ (representative) ହେବେ ଉଚିତ । ‘ରାଶି-ବିଜ୍ଞାନେ’ ଭାଷାଯ ର୍ୟାନ୍ଡମ୍

୧ ପାଞ୍ଚନ ଛାତ୍ର (୧୯୪୯-୫୧)

শব্দটির প্রয়োগ এইখানে—অর্থাৎ স্থাপ্লাট যদি ‘র্যান্ডম্’ হয় তবেই তাকে মথার্থ প্রতিনিধিমূলক বলে মেনে নিয়ে গ্রহণ করা হবে। ‘র্যান্ডম্’ শব্দটির অর্থ মোটায়টি এই রকম ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে—যাদের ‘সমষ্টি’ থেকে স্থাপ্লাটি নেওয়া হচ্ছে তাদের প্রত্যেকেরই যদি স্থাপ্লাটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ার সন্তাননা সমান হয় তবেই স্থাপ্লাটিকে র্যান্ডম বলা হবে।

তারপরেই কথা ওঠে—স্থাপ্লাটি প্রকৃতপক্ষে র্যান্ডম হ’ল কি করে বোঝা যাবে? আগেই যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে—একেবারেই এলোমেলোভাবে বা কোনও রকম নির্যমের ধার না ধেরে নির্বাচন করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ‘র্যান্ডম’ হয় না। ধরে নেওয়া যাক, অত্যন্ত সংখ্যালঘু কোনও উপজাতির সংষ্ঠিক গড় উচ্চতাটা যেমন করেই হোক জানা আছে। একই ব্যক্তিকে দিয়ে বারবার স্থাপ্লাটানিয়ে অনেক জায়গাতেই দেখা যায় যে প্রতিবারেই স্থাপ্লাটির গড় উচ্চতা সমষ্টির প্রকৃত গড়-উচ্চতার চেয়ে বেশী হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি ‘র্যান্ডম্ স্থাপ্লাট’ টানতে যত চেষ্টাই করুন না কেন, নিজের অজ্ঞাত্যায়ে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। পক্ষপাত্রে কেউ আবার অপেক্ষাকৃত খর্বকায়দের পছন্দ করতে পারেন। ‘তানসেন’গুলির ব্যাপারেও এই একই ঘটনা খুব সাধারণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোকে স্থাপ্লাটে সামান্য বড় ‘গুলি’ই বেছে নেন।

এখন ‘তানসেন’গুলির ব্যাপারে “উচ্চতা-সংক্রান্ত” উদাহরণের সঙ্গে একটা প্রত্যেক সহজেই উল্লেখ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে স্বাদ-পরীক্ষার জন্যে স্থাপ্লাট টানা হচ্ছে এবং আয়তন একটু বড় হল কি ছোট হল তাতে স্বাদের কি আসে যায়? বস্তুতঃ একথা ঠিক। যদি স্থাপ্লাট র্যান্ডম না হওয়ার কারণ যে পক্ষপাত সেটা এমন কোনও দিকে হয় যার সঙ্গে পরীক্ষণীয় বিষয়ের কোনও সম্পর্ক নেই, তাহলে সত্যিই কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু মুক্ষিল এখানেই যে, ওপর থেকে যা হয়ত একেবারেই সম্পর্কহীন অনেক মন দিয়ে ভাবলে বা পরীক্ষা করলে তারই ভেতর সম্পর্ক বার করা যায়। ‘তানসেন’গুলি সম্পর্কহীন হলেও অনেক খাবার জিনিষ আকৃতি-নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু ধৰন—কলকাতা শহর থেকে পঞ্চাশ জনের একটা স্থাপ্লাট চাই। এলোমেলোভাবে টেলিফোন ডি঱েক্টেরিং গোটা দশেক পাতা খুলে তার প্রতি পাতা থেকে গোটা পীচেক করে নাম বেছে নেওয়া যেতে পারে। এখন টেলিফোন ডি঱েক্টেরিতে সাধারণতঃ যাদের নাম পাওয়া যায় তাদের আর্থিক অবস্থা বা আয় গড়গড়তার চেয়ে উচুতে এবং আমাদের পরীক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে আর্থিক অবস্থা বা অর্থের কোনও সম্বন্ধ থাকলেই স্থাপ্লাট পক্ষপাতহৃষ্ট হয়ে যাবে। আরও অস্বিধে এই যে অর্থের সঙ্গে বা আয়ের সঙ্গে যে কত জিনিষের অস্তিনিহিত কত রকম সম্পর্ক থাকে তার হিসেব নেই এবং ওপর থেকে তা বোঝা না গেলে পরীক্ষার ফলে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

আমেরিকার একটি ঘটনায় আর একটি স্বন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালে

ক্রজ্জেন্ট ও রিপাবলিকান্প্রার্থী ল্যাণনের নির্বাচন-যুদ্ধের প্রাকালে লিটারারি ডাইজেষ্ট (Literary Digest) বলে একটি কাগজ ১ কোটি লোকের একটি স্থাপ্ল নিয়ে তাদের ব্যালটে ভোট গ্রহণ করেন। ফলাফল দেখে ল্যাণন জিতবেন বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু জিতনেই ক্রজ্জেন্ট। ফলে সাধারণ লোকে রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সব কথা বলল তা কোনও হিসেবেই প্রশংসা বলা চলে না। তখন প্রকৃত রাশি-বিজ্ঞানীরা এর জবাব দিলেন। স্থাপ্লটি মেট্রিগাড়ী ও টেলিফোনের লাইসেন্সধারীদের মধ্যে থেকে নেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার শতকরা ৪০ থেকে ৫৫ জন লোক এর মধ্যে পড়েন। স্বতরাং বোঝাই যাচ্ছে যাকি লোকসংখ্যা (অর্থাৎ যাদের গাড়ী বা টেলিফোনের লাইসেন্স ছিল না) সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়েছিলেন এবং এদের মধ্যে বেশীরভাগই ক্রজ্জেন্ট ও তাঁর 'নিউ ডিল' (New Deal)-এর সমর্থক ছিলেন। স্বতরাং এ স্থাপ্ল থেকে উল্টো ফল পাওয়া একেবারেই বিচিত্র নয়। একেবারেই উল্লেখযোগ্য, ঐ নির্বাচনেই 'ফরচুন' (Fortune) বলে আর একটি কাগজ প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাত্র ৩০০০ লোকের স্থাপ্ল নিয়ে ঠিক ফল ঘোষণা করতে পেরেছিলেন।

এই সব দুরহ ও নিগৃহ সম্পর্কের অস্তিত্ব দমকে স্থির মত দেওয়ার বামেলা কম নয় এবং রাশি-বিজ্ঞানে—যেখানে অনবরত এই সব স্থাপ্ল নিয়ে কাজ হচ্ছে—এর পেছনে সময় নষ্ট করাও চলে না। স্বতরাং প্রায় সব রকম ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী অন্য উপায় বার করে এ সমস্তার সমাধান করা হয়েছে।

যে সমষ্টি থেকে আমরা স্থাপ্ল টানছি—সেই সমষ্টির প্রতিনিধি হিসেবে যদি অন্য কোনও স্ব-বিধাজনক জিনিয়ে দাঁড় করান যায় তবে হাঙ্গাম অনেক কমে যায়। যেমন, যে সব লোকের মধ্যে থেকে আমরা স্থাপ্ল টানব তাদের প্রত্যেকের বদলে একটা করে তাস খাড়া করা যেতে পারে। হয়ত কোনও ক্লাসের ৪০ জন ছেলের মধ্যে থেকে পাঁচজনকে যেছে নেওয়ার দরকার। এক প্যাকেট তাস নিয়ে তার থেকে যে কোন ১২টা বাদ দেওয়া গে। এখন প্রত্যেক ছেলেকে যাকি ৪০ খানা তাসের এক একটা দিয়ে বোঝান যেতে পারে—যেমন 'রাম-ইঙ্গাপনের টেক্কা', 'শ্বাম—চিড়িতনের সাহেব', 'ষদ—হৃতনের বিবি', 'মধু—ঝইতনের বিবি' ইত্যাদি। যদু মধুর তাদের প্রতিনিধিদের বিকল্পে আপত্তি করা একেবারে খুবই স্বাভাবিক, তবু বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাদের কোনরকমে বুবিয়ে ৪০টি তাস ভাল করে তাসিয়ে যে কোনও পার্টি টানা যেতে পারে এবং যদু ও মধুকে এই বলে আশ্বাস দেওয়া হবে যে হৃতনের বা ঝইতনের বিবি উঠলেই তাদের স্থাপ্লে নেওয়া হবে।

এই কায়দা আরও নানা উপায়ে করা যেতে পারে। একটা সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত—সাধারণ লটারীর নিয়ম। এক রকম কাগজে সবগুলো নাম লিখে তারপর টানা। সমষ্টি বড় হলে এতে আপত্তি যথেষ্ট এবং সব ক্ষেত্রেই ইচ্ছে করলে সুস্থ আপত্তি তোলা যেতে পারে। যেমন—লটারীর সব কাগজ অবিকল একরকম নয়, যাদের বড় কাগজ

তাদের স্ববিধা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এই ধরণের সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে তাদের বিস্তৃত আপত্তি করাই সবচেয়ে শক্ত যদিও চেষ্টা করলে টানা-সংক্রান্ত ব্যাপারে করা যায়। আর সবচেয়ে অস্ববিধা এই যে, প্রগল্পী র্যান্ডম কি না সে বিষয়ের কতকগুলো পরীক্ষা আছে এবং সেগুলি এদের ওপর প্রয়োগ করে দেখান খুব কঠিন অর্থাৎ আপত্তির ছজগ তুলে ঠাণ্ডা করা মুশ্কিল।

এ সব-কিছুর হাত থেকে সহজে নিষ্পত্তি পাবার জন্যে রাশি-বিজ্ঞানীরা যা তৈরী করেছেন তার নাম র্যান্ডম স্ট্যাম্পিং নাম্বার। জিনিষটার চেহারায় বিশেষত্ব কিছুই নেই । থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি পর পর এলোমেলোভাবে পাতার পর পাতা এই রকম সাজান আছে:—

২৩	১৫	৭৫	৪৮	৮৩	৭২	৫৯	৯৩	৭৬	২৪
৯৭	০৮		৪৮	৯৬					

এদের সমস্তে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ এই যে এরা একেবারে একটানা—কোথাও স্বরূপ বা শেষ বা বিরতি নেই—অর্থাৎ যেখান থেকে খুশী স্বরূপ ধরে যেখানে খুশী শেষ করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে যেটুকু ফাঁক দেখা যাচ্ছে সেটুকু শুধু ছাপা ও ব্যবহারের স্ববিধের জন্য। প্রকৃতপক্ষে জিনিষটা এই রকম—

২৩	১৫	৭৫	৪৮	৮৩	৭২	৫৯	৯৩	৭৬	২৪	৯৭	০৮	৪৮	৯৬
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

এক লাইনের তলায় আর এক লাইন বসান হয়েছে তার একমাত্র কারণ কাগজের প্রয়োজন সীমাবদ্ধতা। আর প্রধানতঃ দুটি নিয়ম মেনে এগুলি তৈরী করা হয়েছে—(১) যে কোনও স্থানে—০ থেকে ৯ পর্যন্ত অক্ষের আসন লাভ করার সম্ভাবনা সমান এবং (২) একটি স্থান পূরণের সঙ্গে আর একটি স্থান-পূরণের কোনপ্রকার সম্বন্ধ নেই।

এগুলির ব্যবহার যত্থ মধ্যে উদাহরণ দিয়েই বোঝান চলতে পারে। ৪০ জন ছেলের প্রত্যেককে দুই অক্ষ বিশিষ্ট এক একটি সংখ্যা দিয়ে বোঝান যায়। যাদের সংখ্যা '১', '২' বা '৯' ইত্যাদি হবে তাদের যথাক্রমে ০১, ০২, ০৯ ইত্যাদি বলে ধরা হবে। র্যান্ডম স্ট্যাম্পিং নাম্বারের যে কোনও পাতা খুলে যে কোনও সংখ্যা থেকে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। যদি ওপরে যেটুকু দেওয়া আছে তার '৮' থেকে কাজ স্বরূপ হয় তাহলে—৮৮, ০১, ২৫, ৯৯—এমনিভাবে সংখ্যাগুলিকে নেওয়া হবে এবং ৮৮, ৯৯ ও ৪০-এর চেয়ে বড় অন্য সংখ্যাগুলিকে বাদ দিয়ে ২৫, ৩৭ এগুলিকে গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ তারা যে যে ছেলেগুলির নথর তাদের নেওয়া হবে। পাঁচটি ছেলেকে পাওয়া গেলেই স্ট্যাম্প গ্রহণের কাজ শেষ হবে।

দুই অক্ষ বিশিষ্ট ১০০টি সংখ্যা আছে ০০—৯৯। এক্ষেত্রে আমরা মাত্র ৪০টিকে ব্যবহারের উপযোগী মনে করছি—ফলে গ্রহণযোগ্য নয় এমন সংখ্যা এখানে বড় বেশী দাঁড়ায়। এই অস্ববিধা নিবারণের জন্য “ভাগশেষ নিয়মের” প্রবর্তন করা হয়। অর্থাৎ ৪১কে

আমরা বরখাস্ত করব না—৪০ দিয়ে ভাগ করব এবং ভাগশেষ যে ছেলেটির সংখ্যা (এখানে '০১' নং ছেলেট) তাকে অঙ্গ করব । অর্থাৎ ৪৪ আর ০৪, ৫৪ আর ১৪ একই ছেলেকে বোঝাবে ।

কিন্তু এত করেও গ্রহণের অযোগ্য সংখ্যা একেবারে নির্মূল করা যাবে না । কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে—প্রথম ছেলেটি তার প্রতিনিধি হিসাবে তিনটি সংখ্যা পাচ্ছে—১, ৪১, ৮১ এবং ১৯৮ ছেলেটি পর্যন্ত প্রত্যেকেরই তিনটি করে সংখ্যা আছে । কিন্তু তারপর থেকেই প্রত্যেকের মাত্র দুটি করে যেমন ৩০৮ পাচ্ছে ৩০ ও ১০ । সুতরাং র্যান্ডম স্টাম্পিং নাম্বার—যাতে দুই অঙ্গ বিশিষ্ট সব সংখ্যারই আসার সন্তাবনা সমান—ব্যবহার করলে প্রথম ১৯ জন ছেলের স্টাম্পলে আসার সন্তাবনা বাকি সকলের চেয়ে বেশী হয়ে যায় । সুতরাং সাময়ের দোহাই দিয়ে ৮১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা পেলেই বরখাস্ত করতে হবে । একই কারণে ০০ ও ৮০-র মধ্যে একটিকে বাদ দিতে হবে ।

কিন্তু “র্যান্ডম স্টাম্পিং নাম্বার”-এর চেহারা যতই সামান্যিধি হোক না কেন, পূর্ণাঙ্গিক দুটি সর্ত পালন করে তৈরী করা খুব সোজা নয় । নানা রকম ভাবে তৈরী করা যেতে পারে—তবে বর্তমানে যে সব উপায় বেরিয়েছে তারই একটির উল্লেখ করা হচ্ছে । একটি গোল চাকাকে দশটি সমান ভাবে ভাগ করে । থেকে ৯ পর্যন্ত, এক এক ভাগে বসান হয় । তারপর সেটি জোরে ঘোরান হয় । এই চাকার পাশে একটি কাঁটা থাকে । ঘূর্ণন্ত চাকাটির ওপর মাঝে মাঝে হঠাতে এলোমেলো আলো ফেলা হয় এবং এত কম সময়ের জ্যে যে চাকাটিকে স্থির মনে হয় । সেই মুহূর্তে গ্রীষ্মে কাঁটাটির সামনে যে সংখ্যাটি পড়ে দোটিকে লিপিবদ্ধ করা হয় । এইরূপে সমস্ত র্যান্ডম স্টাম্পিং নাম্বার তৈরী করে ফেলা হয় ।

কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমানেরা ধরে বলবেন—“বাপু, তোমার মাঝে-মাঝে হঠাতে এলোমেলো আলো ফেলার মানে কি ?” ধরেছেন ঠিক । আসলে সত্যিই এগুলি “র্যান্ডম আলো-ফেলা” কথাটি ঢাকার প্রচেষ্টা । তাহলে গোড়ায় সেই গলদ থেকেই যাচ্ছে অর্থাৎ “র্যান্ডম স্টাম্পিং নাম্বার” তৈরী করার সময়ই র্যান্ডম আলো ফেলার প্রয়োজন হচ্ছে । প্রকৃত বুদ্ধিমানের প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন । শুধু এইকথাই বলা যায় যে, সাধারণ বা প্রচলিত অর্থে এলোমেলো আলো ফেলে যে র্যান্ডম নাম্বার তৈরী হয়েছে তা নানারকম পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সত্যিই র্যান্ডম এবং ইটেই সবচেয়ে বড় কথা । অর্থাৎ ফলাফল দিয়ে আলো ফেলার বিরুদ্ধে কোনও পক্ষপাত প্রমাণ করা যায় নি । র্যান্ডম স্টাম্পিং নাম্বার তৈরীর প্রায় সব প্রগালীতেই এটুকু অভিযোগ থাকে এবং সর্বত্রই একই জবাব দিতে হয় ।

এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ যদি মনে করেন যে সবসময় র্যান্ডম স্টাম্পিং নাম্বার পকেটে করে ঘোরা উচিত এবং ট্রেণে তানসেন গুলি খাওয়ার সময় পর্যন্ত এই করে গুলির সংখ্যা গুণে যথাযোগ্য অঙ্গবিশিষ্ট সংখ্যা প্রত্যেক গুলিতে লাগিয়ে স্টাম্পল মুখে ফেলা উচিত তাহলে

আমায় সত্যিই তুল বোঝা হবে। আমি শুধু বলতে চাই যে র্যান্ডম্ শব্দটির পাড়ার ছেলেদের মুখে যত 'র্যান্ডম্' ব্যবহারই হোক না কেন বা যতই হাঙ্গা বোধ হোক না কেন, এমন ক্ষেত্রে আছে যেখানে এর গুরুত্ব যথেষ্ট এবং কেবল এই একটি মাত্র শব্দকেই যথাযথ প্রয়োগ করার জন্য বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়ান।

গ্রন্থ-পরিচয়

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য

উড়ো চিঠির ঝাঁক : অশোকবিজয় রাহা ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ আড়াই টাকা ॥
কোনার্ক : জীবনকৃষ্ণ শেষ ॥ ডি. এম. লাইব্রেরী ॥ দেড় টাকা ॥

ইংরাজের ভূমিকল্প, ফরমোসা থেকে আইসেনহাউয়ের ৭ম রণতরীবাহিনী অপসারণ, সিকিটারিটি বিল, উর্বাস্ত বেকার শুবকের রেলএক্সিনের শতায় আঞ্চ-নিক্ষেপ, শতাধিক চা-বাগান বক্স, হাজার হাজার বেকার প্রদ্রিক, রোজেনবার্গ দপ্তির প্রাপ্তরূপের জন্য পোপের আবেদন—

এমন সময় পড়লাম অশোকবিজয় রাহার 'উড়ো চিঠির ঝাঁক' এবং জীবনকৃষ্ণ শেষের 'কোনার্ক'। দু'জনেই কবি-ভার্যামাণ। একদিকে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তরেখা, আসাম-মণিপুরের জন্মস্থ ডনুর হন, দু'বের হৃদের বুকে নোঙর-করা বড়ান-পর্দত' টিলা। বালো, অঞ্জিকে কলিঙ্গ দেশের সমুদ্রকলোমুখের বিজয় বালুকাবেলায়' অতীত ভারতের ইতিহাসের চিরজ্ঞাগত শিখদৃষ্ট কোনার্কের সপ্তাখ্যবাহিত সূর্যমন্দির।

অশোকবিজয়ের চিঠিতে ডনুর হন, সেখানে 'হৃদের বুকে রঙের হোলিখেলা, ঘাসের উপর হীরে-পাইরার ঝুঁটি ছড়ানো, গোলমোর ডালে তোড়া তোড়া সোনালি রোদ, পাঁচীর পাথায় রঙের রামধনু' সেই অপরূপ সৌন্দর্য-লোক এক মহুর্তে যেন আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হোলো। অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞানবসন্ত' কাব্যের কয়েকটি কবিতা এমনি বিচ্ছিন্ন-মায়া একদিন রচনা করেছিল। অশোকবিজয়ের কাব্য পড়েও বলতে হল: "কী মাঝ লাগল চোখে!"

আর জীবনকৃষ্ণের কোনার্ক সম্পর্কিত কবিতাগুলি পড়তে পড়তে উদ্ঘাটিত হলো বহস্ত্রার, চলে গেলাম স্তুর অতীতের সহস্র স্মৃতিমূখের অর্কাতীর্থে, বহু শতাব্দী পূর্বের বিশু মহারাণার পুত্র ধর্মপদের জগতে, তার মহান আঞ্চলিকজ্ঞের দৃশ্যকাব্যে। আর দেখলাম গোরাঙ্গীতবীর মত ছুটে-চলা 'নোয়ানই', ভূতপাত্রীর দেশ, সূর্য-ভোবার মাঠ, যেখানে 'অঙ্ককার অবয়বী হয়, প্রেতলোকের ছায়া নামে, যিম আলোকে বালিয়াড়ি দংশ্য বিকাশ করে।'

অশোকবিজয়ের কাব্যে মায়াময় বর্তমান, জীবনকৃষ্ণের কাব্যে স্বপ্নময় অতীত। অশোকবিজয় লিখেছেন

মনের চাবি হারিয়ে গেছে অনেক দিন

হঠাৎ সেদিন কুড়িয়ে পেলাম সকালবেলা

ডনুর হন।

ମହିରୁ ତାଇ, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଏକମୁଗ ଆଗେ ପଡ଼େଛିଲାମ :

ତୋମାର ଦେଶେ ଆଜ ଏଦେହି ମେଯେ,
ଏଦେହି ଦେଖି ବନେର ପାଥୀ ସୁଣ୍ଠି ବୋଡ଼େଛେ
କଟି ପାତାଯ ସୋଣାଲି ରୋଦ ବିଳ ଧିଳ,
ଡାଲିମ ଗାଛେ କାଠବିଡ଼ାଲିର ଛୁଟାଛୁଟି
ଚାଲୁର ଘାସେ ହରିଗ-ଶିଶୁ ଖେଳା ।

ତୋମାର ମୁଖେ ଚେଯେ ଦେଖି ମେଯେ,
ତୋମାର କାଣେ ଦୁଟି ଲାଲ କାଞ୍ଚନଫୁଲ
ବେଗିତେ ସୋନାଲତା,
ତୋମାର ବୁକେ କମଳା-ରଙ୍ଗେ କାଁଚୁଲି
କଟିତେ ମେସ-ଡ୍ସରୀ,
ତୁମି କୋଥାଯ ଚେଯେ ଆହୁ କେ ଜାନେ !

[ଡଲ ଡ୍ସର ପାହାଡ଼]

ଆର ଆଜ ପଡ଼ିଛି :

କିନ୍ତୁ ଲାଲବାଗେର ଆରେକଟି ଝର୍ଣ୍ଣକେ ଭୁଲତେ ପାରଛି ନେ
ଏକେବାରେ କାହେ ଗିଯେ ଦେଖେଛି
ପାହାଡ଼ର ବୁକେ ମୁଖ ଗୁଞ୍ଜେ କାନାହେ
ପିଠେ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛେ ଏକ ରାଶ ଏଲୋଚୁଲ
ଛ'ପାଶେର ଚର୍ଚ ଚଲଣିଲି ହାତ୍ତ୍ୟାଯ ଉଡ଼େଛେ ।

[ଉଡ୍ଡୋ ଚିଠିର ଝାଁକ, ୪୧ ପୃଃ]

ଝର୍ଣ୍ଣ, ହୁମ, ଚାଲୁପାହାଡ଼, ପାଟିଲ ରଙ୍ଗେ ନଦୀ ସେ ଏମନ ବର୍ଣ୍ଣିଟା ନିଯେ ଅଶୋକବିଜ୍ଯେର କାବ୍ୟେ ଆକ୍ରମକାଶ କରେ
ତାର ମୂଳ ତାର ମନ, ତାର ଚୋଥ । ଜଗତେର ଓ ଦେଶେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତା ଯେ ତାର ମନକେ ଉଦ୍ଦେଲ କରେ ନା ତା ନୟ, କିନ୍ତୁ
ତାର ମନେର ସହଜାତ ପ୍ରାଣୀତିର ଆବାର ଜେଗେ ଓଠେ ଡିହାଂ-ନଦୀର ଦୀଂକ, ଭାନୁମତୀର ମାଠ, ଜଳ-ଡ୍ସର ପାହାଡ଼, ଡଲୁର
ଝୁମ । ତିବି ଏହି ଝାପନାଥେର ଦେଶେ ଆଜନ୍ମ ମାତୁଧ, ତାଇ ତାର କବିତା ଏମନ ସତେଜ ଯାକେ ପ୍ରାକୃତ-ବାଂଲାଯ ବଲା
ଉଚ୍ଚିତ, ତାଜା, ଟାଟିକା । କୋନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ବାହନେର କୋନ୍ତ ଗତାନୁଗତିକତା ତାର ରଚନାକେ ସ୍ପର୍ଶ
କରେ ନା । ତାର 'ଇମେଜ' ଯା ଝାପକଳ ଅଭିନବ, କିନ୍ତୁ ଆବୋଧ ନନ୍ଦ । ତାର କାରଣ ତାର ମନ ଏକେବାରେଇ ବୁଦ୍ଧିବିଳାସୀ
ନୟ, ପ୍ରାଣରୁଦେ ତାଜା । ଏହି ଉଚ୍ଚଲ ପ୍ରାଣରୁଦେଇ ଅଶୋକବିଜ୍ଯେର କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାତିମାନ ।

'ଉଡ୍ଡୋ ଚିଠିର ଝାଁକ' ଆମାର କାହେ ଥୁଲେ ଧରଲ ରଙ୍ଗ-ଭରା ଛବିର ଝାଁକ । ଛବିର ପର ଛବି, କଥାର ତୁଳିତେ
କୌ ଏତ ରଙ୍ଗ ଧରେ ? କଥାର ବୀଣା କୀ ଅନୁଷ୍ଠାନି ? ଅମି ପାତା ଓଲଟାଇ । ଆର :

"ଚୋଥ ବୁଜି—ହାତ୍ତ୍ୟାର ଫିଲ୍‌ଫିଲ୍, ମୋରାଛିଦେର ଗୁଞ୍ଜନ, ପାଥିର ଶିଦ୍

ଚୋଥ ଖୁଲି—ହୁମ, ପାହାଡ଼, ସୋନାଲି ରୋଦେର ମକାନ

ପାହାଡ଼ ମକାନ—ପାହାଡ଼ 'ମୋ'—

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

আবার চোখ বুজি

—পানকোঁড়ি ?

চোখ খুলি—

ইরিনি !

—কানে কাঁধন ফুল

—কোনে তরমুজ

ইরিনি !

হালকা চুল

পাতলা ঠোঁট

নীল চোখ

ইরিনি !

[পৃঃ ৪০]

অশোকবিজয় ঘাহুকর শিল্পী। তিনি তাঁর তুলির টানে টানে যে রঙ-রেখা বিশ্বাস করেছেন, তাঁর মধ্যে সহজে বর্ণালীর সঙ্গে সার্থক রস-ব্যঞ্জনার হরগোৱাত্ত সুষ্ঠ হয়েছে। ঘৰাঙ্কৰ কয়েকটি শব্দের কী আশ্চর্য শক্তি :

চুলে উড়ো মেষ

চোখে নীল পাহাড়

খিলখিল ঝর্ণার হাসি—

বন-পারি।

মংরকে পরিতে পেয়েছে।

পাহাড়ো মেয়ের ছবি। পাহাড়ের মেষ আৰ ঝর্ণায় উপমিত এমন জীবন্ত মেয়ের ছবি অশোকবিজয়ের তুলিই আকতে পারে।

‘উড়ো চিঠির ঝাঁক’ কাব্যে কবি শুধু নিসর্গের মায়াবিনী রাগের চলচিত্র রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। সেই নিসর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে নৱ-নারী, চুমকি-বামুরা তাঁদের টুকরো টুকরো ছবি সহজ বর্ণনার চেঙে অথচ দুর্বল রেখায় অঙ্কিত :

চুমকিকে দেখেছি সেদিন

দাঢ়িয়েছিল গেটের কাছে

পিঠে এলিয়ে পড়েছে আঙুরগুচ্ছের মতো একরাশ এলোচুল

শিরীষ গাছে অমেকক্ষণ ধ’রে কী দেখেছিল

হয়তো কোনো পাথি,

গেটের ওপাশে

ছুরি হাতে দুরস্ত কঁটার বেড়া হাঁটছিল ঝামুক।

[পৃঃ ১১]

দক্ষশিল্পিলভ বেখার বলিষ্ঠতা অশোকবিজয় আয়ত্ত করেছেন। ইরিনি, ধনেশ সিং, চুমকি, সিংজি, বাষ-মৰ্দার

দেশমূখ প্রভৃতির ছবি দু একটি কথার আঁচড়ে এমন উজ্জ্বল পরিপূর্ণতা পেয়েছে যে অন্ততঃ একটি উদ্ভুতি দেবোর লোভ সংবরণ করা হৃঃসাধ্য :

হঠাতে চোখে পড়ে বাধের ওপারে পাথর চিপায়
বর্ণ হাতে ও কে দীড়িয়ে ?
জঙ্গী রী পাঠান
মন্ত্র পাগড়ি আগায়
মেহেনি-বাঙানো দাঢ়িতে শুর্বাস্তের আলোয় রাতের আগুন লেগেছে
হুই চোখে ইগল-দৃষ্টি ।

[পৃঃ ৪২]

অথবা রাস-মৃত্যু শেবে পদেশ নিংহের বোড়কর শুক্র মৃত্যি ।

কিন্তু ডনুর হৃদে আরও আছে হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক প্লাট। আধুনিক যুগ যদিচ যন্ত্রযুগ, আমাদের কবিতা এইই শ্রম্ভকাতর যে বন্দুর্গের মনোবৃত্তি তার প্রকৃতিতে সক্রিয় হলেও যতের কল্পায়ন প্রায় বর্জিত বলা চলে । শক্তিমান কবির হাতে নিসর্গ ও যন্ত্র উভয়ই শিল্পরূপ লাভ করতে সক্ষম । অশোকবিজয়ের মোমাটিক মানস যন্ত্রকেও রোমান্টিক করে তুলেছে :

ফ্লুইস-গ্রেট --
বড়ো বড়ো চাকার দাঁতে আটকানো লোহার শিকল
তাতে খুলচে অনেকগুলো ভারি কাঠের কপাট
নিচের ফাঁক দিয়ে হৃদের জল ছাট পালাচ্ছে
জনের চিরনির মতো
অথবা
উদ্বাহ ফ্লাই-ইল ঘুরছে —তা-ধিন् তা-ধিন্
কোটি চলন্ত চাকা
অসংখ্য বেট পাথা বাপটাচ্ছে বাটপট
ঘূরে ঘূরে মাতালের মতো টলে টলে নাচছে ব্রোলিং মেশিন
ড্রায়ারের আগুন-উত্তপ্ত কত ডিপ্পি উঠেছে কে জানে ।
অবাক কাণ !
ঐ তো মিহফিং মেশিনের সিঁড়ি রেয়ে
লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে চায়ের র্যাণ —

[পৃঃ ১৫]

মে কবির মন এমন জনপ্রিয়, জ্ঞাপাঞ্জন যাঁর চোখের পাতায় পাতায়, তাঁর স্থপলোকও বিচলিত হয়েছে । অবশ্য অশোকবিজয় দেশ ও দশের সমগ্রাকীর্ণ জগত থেকে কোনদিনই পলায়ন করতে চাননি । তাই তিনিও ঘপে দেখেন :

হুরবিন টিলার ওপর দিয়ে ক্যারাভান ধাচ্ছে
অনেকগুলো টাঙ্ক আর সাঁজোয়া
আকাশে চলেছে জঙ্গী বিমানের উহুল
পাহাড়ের এখানে ওখানে ধোঁয়া উড়ছে

বোমা আৰ শেল ফাটছে
 ঝুঁঝুৰ ক'রে ধূলি হয়ে ঘৰছে পাথৰ
 একটা পাথৰ-চিৰিৰ আড়াল থেকে ব্ৰেগ-গান ছুঁড়ছে 'ও কে ?
 নংথু সৰ্দার !

যুদ্ধ ও গণ প্ৰতিৱোধেৰ কী মহান ছিবি ! কিন্তু তাৰপৰেও কবি আশা কৰেছেন উজ্জল সৰ্পণ্যসু দিনেৰ .

ডলু নদীৰ তীৰে মাঠেৰ মাৰখানে একটা মস্ত ট্ৰাকটৰ
 কে চালাচ্ছে ?
 হুদেৰ বুক থেকে উড়ে আসে এক লাল পাৰি
 পাথা মেলে ট্ৰাকটৱে বসে—
 ইৱিনি ।

‘লাল পাৰি’ শব্দট গভীৰ সংকেতবহু । এই স্বপ্ন দেখাৰ পেছনে আছে কবিৰ দৃহ, বৌথ ও মুক্ত সমাজেৰ
 বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ।

* * *

‘কোনাৰ্ক’ জীৱনকৃষ্ণেৰ প্ৰথম কবিতাৰ বই । ১৩৪১ থেকে ১৩৫৭ সাল পৰ্যন্ত তিনি যেসব কবিতা
 লিখেছেন সেগুলি থেকে বাছাই কৰে মোট ২১টি কবিতা এই কাব্যে প্ৰকাশ কৰেছেন । ‘কোনাৰ্ক’ নামে
 গ্ৰহেৰ যে অংশ বিশেষকৈপে চিহ্নিত তাৰ অনুগৰ্ত কবিতাগুলিৰ সঙ্গে অন্যান্য কবিতাগুলিৰ শুধু যে কালাত
 ব্যবধানই আছে তা নয়, কবি মনেৰ পৰিগতিৰ দিক থেকেও সেই ব্যবধান লক্ষ্য কৰিবাৰ মতো । ‘শেষদান’,
 ‘অপৰ্ণা’, ‘বুকদেৱ’ প্ৰভৃতি কবিতা—‘প্ৰেম’, ‘আনন্দ’ প্ৰভৃতি সনেট আমাৰ কাছে গতাহুগতিক বলেই মনে হয়েছে ।
 এ কবিতাগুলিতে তিনি প্ৰধানতঃ বৰীভূনাথেৰ অনুকৰণ কৰেছেন । কোথাও বা মোহিতলালেৰ স্পষ্ট ছায়াপাত ।
 যে কয়টি কবিতা আমাৰ মনোহৃণ কৰেছে যথা, জয়ান্তৰ, ধৰ্মপদ, কোনাৰ্ক সৰ্পমনিৰ ও ময়ূৰাঙ্গী—ৱচনাগুলিতে
 কবি নিজেৰ গোত্ৰৰ খুঁজে পেয়েছেন এবং স্বীকৃতাত উজ্জল অভিজ্ঞান উভেষিত কবিতাগুলিতে স্বাক্ষৰিত ।

‘কোনাৰ্ক’ এক ‘কুখ্যিত পাবান’ । এৱ ভগ্ন-মন্দিৱেৰ স্তম্ভে, খিলালে, প্ৰাচীৱে, চূড়ায় কতো বিস্মৃত কাহিনীৰ
 মহাকাব্য স্বক হয়ে রয়েছে । শ্ৰৱনেবতাৰ যে রসোচ্ছল নৈবেন্ত্ৰ একদিন মহাশিলী সাজিয়েছিল, পিতৃসম্মান
 বৰ্কাৰ জন্ম যে শিল্পিত্ব আপন প্ৰাণ বিসৰ্জন কৰেছিল তাৰা সবাই কবি-যাত্ৰিনয়নে কায়ামূৰ্তি ধৰে যেন আবিৰ্ভূত
 হয়েছে । সেই ভয়-মধুৰ রোমাঞ্চকৰ অনুভূতিটি, অনন্যাদাৰণ দক্ষতাৰ সঙ্গে জীৱনকৃষ্ণ রূপায়িত কৰেছেন :

কে যেন এসে দাঁড়ায় মন্দিৱ লঘু কুপতটে
 অশ্রুগালিত চোখে নিচেৰ দিকে চেয়ে—চেয়ে থাকে
 কে জ্যোতিৰ্ময় কিশোৱ দেবতা যেন তলিয়ে ঘাচ্ছে,
 আৱাও—আৱাও নিচে ধায় তলিয়ে
 গুহারাঙ্গনীৰ দীৱন্ধন অৰ্জ অতলাস্ত গভীৱে ।
 প্ৰেতায়িত সেই ছায়া অসহায় আৰ্ত চীৎকাৱ কৰে ওঠে
 “মুক্তি দাও, মুক্তি দাও !”

[কোনাৰ্ক সৰ্পমনিৰ]

আমি কাব্যে মিশ্ৰণত্ৰেৰ পক্ষপাতী । বৰীভূনাথেৰ হাতে এৱ স্থষ্টি ও পুষ্টি ঘটেছে । কড়ি-কোমলে, সংস্কৃত-
 লোকিকে যে সংগীত জন্ম নেয় তাৰ ত্ৰৈৰ্থ আমি জীৱনকৃষ্ণেৰ কাব্যে লক্ষ্য কৰে খুশি হয়েছি । এই মিশ্ৰণে
 জোৱা-জৱদাস্তি নেই, কৃত্ৰিমতা নেই, বহুজ আৰ্তার মতই এৱা অনুলম্ব :

এক ঝলক আলো, একটা কলকষ্ট উল্লাস,
বাতায়ন পথে চোখে পড়ল একখানি আনত মুদ্দর মুর্তি,
কানে হীরার ছলটি ঝকমক করছে
বেন ময়রাঙ্গীর প্রতিহত-রঞ্জি অতল ষষ্ঠতা,
উত্তলা ময়রাঙ্গী ।

মুহূর্তে সবার মাঝে এদে দাঁড়ালেম ।

[ময়রাঙ্গী]

এই প্রদক্ষে মনে হোলো অশোকবিজয়ের শৰ্দচয়ন ও উপমাবয়ন তাঁর রোমান্টিক মানসের প্র্যারবহ । বেশির ভাগই তুলি ও রঞ্জের কাজ । কোথাও বা রেখা ছাড়িয়ে ইসারা । জীবনকুকের লেখায় ক্লাসিকাল রীতিই সার্থকতর । ড্যুর হস, সৰ্ব-ভাঙ্গা বুম্বুম বার জলে, তাঁর জগতিত্ব রোমান্টিক । কিন্তু শত শত শতান্দিপারের কল্লালিত দম্পত্তীরে 'শিলাস্তৰ ওঙ্কারবনি'কে ধনিত করতে ক্লাসিকাল রীতিই সার্থকতর বাহন । একদিন ধ্যানমগ্ন শিল্পী কৃক্ষ প্রস্তরে গাত্রে জাগিয়েছিল রূপশী, প্রস্তরস্তগ ক্ষেত্রিত ক'রে রচনা করেছিল সৌন্দর্যের আদিশৃষ্টি নৃত্যপরা নারীর হাঙ্গ-জাঙ্গ-কঠাকছচ্টা, সুর্দের ধাবমান সপ্তাধ—আর কবি জীবনকুক্ষণও তাঁর নিপুণ কলমের-বাটালিতে সংস্কৃত শব্দের অনঙ্কৃত শুব্রম বিশ্বাসে শক্তি করেছেন গস্তী র মহান নব-কোনার্ক :—

এমন সময় এল ধর্মপদ, বিশু মহারাণার

ফেলে-আসা-সন্তান ।

নারী বুঝি পাঠালে তাঁর শেব নিধান—শেষতম অর্ধ্য ।
আজ সে তরুণ, নবারণহৃতি ধর্মপদ,
শুনীর্ঘ হৃষ্টাৰ দেহ, অগ্নিরদে-চালা, শ্বামবহি শিখ,
অস্তিভার নিঃংশায়িত ঘাঙ্গৰ দৃষ্টিতে ।

তাপসী মার কাছে তাঁর শিল্প দীক্ষা,
সে দীক্ষা অগ্নিদীক্ষা ।

দিনের পর দিন সে তাঁর মাকে—তপঃকৃশা পার্বতীকে দেখেছে
কখনও মনে হয়েছে সঞ্চারিণী দীপশিখা
ললাটে সিদ্ধুরবিন্দু, মুর্তিময়ী কল্যাণ
কখনও মনে হয়েছে তীক্ষ্ণদীপ্তি বিদ্যুলভা, মুর্তিময়ী তপস্তা ।
আশেশব সে স্তুত্যাপন করেনি, পান করেচে অগ্নিরস,
তাই মৃতি তাঁর অনলার্কহৃতি—অতুলনকাস্তি ।

[ধর্মপদ]

মন্ত্রের মত এৰ সংঘীত, ক্ষোদিত এৰ শব্দচিত্র ।

জীবনকুকের রচনায় মাঝে মাঝে সংস্কৃত কাব্যগংক্তি বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার চৰণ ঘোজনা তাঁর পশ্চিত-
ঘনিক মনের পরিচয় দান কৰে । কিন্তু সৰ্বত্রই যে তাঁর শিল্পকোশল সার্থক হয়েছে একখা আৰি বলবনা, যেমন :—

দেখতে পেলুম এই পাথৰাণীকে খিরে বয়ে চলেছে

নিত্যকালব্যাপ্তি আনন্দরপমমৃতম-এৰ অবিৱল প্ৰবাহ

মকরকেতু উড়ছে মধুপবনে

জলছে উন্মত্ত কামনাৰ লোলুপ লেলিহশিখা

ৱত্তি-বিলাসেৰ উন্নত, উন্নত বিজয় নিশান ।

[কোনার্ক শৰ্মন্দিৰ]

আমার কাছে রেখাক্ষিত পদচির বিশ্বাস তালো লাগেনি। ঋবীন্দ্রনাথের এই পদচিতে স্নাসিক্যাল ব্যঙ্গন মোটেই ফুটে উঠেনি।

জীবনকৃষ্ণও আশাবাদী কবি। বর্তমানের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি অতীতকে অমুক্ত করেছেন আর ভবিষ্যতের স্মৃতি দেখেছেন। দে-স্মৃতি সূর্য-বন্দনার স্মৃতি :

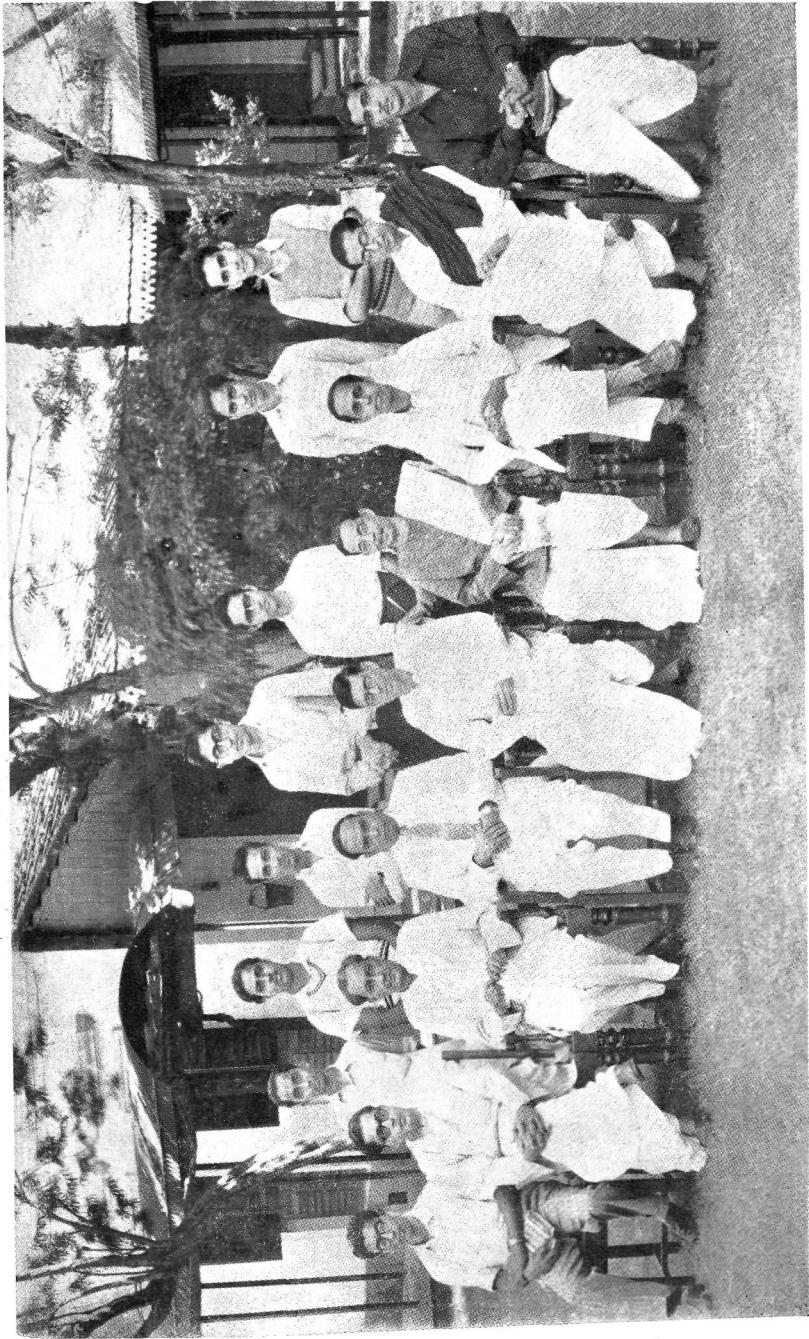
দুরপথ অতিক্রম করে আসছে তার।

উদয়চলের পথে জ্যোতিস্থান পথিক,
ললাটে তাদের অর্ক-আশীর্বাদ,
ঝলকিত ছুতি যার প্রতিহত হয়ে
অজানিত অঙ্ককার পথ অবারিত করেছে তাদের সামনে।
চুঁথেরত পাহ—আজীবন তপস্তা তাদের পথ।
তারা সমাপ্ত করবে তাদের ব্রত—
আর প্রতিষ্ঠিত করবে তোমার মহিমা।

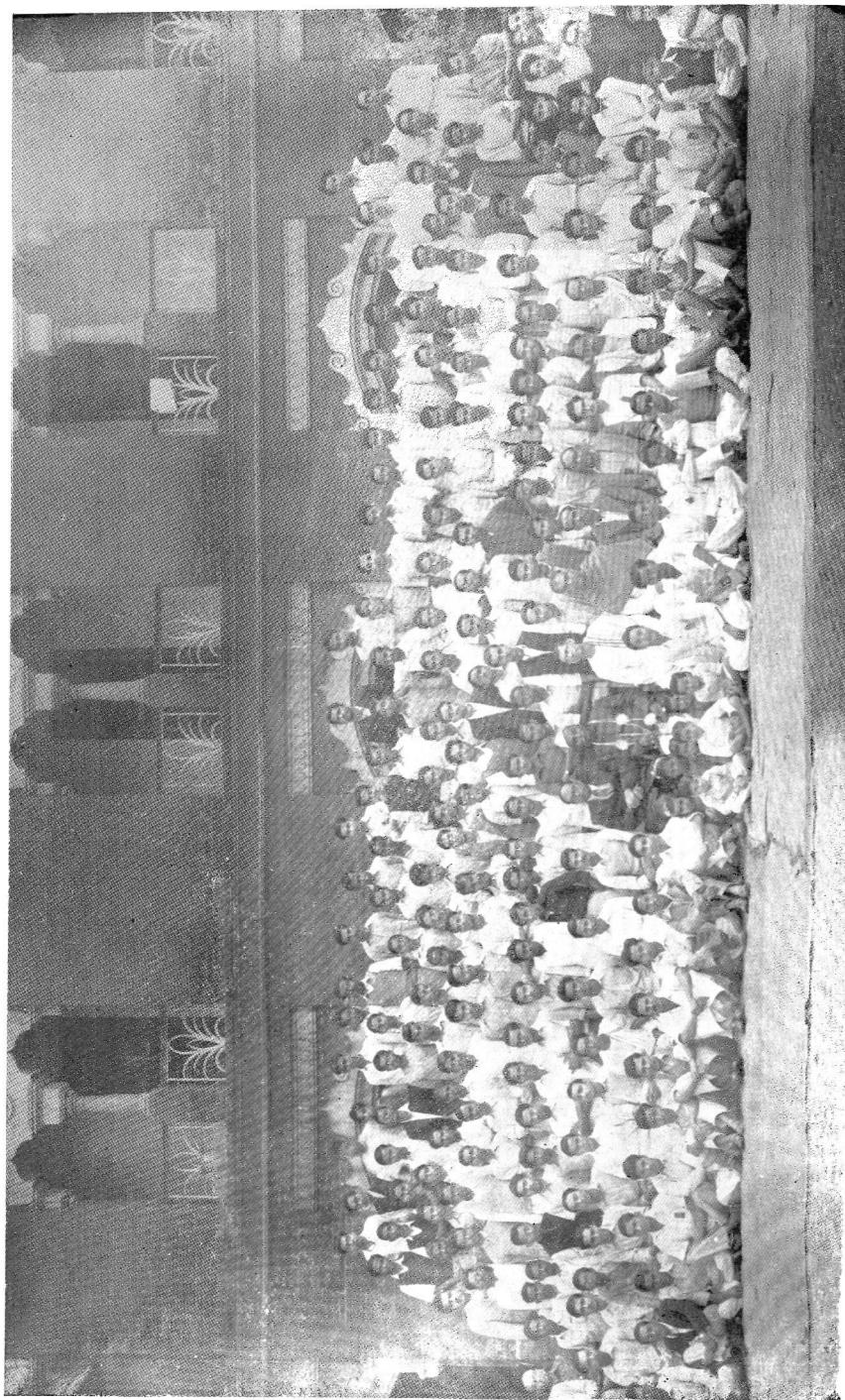
[শৃঙ্খলী]

কাব্য ছখানি আমাকে আনন্দ দান করেছে এই আমার মুখ্য কথা। আগন্তরা গতে দেখুন।

PRESIDENCY COLLEGE STUDENTS' UNION COUNCIL
EXECUTIVE COMMITTEE, SESSION 1951-52



Front Row (Left to right)—Bata Krishna De (Vice-President), Prof. A. Mazumdar Prof.in-Charge, Debate), Prof. S. C. Sarkar, Dr. J. C. Sen Gupta (Principal), Prof. J. Chakravarty (Prof.-in-Charge, Social Service), Dr. M. Ghosh (Prof.-in-Charge, Drama), Prof. S. Roy (Bursar), Prof. D. Bhattacharya (Prof.-in-Charge, Rabindra Parishad), Suniti Bhose (Gen. Secy.).
Back Row (Left to right)—Kalyan Das Gupta (Publication Secy.), Sanjib Biswas (Jr. Treasurer), Ranjit Chatterji (Asst. Gen. Secy.), Barun De (Debate Secy.), Arup Roy (Rabindra Parishad Secy.), Kajal Dutta Gupta (Jr. Common Room Secy.), Sambit Chatterjee (Social Service and Acting Drama Secy.).



Rastrapati Dr. Rajendra Prasad with the Principal, the Superintendent and boarders, past and present, of the Eden Hindu Hostel during his visit there on the 24th December, 1952.

আমাদের কথা

রাষ্ট্রপতির শুভাগবত :

গত ২৪শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ডেন্টের রাজেন্ট্রপ্রসাদ আমাদের কলেজে পদার্পণ করেন। যাবীনতালাদের পর এই প্রথম দেশের অধিনায়ককে কলেজের পুরাতন ছাত্ররূপে অভ্যর্থনা করার মুহূর্গ হল আমাদের। রাষ্ট্রপতির প্রায় অধৰ্ম শাতান্ত্রী পরে তাঁর ছাত্রজীবনের সাধনক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের শুভ অবকাশ প্রাপ্ত হচ্ছেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ইডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিকও ছিলেন। তাই এই দিন সর্বপ্রথম তিনি তাঁর পুরাতন ছাত্রবাস পরিদর্শন করেন। তাঁর আসার নির্বিষ্ট সময় ছিল সকাল সাড়ে নঁটা, কিন্তু তাঁর কিছু আগেই তিনি এসে পৌঁছান। ছাত্রাবাসের প্রবেশদারে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন আমাদের প্রদেশের অধ্যক্ষ ডেন্টের বন্তীশচন্দ্র মেনগুপ্ত, ছাত্রাবাসের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী এবং ছাত্রাবাস-সম্পাদক শ্রীমুণ্ণালক্ষ্মি মল্লিক। একজন আবাসিক রাষ্ট্রপতিকে মাল্যভূষিত করেন। তারপরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় একতলায় যে ঘরে তিনি একসময় কিছুদিনের জন্য বাস করেছিলেন। বর্তমানে এই ঘরটি Visitors' Room-এ পরিণত হয়েছে। দোতলায় বা ৫ঁ ওয়ার্ডে তিনি যে সব কক্ষে দীর্ঘবাস বাস করেছিলেন, শারীরিক কারণে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। পুরাতনস্মৃতিবিজড়িত ঘটনাটে রাষ্ট্রপতি তাঁর সমসাময়িক আবাসিকদের মধ্যে যাঁরা এই উপরক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেকার দিনের মত বিশ্রামালাপ করলেন। অতীতের আবাসিকদের সঙ্গে মিলনের পর ছাত্রাবাসের বৃহৎ প্রাঙ্গণের এক কোণে বর্তমান আবাসিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির একক্ষে ছবি তোলা হয়। তারপর প্রাপ্ত প্রদক্ষিণ করবার সময় রাষ্ট্রপতি ছাত্রাবাসের আধুনিক পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করেন। পরিশেষে ছাত্রাবাসের প্রবেশদারে খোদিত স্মৃতিফলকটি দেখে রাষ্ট্রপতি কলেজের দিকে অগ্রসর হন।

ইতিমধ্যে যথাবিধি অভ্যর্থনার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজে চলে এসে আল্পনাশোভিত সোগানের পাদদেশে সদনবলে অপেক্ষা করতে থাকেন। অনতিবিলম্বে রাষ্ট্রপতি প্রধান প্রবেশদারে অবতরণ করলেন। শুভার্থন দ্বারা অভ্যর্থনার শুভসূচনাস্তে অধ্যক্ষ মহাশয় কলেজের বর্তমান পরিচালকসমিতির সদস্যবর্গ, বিভিন্ন বিভাগের মুখ্যাধ্যাপক এবং ছাত্রপরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কর্মসচিবদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির পরিচয় করিয়ে দেন। বর্তমান কলেজের সঙ্গে পরিচয়ের পর অতীতের সমসাময়িকদের সঙ্গে মিলিত হ্যার জন্য রাষ্ট্রপতি আর্টস মাইনের পাঠ্যকক্ষে প্রবেশ করলেন। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন 'প্রাত্ননী'-সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'প্রাত্ননী'র কর্যক্রম স্থাপাতীর সদস্য এবং তাঁর বয়েকজন সহপাঠী। অভ্যর্থনাদির পর তাঁরা সবাই একটি বড় টেবিলের চারপাশে রাষ্ট্রপতিকে ঘিরে বসলেন। গ্রাহাগ্রামের গম্ভীর পরিবেশে স্বনামধন্য পরলোকগত অধ্যাপকদের চিত্রের মাঝিধ্যে রাষ্ট্রপতি সমসাময়িকদের সঙ্গে একক্ষে কিছুক্ষণ অতীতস্মৃতিমূহূর্তের শয়েগ পেলেন। সেদিনের উৎসবের অন্তর্যাত্মক অংশে ছিল অনুষ্ঠানের শাসন, কিন্তু লাইব্রেরিতে অন্তরঙ্গ পরিবেশে এই দুর্লভ মিলনমূহূর্ত অতীত স্মৃতির সহজ উচ্ছুসে বিশেষ হাদরণগ্রাহী হয়ে উঠেছিল। সহপাঠীদের সঙ্গে আলাপের পর রাষ্ট্রপতি পরলোকগত H. M. Percival, বিজয়েন্দ্রনাথ সেন, মনোমোহন দোষ, মোগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

১. রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ইডেন হিন্দু হস্টেলের সংযোগের স্মৃতিচিহ্নস্থলে এই মর্মরফলক স্থাপন করেছেন প্রাত্নন আবাসিক বিধায় এতিহাসিক ডেন্টের রাধাকুমুর মুখোপাধ্যায়।

প্রভৃতি তাঁর পুরাতন অধ্যাপকদের লাইব্রেরিতে রাখিত চিত্রগুলি দেখেন। অধ্যাপক Percival-এর ছবিটি তিনি বিশেষভাবে কিছুক্ষণ ধরে নিয়োক্ষণ করেন।

লাইব্রেরি থেকে রাষ্ট্রপতিকে এবার কলেজের মাঠে মুসজিদ বিরাট প্লাটারে নিয়ে যাওয়া হল। প্রবেশকালে কলেজের ছাত্রীরা শাঙ্কারেনি দ্বারা আবার তাকে অভ্যর্থনা জানান। এখানে বর্তমান এবং অতীতের সমবেত অভিবাদনের আয়োজন। কলেজের বর্তমান এবং প্রাচীন ছাত্র ও অধ্যাপকের বৃহৎ সমাবেশ উৎসবের পূর্ণাঙ্গ করে তুলেছিল। উপস্থিত শুধীরণুলীর উদ্দেশ্যে স্থিত, বিনয় অভিবাদনাতে রাষ্ট্রপতির আসন প্রহঞ্চে পর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হল কলেজের ছাত্রাত্মদের সমবেত বৈদিক স্নোগ্রানে। তারপর দুজন ছাত্রী তাকে মাল্যাভূষিত করলেন। এইবার সন্দায়গুণের সূচনা হল অধ্যক্ষের অভ্যর্থনাবাচী পাঠে। পাঠাস্তে অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি “প্রাতনী”র অস্ততম আজীবন সদস্য হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। পরবর্তী বক্তা শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত “প্রাতনী”র সভাপত্রিকাপে রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানান। ছাত্রাবাসিকদের তরফে মানপত্র পাঠ করেন ছাত্রাবাস-সম্পাদক ক্লিয়ুনালকান্তি মরিক। এই মানপত্র একটি বিশেষ আধাৰে উগ্রহার দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতিকে। কলেজের ছাত্রগোষ্ঠীর পক্ষে অভ্যর্থনা জানান ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপদ্মীপ দাস। পাঠিত মানপত্রটি একটি মনোজ আধাৰে স্থাপন করে রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেওয়া হয়। তারপর অধ্যক্ষ উপহার দেন ছাত্রাবাসায় অধ্যাপক পার্সিভালের সঙ্গে একত্রে গৃহীত রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর কয়েকজন সহপাঠীর সমবেত আলোকচিত্রে একটি মুক্যবান অনুকৃতি এবং কলেজ রেজিস্ট্রারের একটি বিশেষভাবে বীধানে খণ্ড। বর্তমান কলেজের সম্পর্ক জ্ঞাপনের পর কলেজ জীবনে রাষ্ট্রপতির কলেজেজন বিশিষ্ট সমসাময়িক অভিভাবণ দেন। অধ্যমে অভিনন্দন জানান রাষ্ট্রপতির অস্ততম পুরাতন শিক্ষক, ইতিবাসের ভূতপূর্ব মুখ্যায়াপক ক্রাদেবেদ্রনাথ দেন। তারপর যদেন রাষ্ট্রপতির দুজন সহপাঠী এবং সহ-আবাসিক শ্রীবিনাশ মজুমদার এবং শ্রীমায়াতুর হাজুদার। তাদের অতীত স্মৃতির সরস বিহৃত সভায় এক অন্তরঙ্গ পরিবেশের স্ফুট করে। এই অন্দস্থে সভার শেষভাগে শ্রীযুক্ত মহমুদুরের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—তিনি ছাত্র পরিষদের সাধারণসম্পাদককে জানান যে তাঁদের সময়ে ছাত্রপরিষদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন আমাদের রাষ্ট্রপতি। জাতির নির্বাচন তাঁদের অতীতের অভিমত সমর্থন করেছে। এঁদের পরে বলেন রাষ্ট্রপতির সহপাঠী এবং University Law College-এ সহকর্মী শ্রীসতীরাম বল্দেয়গাধ্যায়। তারপর রাষ্ট্রপতি পরিকার, শুক্র বাংলায় তাঁর নিঃস্ব অভিভাবণ দেন।

বহুদিন পরে তাঁর কয়েকজন সতীর্থ এবং অস্তুতঃপক্ষে একজন শিক্ষকের সঙ্গে যিলনে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি এই কলেজ সংখ্যকে তাঁর অনুরাগ এবং সন্তুতজ্ঞ স্মৃতির উল্লেখ করেন। এখানে সকলের কাছেই তিনি কিছু না কিছু পেয়েছেন এবং সেই যা পেয়েছেন তাঁই তাঁর জীবনের সম্ভব—এই বিশাল বীর্তন্তির অক্ষমি আবেগ আমাদের মনকে গর্বে ও আনন্দে ভরিয়ে তোলে। তাঁর সহাধারীরা সভাস্থ অভাগস্তবর্গের মনোরোগনের

১ এই আলোকচিত্তটির আর একটি অনুরূপ অনুকূলি আর্ট্স লাইব্রেরির পাঠ্যগ্রামে রাখিত হয়েছে। এই চিত্রে আছেন অধ্যাপক পার্সিভাল এবং ১৯০৬-৭ সালের ইতিহাস এবং ইংরাজী সাহিত্যের এম. এ ক্লাসের ছাত্রগুলি।

ମୁଲ ଆଲୋକଟିଆଟି ୧୯୪୮ ମାଲେ କଲେଜପତ୍ରିକାଯାଇ ପ୍ରକାଶେ ରଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ସହପାଠୀ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜେର ଭୂତପୂର୍ବ ଇତିହାସେର ଅଧ୍ୟାପକ ପରଲୋକଗତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିନ୍ଦୁକୁମାର ଦେବ ପ୍ରେସନ କରେନ । ୧୯୯୯ ମାଲେ ଆଲୋକଟିଆଟି କଲେଜପତ୍ରିକାଯାଇ ପୁନଃପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ଆଲୋକଟିଆଟିର ଅନୁକୃତିଦ୍ସହ ଏକଟି ସଂବର୍ଧନ-ପ୍ରତିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଶୁଭାଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଦ୍ରିତ ଓ ବିତ୍ତିବିତ୍ତ ହେଲିଛି ।

জ্যু যে সব কাহিনী বিস্তৃত করেছিলেন তার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি নিজে তার কলেজজীবনের প্রথম দিনের একটি কোর্তুকপূর্ণ অধ্যায় বর্ণনা করেন। জীবদ্ধশাতেই র্যাবচের স্বাধীনতা স্পেসের সার্থক উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি ভবিষ্যৎ সেৰ্ভিভাগাচিত্রের সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, যে প্রেম এবং উৎসাহ বর্তমান ছাত্রসমাজ প্রদর্শন করেছেন সে মনে রাখবার কথা, বলবার নয়। ছাত্রপরিষদের সাধারণ সম্পাদকের ধ্যানের জাপনান্তে 'জনগণয়ন' গানে এই দিনের স্মরণীয় অনুষ্ঠান সমাপ্ত হল।

নিম্নে ইন্দু হস্টেলের আবাসিকদের এবং কলেজের ছাত্রদের পক্ষে প্রস্তুত মানপত্র দ্রুটি মুদ্রিত হল। অধ্যক্ষের সম্মর্ঘন-বাণী ইংরাজী অংশে সন্নিবেশিত হল। এই সংখ্যার পুরোভাগে রাষ্ট্রপতির আগমন-সম্পর্কিত কতকগুলি ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ছাত্রবাসে গৃহীত আলোকচিত্রটি "আমাদের কথা" পুরোভাগে প্রকাশিত হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলেজের কলেকজন ছাত্র কর্তৃক গৃহীত রাষ্ট্রপতির শুভাগমনের চলচিত্র গত জাহাজীয় মাসে Physics theatre-এ প্রদর্শিত হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপতি

ইন্দু হস্টেলের প্রান্তৰ আবাসিক

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের

পুরাতন আবাসে শুভাগমন উপলক্ষে

—বিজয়কী-সংবর্ধনা—

হে সত্যসৰ্ক,

শতাব্দীর প্রাচী ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যবিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষাক্ষোর্ণ সর্বোত্তম স্নাতকরাপে বহু-বিহার উৎকল-আসামের বিদ্যাধি-বৃন্দের অভিনন্দন লাভ করিয়া যেদিন তুমি বাংলার নবীন বিদ্যাসাধনার আদিক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিলে আমাদের এই ছাত্রবাস সেদিন তোমাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া বরণ করিয়া শাশ্বত অনুভব করিয়াছিল। সেদিনকার সেই প্রতিভাদীপ্ত কিশোরকে অধীশ্তাব্দীর ব্যবধানে আজ স্মৃৎ-জনানুকূল ভারতভাগ্যবিধাতা রাপে লাভ করিয়া স্বাগত জানাইব আমরা কোনু ভাষায়? মৈথিল কবির অনুকরণ করিয়া আমরা ধরিব, "আজু ময় গেহ শেহ করি মাননু"।

আমরা মানস প্রত্যক্ষ করিতেছি একটি দিন যেই শুভদিনে তোমাকে অঙ্গে ধারণ করিয়া আমাদের শামলা মুদ্দিতা জননীর মুখ্যানি প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আর একটি দিন মনে পড়ে যেদিন বাংলার কথাশিল্পীর হানিম-বিহারী জননী সন্তানকর্ত্ত তাহার প্রথম বন্দনা প্রবণ করিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্যার্ধিদেশে তোমার আগমনের অত্যন্ত কাল মধ্যে বাংলার বিদ্যা-বিদ্যী হৃদয়কন্দর হইতে স্মৃতিত জাগরীগাংথা ত্রিংশ-কোটি-কর্ণ-কলকল-নিমাদ-করালে উক্তীত হইয়া আদম্যদ্র-হিমাচল ভারতবর্দের ঝুঁপ্তিভঙ্গ করিয়াছিল। সারসত-সাধনায় যথ কিশোর তুমি বাংলার উৎকর্ণ হইয়া সেই মর্মবিদ্যারী রব প্রবণ করিয়াছিলে। বাণী বিদ্যাদায়নীর সাধনায় অনুগ্রহ সিরিলাভ করিয়া ব্যবহারাজীব-অধ্যাপকরাপে তোমার কর্মজীবনের শুভসূচনা করিয়াছিলে বঙ্গদেশে। অমলা অতুলা বঙ্গবাণীর বরপুত্র জন-গণ-মন-অধিনায়ক ভারত-ভাগ্যবিধাতার জয়গান করিয়া ধরণীকে ভরিয়া তুলিলেন। জ্ঞানদর্শী কবির মন্ত্র আজ সজীব হইয়া উঠিয়াছে তোমার প্রতিভা-ভাস্তুর সাধন-সমূক্ত জীবনকে আশ্রয় করিয়া।

বাংলার এক জীবন্ত সন্ন্যাসীর আনন্দ-বিবেক একদিন দেশপ্রেমে জলিয়া উঠিয়াছিল। নিখিলভারতে

একটি বিরাট হিয়া জাগাইয়া তিনি ভারতবাসীকে কটিমাত্রব্রাহ্মত হইয়া সদর্পে বলিতে আবাহন করিয়াছিলেন, মুখ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবর্দের অজ্ঞ মুচিমেথের আমার ভাই, আমার ভন। সন্ন্যাসীর দিব্য দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিয়াছিল ভাবী কালের একটি মানুষের মূর্তি, সর্বাঙ্গে যাঁহার অব্রহাম বহুবীণ ভারতবাসীর দরিদ্রের থাকুন্তি। ভাবিতে নোমাঞ্চ হয়, অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে ভারতবর্ষ সত্যাই প্রতিক্রিয়া করিয়াছিল মানবতার কটিমাত্র-ব্রাহ্মত একটি সজীব বিগ্রহ। আমরা বহুপূর্বে একবার শুনিয়াছিলাম,—

তিনির দিগ্ভূরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরি পাতিয়া।

বিদ্যাপতি কহে কৈনে গমায়বি হারি বিনে দিমোতিয়া।

নিখিল-ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার অগ্রদুত নবজাগরিত ভারতের আর্তি কঠে ধরিয়া নৃতন করিয়া যেন গাহিয়া উঠিলেন, “‘হরিজন’ বিনে কৈনে গমায়বি দিন রাতিয়া।” সেদিন তাহার পার্শ্বে যে সর্বত্যাগী সত্যাগ্রহীর দ্বিতীয় মুক্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল মেটি তোমারই বিশ্ববিদ্যিত কুলিশকঠোর কুশুমছকেমল মনুষ্যমূর্তি।

তোমার নামের সঙ্গে আমাদের স্মরণ ও মনমগ্নে উদ্বিদ হয় একটি চিরক্ষত নাম, “রাজেন্দ্র সত্যসুক্ষ দশরথতনয়ঃ-বন্দে লোকান্তিয়ামঃ,” যাহার তাৎপর্য-সংকেত করিতে গিয়া বিশ্বকবি তাহার অমৃগম ভঙ্গীতে মহুয়ামহিমার প্রকটন করিয়া বলিয়াছেন,—

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করেনি অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি' শুকর্তিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে শুল্ক কাস্তি মাধিক্যের অঙ্গদের মত,
মহৈথর্ঘে আছে নন্ত মহাদৈগন্তে কে হয়নি নত।
সম্পন্নে কে থাকে ভয়ে, বিগ্নে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে, বাজভালে মুকুটের সম,
সবিনয়ে সর্পেরবে ধরামারে ছুঁথ মহত্ত্ব।

স্বাধীন ভারতের হে প্রথম রাষ্ট্রপতি, ভারতীয় মহুয়াত্ম-সাধনার এই ধারা তোমাতে অঙ্গুষ্ঠ রহিয়াছে। তোমার সারস্বত সাধনার পরিত্যক্ত গীর্জের উন্নতাধিকার আমাদিগের উপর বর্তিয়াছে। কিন্তু আমাদের তপস্থা আজ বহু-বিপ্লিত। যে বাংলাকে একদিন তুমি সাধন-গীর্জা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলে সেই বাংলাকে ভালবাসিয়া দুর্দিনে আবার তুমি আসিয়াছ। আমাদেরই ঘরের মানুষ আমাদেরই স্তজন বাঞ্ছ, অগণিত নয়নাবী তৃণের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দেহে মনে অক্ষিক্ষাবে বাচিবার এবং বাড়িবার অধিকার তাহাদের জন্য আমরা চাহিতেছি। মানুষকে এই অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তোমাদেরই প্রয়োজন হৃঢ়ের তপস্থা। যেন আমরা হাসিমুখে বরণ করিয়া নাইতে পারি, তোমার মহুয়াত্ম-সাধনার আদিগীঠে বসিয়া আজ তুমি আমাদের সেই আশীর্বাদ করিয়া যাও।

বন্দে মাতরম्।

ইডেন হিন্দু হস্টেল,
৩, প্যারীচরণ সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
চৰিষেশ ডিসেম্বৰ, ১৯৫২।

শ্রী-সন্মত
ইডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিকবৃন্দ

ডেস্ট্র রাজেশ্বর প্রসাদ এম এ., ডি. এল.,
মাননীয়েশ্বু।

হে বরেণ্য অতিথি,

তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ কর।

এই বিষ্টাভূমিতে যে সকল কৃতী ছাত্র ভারতীয় আশীর্বাদ্য লাভ করেছেন তুমি তাদের অগ্রণী। আজ তোমার শীর্ষ পোর্টে উজ্জল, জনগণের অঙ্গীয় তোমার পাদপীঠ ভারাহাস্ত। এই মাতৃস্মা বিষ্টাভূমি তোমার পোর্টের অংশভাগিনী। হে মহাভাগ, তোমাকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

তুমি যে শুধু মেধাবী ছাত্র হিসাবেই ঘশেলাভ করেছিলে তাই নয়। আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে দুর্দশী আদোলনে বঙ্গভূমি অনুরণিত হয়েছিল তুমি ছাত্রাবস্থায় তাতে যোগান করেছিলে। সেদিন যে স্বদেশীর মধ্যে তুমি দীক্ষা লাভ করেছিলে, তা আজীবন তোমাকে উরোধিত করেছে। মহাশ্বা পাঞ্চাশ নেতৃত্বে যে ভারতবাসী স্থানীয় অভিযান আরক্ষ হয় তুমি সর্বশ ত্যাগ ক'রে সেই মহাসংঘাতের ব্রত গ্রহণ করেছিলে; হে স্বাধীনতার ঋষিক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

আজ দেই মহাবৃত্ত উদ্যাপিত হয়েছে; ভারতভূমি আজ শৃঙ্খলমুক্ত। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা শতাধিক বর্ষ ধরে এই বিদ্যারন্তে প্রবাহিত হয়েছে। সুগ্রামাব রামমোহন এর প্রতিষ্ঠাতা; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও বেতাজী মুক্তাচন্দ্র এখনে শিক্ষাভাব করেছেন। আজ তাদের সবাকার সাধনার পরিসমাপ্তি হয়েছে; এই বিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ভারতের একজন রাষ্ট্রিপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তোমার মধ্যে সেইসব পূর্বগামী মহাপুরুষদের সাধনার সফলতা মূর্তি পেয়েছে; হে স্বাধীনতার প্ররোচিত, তুমি তাদের হয়েও আমাদের শুক্রার অর্ধ্য গ্রহণ কর।

আমরা ছাত্র ভবিষ্যতের নাগারিক। তোমার নেতৃত্বে আমাদের জীবনষাত্রা সুখেসম্পদে উজ্জল হবে আমরা এই আশা পোখণ করি। সর্বোপরি আমরা এই কথা স্মরণ ক'রে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি যে তুমি আমাদেরই একজন; তোমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শুধু ভারতবাসী হিসাবে নয়, এই পুণ্য বিদ্যারন্তনের সর্তৰ্থ হিসাবে। হে হৃদয়, তুমি আমাদের শ্রীতিপূর্ণ মনস্কার গ্রহণ কর।

প্রেসিডেন্সী কলেজ
কলিকাতা, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫২।

ইতি—

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রছাত্রীবন্দ

প্রতিষ্ঠাত্র-দিবস :

প্রতি বৎসরের মত এবারও ২০শে জানুয়ারী কলেজের প্রতিষ্ঠাত্র-দিবস উদ্যাপিত হয়। এই বৎসর ঐ দিনেই সর্বসভীপূজ্জা অনুষ্ঠিত হওয়াতে আশঙ্কা হয়েছিল এবার সভায় জনসমাগম কিছু বিরল হবে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরেই Physics Theatre প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সমাবেশে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—এমন কি সভায় মধ্যেই কথেকজন স্থানভাব দেখে অভিযোগের ঝরে মন্তব্য করেন—‘কলেজের নৃতন সভাগৃহ প্রয়োজন।’

এই দিনে সভাপতি ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে আমাদের রাজ্যপাল ডেস্ট্র হরেকুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন তারই সমসাময়িক ক্লিনিকেন্টকুমার বন্ধু। অচান্ত বিশিষ্ট অভ্যাগতের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপালালাল বন্ধু, রাজ্যপালের সহপাঠী শ্রীসতীনাথ রায়, কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীভূগন্ধিমোহন সেন, শ্রীঅপূর্বকুমারচন্দ্র এবং শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। সভা আরম্ভ হয় অধ্যক্ষের ভাবণে। তিনি সে দিনের বিষিষ্ট অতিথি ডেস্ট্র হরেকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপালালাল বন্ধু এবং শ্রীনরেন্দ্রকুমার বন্ধুকে কলেজের এই মহৎ

অহুষ্টানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। হিন্দুকলেজের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্টানের এই পুণ্য সূর্তিদিবসে কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের প্রতি শুভানিবেদন করে তিনি অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদারকে কলেজ প্রাসঙ্গিকী পাঠ করতে অনুরোধ করেন। প্রাসঙ্গিকীটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিকী পাঠের পর বিগত বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রাত্মীদের পুরস্কার এবং পদক বিতরণ করা হয়। ‘প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস’ সভায় পুরস্কারবিতরণের প্রথা আয়-ব্যয় প্রভৃতির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের উদ্যোগে এই অথবা প্রবর্তিত হল।

এর পর শ্রীবেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের অভিভাবণ বিশেষ উপভোগ্য হয়। পরবর্তী বঙ্গ শ্রীগাম্ভালাম বসু মহাশয়ের ছাত্রাত্মীবনের স্থৃত-সমৃদ্ধ আলোচনায় আমরা অধ্যাপক পার্সিভালের সম্বন্ধে কয়েকটি মনোন্ত কাহীনি শোনবার সুযোগ পাই। সর্বশেষে রাজ্যগালের ভাষণে সভার অন্তর্গত ভাবটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। তাঁর বক্তৃতার শেষভাগ পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক দ্রুর্দশার রিজ্ট স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। এই কলেজই একদিন দেশব্রহ্ম চিক্করঞ্জন দাশ এবং নেতৃত্বী স্বত্ত্বাচল্ল বসুর মত জননায়ককে জাতীয় সংগ্রামে দান করে—একথা স্মরণ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন আজ পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বের অভাব এই কলেজের ছাত্রগণ পূর্ণ করবেন।

সভার শেষে ছাত্রপরিষদের সাধারণসম্পাদক রাজ্যগাল, অস্থান বিশিষ্ট অতিথি এবং সমাগত প্রাক্তন ছাত্রদের ধন্যবাদ জানান।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সন্মানে অস্থান বৎসরের মত এবারেও বার্ষিক খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মিলিত বিতর্কসভা, বর্তমান ছাত্রদের বিরক্তে প্রাক্তন ছাত্রদের ক্রিকেটখেলা, ছাত্রপরিষদের উদ্যোগে বিচিত্রানুষ্ঠান, ‘প্রাক্তনীর’ বার্ষিক মিলনোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাক্তনছাত্রসমিতির সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী :

১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে আরক ‘প্রাক্তনী’ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় সাতশত। বহু বৎসর পরে গত বৎসর প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবসে ‘প্রাক্তনী’র সদস্যদের একটি মিলনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আসরে বর্তমান ছাত্রদের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধিত্ব নিম্নস্তীত হন। তারপর গত ১ই সেপ্টেম্বর একটি সাক্ষাৎ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীকামন এবং শ্রীজানপ্রদাম ঘোষ এবং যন্ত্রসঙ্গীত পারিবেষণ করেন শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র। ১৭ই সেপ্টেম্বর University Institute-এ নাট্যানুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রেরা ‘কমলাকান্তের জীবনবলী’ এবং ষঙ্কুমার রায় রচিত ‘চলচিত্রঞ্চক্ষী’ অভিনয় করেন। সেপ্টেম্বর মাসের এই দুটি অনুষ্ঠানেই বহু প্রাক্তন ছাত্র উপস্থিত থাকেন।

এই বৎসর ২৩শে জানুয়ারী প্রাক্তন ছাত্রসমিতি আবার একটি বার্ষিক মিলনানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

প্রাক্তন ছাত্রসংবাদ :

কাশী বিদ্যবিভাগের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর অরবিন্দ বসু Durham বিদ্যবিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শনের Visiting Professor নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৩৪-৪০ সালে তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

শ্রীপ্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের Final Attorneyship পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে Belchamber পদক্ষেপ প্রভৃতি হয়েছেন। ১৯৪৩-৪৭ সালে তিনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

এবার লক্ষ্মোতে অনুষ্ঠিত Indian Science Congress এবং গোয়ালিয়ারে অনুষ্ঠিত Indian History

Congress-এ সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে Bose Research Institute-এর পরিচালক যশোরী বৈজ্ঞানিক ডেপুটি মেনেন্সমোহন বসু এবং বিদ্যাত ইতিহাসিক ডেপুটি রাধাকুমার মুখোপাধ্যায়। তারা ছিলেনই আমাদের কলেজের বিশিষ্ট প্রাত্নত ছাত্র—(১৯০৩-৬) ও (১৯১১-১৯১৩)।

সপ্তাতি আমাদের কলেজের শারীরবৃত্তিভিত্তিগের গবেষক ছাত্র শ্রীচন্দ্রচরণ দেব ডি, ফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়েছেন। তার thesis ছিল: Vitamin C in Carbohydrate metabolism। ১৯১৮ সালে তিনি এই কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীর এম. এস. সি. উপাধি লাভ করে সরকারের একটি গবেষণা বৃত্তি অর্জন করে শারীরবৃত্তি বিভাগে গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হন।

পরীক্ষার ফলাফল :

১৯১২ সালের বি. এ ও বি. এস. সি. পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কলেজ থেকে যাঁরা প্রথমশ্রেণীর অনাস্ত পেয়েছেন নিম্নে তাদের নাম প্রকাশিত হল। এদের স্থানান্তরের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয় নি, তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানবিন্দেশের চেষ্টা করা হয়েছে।

বি. এ—ইতিহাস: অশিনরঞ্জন দাশগুপ্ত (১ম) ; হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (২য়) ; দীপেন্দ্রমোহন বন্দ্যোগ্জ (৩য়)।

অর্থনীতি: তরুণচন্দ্র দত্ত (১ম) ; কাননকুমার মজুমদার (২য়) ; নবেন্দু সেন (৩য়)।

দর্শন: প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত (১ম) ; কমলা বসু (২য়)।

গণিত: অমিতাভ গুপ্ত।

বি. এস.সি.—গণিত: হৃষ্টকাশ মুখোপাধ্যায় (১ম) ; অমৃতাভ গুপ্ত (২য়) ; অনাদিশঙ্কর গুপ্ত, আশিসকুমার মজুমদার, লক্ষ্মীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র প্রসাদ।

ভূতত্ত্ব: শ্রবণচন্দ্র রায়চৌধুরী (১ম) ; দীপক রায় এবং নিরঞ্জনদেব চট্টোপাধ্যায় (২য়) ; প্রবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য়) ; অশোককুমার মুখোপাধ্যায় (৪র্থ) ; শুভ্রপ্রিয়মোহন সেনগুপ্ত (৫ম) ; প্রমেনজিৎ সাহা (৬ষ্ঠ)।

শারীরবৃত্তি: দেবজোতি দাস (১ম) ; অসীমকুমার সরকার (২য়) ; হেলেন রায় (৩য়)।

সংখ্যাবিজ্ঞান: নিখিলেশ ভট্টাচার্য (১ম)।

গদার্থ বিজ্ঞা: পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় (৩য়)।

১৯১২ সালের বি. এ এবং বি. এস.সি. পরীক্ষার ফলাফলের উপর আমাদের কলেজের নিম্নলিখিত ছাত্রছাত্রীগণ সরকারী বৃত্তি লাভ করেছেন:

আর্টিস্ট: কাননকুমার মজুমদার, দীপেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ গুপ্ত, কমলা বসু, শাস্তা দাস।

বিজ্ঞান: দীপক কুমার রায়, অসীমকুমার সরকার, নিরঞ্জনদেব চট্টোপাধ্যায়, ভাগবত দাশগুপ্ত, দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সাধনজ্যোতিঃ বর্মণ, শ্রসীমুকুল দত্ত।

অস্থায় বৃত্তিনাত্তের বিষয় আমরা এখনও অবগত নই।

১৯১২ সালের এম. এ এবং এম. এস.সি. পরীক্ষায় আমাদের কলেজ থেকে যাঁরা প্রথমশ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন নিম্নে তাদের নাম প্রকাশিত হল। অবশ্যই এই বিবরণ অসম্পূর্ণ। স্থানবিন্দেশেও ভূম থাকা সম্ভব।

এম. এ—ইতিহাস: শিপা সরকার (১ম) ; অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (২য়)।

অর্থনীতি: শিপ্রা সেন (১ম) ; গোরী সেনগুপ্ত (২য়)।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

দর্শন : অপালা মুখোপাধ্যায় (৫য়)।

ভূজ্জন : সত্যেশ চক্রবর্তী (১ম) ; বিমলেন্দু ভট্টাচার্য (২য়)।

এম. এস. সি—ভূতত্ত্ব : প্রতীগুরুমার মুখোপাধ্যায় (১ম) ; রবীন্দ্রনাথ বন্দু (২য়)।

উত্তিদ্বিদ্যা : শুভিত্রা তালুকদার (১ম)।

সংখ্যাবিজ্ঞান : সমরেন্দ্রনাথ মিত্র (১ম)।

শারীর ইত্তত : ধূর্জিতপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২য়)।

পদার্থবিদ্যা : রেখা চলিহা (৫য়)।

গত ডিসেম্বর মাসে বিখ্বিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমাদের কলেজের যে সব ছাত্রছাত্রী ১৯৫১ সালের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফলের উপর বিভিন্ন পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের নাম এবং পদকের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হল :—

এম. এ— অর্থনীতি : অলক ঘোষ (বঙ্গবিদ্যার বন্দোপাধ্যায় স্বর্ণপদক)।

উত্তিদ্বিদ্যা : চিত্রা ঘোষ (বিখ্বিদ্যালয় স্বর্ণপদক, কমলরাণী স্বর্ণপদক এবং অজিতকুমার শিক্ষা স্বর্ণনেমি রোপ্যপদক)।

এম. এস. সি—রসায়ন : অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় (মিলিল মল্লিক স্বর্ণনেমি রোপ্যপদক)।

ভূতত্ত্ব : বিমলেন্দু রায়চোধুরী (বিখ্বিদ্যালয় স্বর্ণপদক)।

সংখ্যাবিজ্ঞান : রাধাগোবিন্দ লাহা (বিখ্বিদ্যালয় রোপ্যপদক)।

শুজিৎকুমার মিত্র (বিখ্বিদ্যালয় স্বর্ণপদক)।

বি, এ— দর্শন : ত্রিলা মহলানবিশ (কেশবচন্দ্র সেন স্বর্ণপদক, হেমন্তকুমার সেন স্বর্ণপদক, গঙ্গার্মণি দেবী স্বর্ণপদক, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বর্ণনেমি রোপ্যপদক)।

ইতিহাস : শশীরকুমার দত্ত (ঠাকুরদাস কর স্বর্ণপদক)।

অর্থনীতি : প্রচলাদকুমার বন্দু (এন. এন. ঘোষ স্বর্ণনেমি রোপ্যপদক)।

দেবত্বত বন্দোপাধ্যায় (Quinlan রোপ্য শুক্তিপদক)।

সংখ্যাবিজ্ঞান : অভীজন্মোহন গুপ্ত (শুভেন্দুশেখর বন্দু স্বর্ণপদক)।

সংস্কৃত : সন্ধ্যারাণী দে (বিদ্যাসাগর স্বর্ণনেমি রোপ্যপদক)।

ইংরাজী : অরুণকুমার দাশগুপ্ত (মানাকুঠি রোস্টমজী স্বর্ণপদক, প্রিয়বাথ ঘোষ এবং গগনতারা দাসী রোপ্যপদক, অবিনাশচন্দ্র রোপ্যপদক)।

বি, এস-সি—ভূতত্ত্ব : ক্ষিতীজন্মোহন নাহা (হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত রোপ্য পদক)।

পদার্থবিদ্যা : বিখ্রঞ্জন নাগ (মেহিনীমোহন রায় রোপ্য শুক্তিপদক)।

গণিত : অধ্যবীষ ঘোষ (মহানন্দনাথ ভট্টাচার্য স্বর্ণনেমি রোপ্যপদক, Herschel স্বর্ণপদক, দেবেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় রোপ্যপদক, সরোজ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণ শুক্তিপদক)।

কমলেন্দু দাস (McCann রোপ্যপদক)।

রসায়ন : সমীর সরকার (রম্মীমোহন মজুমদার স্বর্ণনেমি রোপ্যপদক)।

পদার্থবিদ্যা : তুহিনা ঘোষ (বাসন্তী দাস রোপ্যপদক)।

১৯৫২ সালের আই, এস-সি পরীক্ষার ফলাফলের উপর আমাদের কলেজের ছাত্রদের পদক, প্রাইজ প্রতিটি প্রাপ্তির বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল :—

দেবীচরণ খী—Stephen Finney রোপ্য পদক, কে, বি, দাশগুপ্ত স্বর্ণপদক, সারদা প্রসাদ প্রাইজ, ডাক্ষত্বি (পদার্থবিদ্যায় কৃতিত্বের জন্য)।

মহম্মদ আসগর আলি—সারদা প্রসাদ প্রাইজ।

অনিলকুমার ঘোষ—বায়বাহাদুর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রাইজ।

এই বৎসর গত ২০শে জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত 'প্রতিষ্ঠাত্ত-দিবস' সভার ১৯৫২ সালের এবং (আংশিকভাবে) ১৯৫১ সালের বিদ্যবিদ্যালয় এবং কলেজের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের উপর কলেজ থেকে যেসব পদক এবং প্রাইজ বিতরণ করা হয় তার বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হল :—

আই, এ এবং আই, এস-সি :

দিক্ষিয়া স্বর্ণপদক এবং গোয়ালিয়র প্রাইজ (সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্য)

বিজ্ঞান : দেবীচরণ খী (১৯৫২)

অর্টিস : অদীপকুমার দাস (১৯৫২)।

চারচত্ত্ব ঘোষ স্মৃতি প্রাইজ (ইংরাজী অনার্স তত্ত্বাত্মক শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট পর্যাকৃত ইংরাজীতে সর্বাধিক কৃতিত্ব-প্রদর্শনকারীর প্রাপ্ত্য) —গীতা গুহরায় (১৯৫১)।

বিদ্যনাথ ভট্টাচার্য (১৯৫২)।

অর্থ সরকার স্মৃতি পদক (বাংলায় কৃতিত্বের জন্য) —শফুর সেন, মুগেন্দ্রনাথ পোদ্দার (১৯৫২)

হারিশচন্দ্র কবিত্ব প্রাইজ (সংস্কৃতে কৃতিত্বের জন্য) —যতিকুমার সেনগুপ্ত (১৯৫১)।

অরূপকুমার ভাদ্রভূ (১৯৫২)।

কলেজ প্রাইজ (ভূজানে কৃতিত্বের জন্য) —রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯৫২)।

চন্দনাথ বৈদ্র পদক (ভূতত্ত্বে কৃতিত্বের জন্য) —তারাপদ ভট্টাচার্য (১৯৫০)।

সোহনলাল আগরওয়াল (১৯৫২)।

বি, এ এবং বি, এস-সি :

Cunningham স্মৃতি প্রাইজ (রসায়ন অনার্সে কৃতিত্বের জন্য) —জনসীমমুক্ত দন্ত (১৯৫২)

কলেজ প্রাইজ (গঞ্জবার্ষিক শ্রেণীভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে অনার্সে রসায়নে কৃতিত্বের জন্য) —সচিদানন্দ দন্ত (১৯৫২)।

যোগেনচন্দ্র নাগ স্মৃতি পদক (উদ্ভিদবিদ্যায় কৃতিত্বের জন্য) —অশোককুমার সিংহ (১৯৫১)।

দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৯৫২)।

এম. এ এবং এম. এস-সি :

চন্দনায়ণ স্বর্ণপদক (ইতিহাসে কৃতিত্বের জন্য) —কমলকুমার ঘটক (১৯৫১)

Cunningham স্মৃতি প্রাইজ (রসায়নে কৃতিত্বের জন্য) —অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৫১)।

অরূপকুমার বড়ুয়া (১৯৫০)।

কলেজের বার্ষিক পরীক্ষা (১৯৫২ এবং ১৯৫১) :

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রাইজ (আই, এস-সি ক্লাসে সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্য) —জুনীলকৃষ্ণ পাল।

আশুতোষ চোদ্বী প্রাইজ (আই, এস-সি ক্লাসে সামগ্রিক কৃতিত্বের জন্য) —শামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুঞ্জবিহারী বসাক পদক (তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে রসায়ন প্র্যাক্টিক্যালে কৃতিত্বের জন্য) — তৃতীয় মাসগুপ্ত (১৯৫১-৫২) ; হেলেন রায় (১৯৫০-৫১) ।

নিষ্ঠারিণী দাসী প্রাইজ (আই, এস. সি. ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞা প্র্যাক্টিক্যালে কৃতিত্বের জন্য) — অধিবাসী শুগ (১৯৫১-৫২) ; অসীমরঞ্জন সেন (১৯৫০-৫২) ।

ছাত্রপরিষদ :

কাজ করার অকুরস্ত উৎসাহ আর উদ্বীগনার সাথে একদিন আমরা পেয়েছিলাম পরিষদের কার্যভার। সংগঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে কলেজের ছাত্রপরিষদের ইতিহাসে নৃতন অধ্যায়রচনার স্থপ ছিল তখন আমাদের চোখে—যেখন থাকে প্রতিবছরের নবনির্বাচিতদের কল্ননায়। কিন্তু আজ দীর্ঘ একবছরের পর পরিষদের সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনরচনায় বসে দুঃখের সঙ্গে মনে হচ্ছে—কলমার সামগ্রিক বাস্তব রূপায়ণ তো সত্ত্ব হন না! সেদিনের সন্তান্য-ভবিত্বের অনেক স্থপ আজ পেছনে ফেলেন্তাসা বছরের পটভূমিকায় ব্যর্থভাবে ধরে ফুটে উঠেছে। আমাদের ব্যক্তিগত অক্ষমতা এর জন্যে আংশিক ভাবে দায়ী হলেও আরও অনেক কারণ আছে এর পেছনে।

বড়ুরকম নতুন কিছু করার আশা সার্থক না হলেও পরিষদের ধরা-বৰ্তা জীবন-নাট্যের কেন অংশই আমরা অবহেলা করি নি ; বরং কয়েক বিষয়ে আমরা নৃতন্ত্ব ও স্বৃষ্টির দায়ী করতে পারি। অতিবারের মতো অতিষ্ঠা-সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে এবারও আরও হয় পরিষদের জীবন। কলেজ-পত্রিকার গত সংখ্যাতে এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ একবার বেরিয়ে দাওয়ায় এবার আর তা নিয়ে আলোচনা করলাম না।

নতুন জিনিষের মধ্যে আমাদের শাস্তি-সপ্তাহ-উৎসব সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথমবার বলে আমরা এই অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে তুলতে পারি নি। গীতাবকাশের পূর্বে আরও একটি বিচ্ছিন্নান্তনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

‘দেয়ালী’ : কলেজ-দেয়ালীর পূর্বতন সম্পাদকদ্বয় প্রত্যাগ করায় পরিষদ পার্থসারথি শুগ এবং তুমারকাস্তি ঘোষকে দেয়ালী পরিচালনার ভার দেয় এবং বলাবাছলা এবং দের দুজনের পরিচালনাগুলো সমষ্ট কলেজের ছাত্রছাত্রীর প্রশংসন অর্জন করেছে। প্রথমবর্তীর ছাত্রদের আগ্রহাত্মিক্যে পরিষদ থেকে প্রথমবর্তীর জন্যে বিশেষ একটি দেয়ালী রাবির্ভাব হয় এবছর।

সমাজসেবা বিভাগের পূর্ব-নির্বাচিত সম্পাদক আমাদের কলেজ ছেড়ে চলে দাওয়ায় তাঁর স্থানে সম্বিধান চাটার্জি নির্বাচিত হন। দুরিং ছাত্রদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা ছাত্র অনেক দুঃখ ভদ্রসন্তানের চিকিৎসার জন্য দুর্দান্ত উৎসপত্রাদির ব্যবস্থাও করা হয় এই বিভাগের নেতৃত্বে।

বিস্তর্ক-বিভাগ : বক্র দে'র পরিচালনায় বেশ ভালই কাজ করে এবার। বাংলা-বিতর্কের একটি ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা হয় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে।

রবীন্দ্র-পরিষদ : শেষদিকে বেশ তাড়াতাড়ি কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।—তার মধ্যে ‘নিউএস্পারারে’ যে অনুষ্ঠানটি হয় তার জন্যে পরিষদ-সম্পাদক অরূপ রায় স্বতন্ত্র দায়ী করতে পারেন।

নাট্য : সম্পাদক অবিবার্য কারণ-বশতঃ কলেজ থেকে অকস্মাত বিদ্যার নেওয়ায় এবারের নাট্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের স্থষ্টি হয়। অবশ্য ভারতীয় কর্মসূচির সম্বিধান চাটার্জি, মুরীর চক্ৰবৰ্তীৰ সহযোগিতার সাফল্যের সঙ্গে সমষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করেন। নিউএস্পারারে আমাদের নাট্যানুষ্ঠান উপস্থিত সকলের অরুণ প্রশংসন অর্জন করে এবং এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা স্বৃষ্টির সঙ্গে

পরিচালনা করে অধ্যাপকদের প্রশংসনাভাজন হয়। এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সেলিমা প্রধানকে ; তিনি একাধিক ছবি একে দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন।

এছাড়া পরিষদের সক্রিয় সাহায্যে এবার দ্বিতীয়বর্ষে ও তৃতীয়বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি করে আলাদা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। কলেজের ছাত্র-পরিষদের ইতিহাসে এধরণের অনুষ্ঠান বোধহয় এই প্রথম।

নতুন পরিষদ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর একটি নতুন পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের সম্পাদকবৃন্দ নবনির্বাচিত সম্পাদকদের সঙ্গে একটি মিটিং সময়ে মিলিত হয়। সেখানে আমরা আমাদের একবছরের সমস্ত অভিজ্ঞতা-প্রযুক্তি উপরে ও নানাবিধ কার্যপরিকল্পনা দান করি নতুন সম্পাদকদের এবং তাঁরা এতে যথেষ্ট উৎসাহিত মেধ করেন। পরিষদের সহসম্পাদক রঞ্জিত চ্যাটার্জি সমস্ত ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্প্রস্ত করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ ব্যক্তিশিল্প সেনগুপ্ত মহাশয় সর্বকার্যে আমাদের উৎসাহ দান করেছিলেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

সবশেষে আমি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানাই আর পরিষদের সমস্ত ক্রটি-বিচুতির জন্যে তাঁদের ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শুনীতিকুমার বসু—সাধারণ সম্পাদক

প্রকাশনা বিভাগ :

দায় এবং দায়িত্ব, তাড়া এবং তাড়নার দম্পত্তী-ক্ষমতা কাপে অবশেষে কলেজ পত্রিকা সভ্য প্রকাশিত হলো, যদিও নির্বিষ্ট সময়ের প্রায় তিনবাস পারে। তবে এই অহেতুক বিলম্বের জন্যে মূলতঃ কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই দায়ী কারণ তাঁদের বচন এবং সেমিনার-রিপোর্ট এক্সেল যথাসময়ে এসে পৌছোয় নি। তাঁদের কাছে আমাদের আরেকটা অনুযোগ যে ব্যবার বলা সঙ্গেও তাঁরা সম্মত পত্রিকা গ্রহণ করেন না। তাই পুনর্বার অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা সময়মত পত্রিকা গ্রহণ করে কর্মসংচাকে যেন ভারযুক্ত করেন।

পত্রিকাপ্রকাশ ছাড়া “দেয়ালী”র ভারত আমাদের ওপর শক্ত হয়েছে। পূর্বতন সম্পাদকব্য শ্রীমুদীর ব্যার্চেলুরি ও তীগগন দ্বন্দ্ব বিশেষ কারণবশতঃ “দেয়ালী”র সম্পাদনার ভার পুনর্বার গ্রহণ করতে অসীকৃত হওয়ায় অহংকারী মুগ্ধসম্পাদক শ্রীপার্বদ্ধাৰথি গুপ্ত ও শ্রীতুবাৰকাস্তি ঘোষ কলেজের ছাত্রপরিষদ কর্তৃক হ্যায়ী মুগ্ধসম্পাদককাপে নির্বাচিত হন। আশা করি তাঁরা তাঁদের সম্পাদন-দক্ষতা এবং লেখনী-বৈদেশ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের তথাকথিত সাহিত্য-মনন রসৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের কর্মকুশলতার জন্যে ধন্যবাদ !

তাঁরপোষ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীভবতোষ সন্ত এবং শ্রীমুদীর ব্যার্চেলুরি, শ্রীশক্রান্ত মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীণা চট্টোপাধ্যয় প্রমুখ ছাত্রবকুলের বিভাগীয় কাজে সহযোগিতা করার জন্যে অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যদিও তাঁরা ব্যক্তিগত তাঁবে নেইথিক ধন্যবাদের বহু উৎবের্দে।

সর্বশেষে, কলেজপত্রিকার ঐতিহ-প্রদীপ্ত স্বর্ণোজ্জল ভবিষ্যতের জন্যে আমরা আন্তরিক শ্রীতি-গুভেজ্জা রাখিল।
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত—সম্পাদক

বিতর্ক-পরিষদ :

এ বছরের অথমাব্দে আমাদের কলেজে তিনটি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয় ও আমরা একটি প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কে যোগাযোগ করি। কলেজ পত্রিকার গত সংখ্যায় বিতর্ক-পরিষদের যে কার্য-বিবরণী দিয়েছিলাম, তাতে জুনাই মাস থেকে পান্তিক বিতর্ক-সভা আয়োজন করার আশা প্রকাশ করি। এই প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ করবার সেৰাগ্য আমার ঘটেছে। আবদ্ধের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে গ্রীষ্মাবকাশের পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক-সভাগুলিতে শ্রোতা

এবং বঙ্গীয় সমাজম ক্রমবর্ধমান—অবগ্নি ছাত্রীদের বিতর্কে অংশগ্রহণ করার কোন আশা তো এবাবেও দেখতে পাওয়া যায় নি। বিতর্ক সমক্ষে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পুনরায় যে মনোযোগ দেখিয়েছেন তাতে আমার আর একটি ইচ্ছাও পূর্ণ হয়েছে—এটি হোল প্রতি শ্রেণীতে বিতর্ক-গোষ্ঠী প্রবর্তন করে অনিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক-রীতিতে পরিচিত করা। এই কার্যটির জন্য প্রতি শ্রেণীর ছাত্রেরা আমাদের ধন্যবাদভাজন। একটি প্রদর্শনী সভায় কয়েকজন লক্ষ্যস্থিতি বিতর্ক-বিশেষজ্ঞের আলোচনা শোভাবার সৌভাগ্যও আমাদের হয়েছে। আমার ভবসা আছে যে আমার পরবর্তী সম্পাদক যে উৎসাহ ও বিতর্কানুরাগ নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে তিনি পাকিস্তান স্থলে হয়েতো সাহাইক বিতর্কানুষ্ঠান করতে পারবেন।

গত জুনাই মাসের ১১ই তারিখে ১৮ং ঘরে “In the opinion of the house, reorganisation of the country by parliamentary means, and not by revolution, is desirable”—এই প্রস্তাবটি নিয়ে একটা বিতর্কের আয়োজন করা হয়। শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকগণের মধ্যে শ্রীঅমিয় মজুমদার সভাপতি ছিলেন এবং ত্রৈয়েশ ঘোষ ও জোবা মামুদ বিচারকরূপে উপস্থিত ছিলেন। বিতর্ক-বিশয়টি তুমুল উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। স্টেডিয়াম কালে বিশয়ের বিবরণ মতই গৃহীত হয়। তৃতীয়বর্ষ কলাশ্রেণীর প্রদীপ দাশ প্রথমস্থান অধিকার করেন ও চতুর্থ বর্ষের পার্থসারথি গুপ্ত ও রঘুবীর দাশ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান অধিকার করেন। এর পরে ২৫-এ জুনাই, ৩০ং ঘরে একটি বিতর্ক-সভার অনুষ্ঠান হয়। বিতর্কবিষয়টি ছিল “A Communist society cannot produce art of the best type”। সভাপতিত্ব করেন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত। অচান্ত বিচারকর্তা ছিলেন শ্রীঅমিয় মজুমদার ও শ্রীঅমল ভট্টাচার্য। চতুর্থ বর্ষের পার্থসারথি গুপ্ত ও অমর্ত্য সেন এবং তৃতীয়বর্ষ কলাশ্রেণীর প্রদীপ দাশ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান অধিকার করেন। প্রতি শ্রেণী থেকেই ছাত্রেরা এ বিতর্কে বোগদান করেছিলেন এবং প্রথম বর্ষের অধোক চ্যাটার্জি বিচারকমণ্ডলীর মতে সেদিমকার সভায় অন্যতম কৃতী বক্তা হিসাবে মুনাফা অর্জন করেন। কলেজে এই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বিতর্কে মোগদান। এ সভাতেও তোটে বিশয়ের বিবৃতিমতই গৃহীত হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের পর প্রথম প্রদর্শনী বিতর্কসভার আয়োজন করা হয় ১২ই আগস্ট ফিজিয় বক্তৃতাকক্ষে। “The Choice in India lies between Communism and Right Totalitarianism” ছিল বিষয়বস্তু ও এর উপর আলোচনা করেন Bengal Debating Society’র পক্ষ থেকে শ্রীরধার্ণ দাশগুপ্ত, শ্রীবিজু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনিপক বাবু ও কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন অমর্ত্য সেন, পার্থসারথি গুপ্ত, প্রদীপ দাশ ও অধোক চ্যাটার্জি। বিষয়টি ভোটাদিক্ষে গৃহীত হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীঅমিয় মজুমদার।

২৫এ আগস্ট পুনরায় ফিজিয় বক্তৃতাকক্ষে বাংলা ভাষায় একটি সাধারণ বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয়। বিষয়বস্তু “বাংলা কবিতা ক্রমাণ্ডলী অবনতির পথে” নিয়ে সভায় ও বঙ্গাদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার স্তুতি হয়। এই দিনের সাধারণ বক্তৃতার মান বেশ উচু ছিল। অমর্ত্য সেন ও পার্থসারথি গুপ্ত যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়স্থান লাভ করে পুরস্কার পান ও দ্বিতীয়বর্ষ শ্রেণীর নিশির দাস তৃতীয়স্থান লাভ করেন। শ্রীঅমিয় মজুমদার সভাপতিত্বে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিচারকর্তা ছিলেন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকত্রয় শ্রীচন্দ্রিকাপ্রদীপ বনোপাধ্যায়, শ্রীভূদেব চৌধুরী ও শ্রীকুমিরাম দাস।

১৩ই সেপ্টেম্বর ওই একই স্থলে শেষ বিতর্কসভার আয়োজন হয়। বিষয়বস্তু ছিল “Under the present economic set-up, India is still a colony,” এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅমিয় মজুমদার। বঙ্গাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক শ্রীশিলির চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীঅরণ্যপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীঅল্পানন্দ দত্ত। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই সভাটি সার্থক করা দুর্ক হয়ে উঠেতো।

গত মার্চ মাসে আমাদের কলেজ থেকে একটি মন শিবপূর বি. ই. কলেজের একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায়

বোগদান করেছিল। হেট ব্রিটেনে যে ভারতীয় বিতর্কদল পাঠ্যবার কথা ছিল তার জন্য জুলাই ১৮ই তারিখে বিদ্যবিদ্যালয়ে এক প্রাথমিক নির্বাচনী সভা হয়। সভাতেই বঙ্গদের বিষয়বস্তু বলে দেওয়া হয়েছিল। কলেজের তরফ থেকে বলেন দ্বাতকোত্তর শ্রেণীর সুদৃঢ়ি দাশগুপ্ত এবং পার্থসারথি গুপ্ত ও অদীপ দাশ। তাদের মধ্যে থেকে যদিও কেউ প্রথম স্থান অধিকার করেন নি, তবুও তাদের বক্তৃতার উৎকর্ষ সমন্বে মেদিন কাঙ্গারই দ্বিতীয় ছিল না।

কলেজের প্রাচীর পত্রিকা 'দেয়ালী'তে আমি বলেছিলাম যে একটি আন্তঃকলেজীয় বিতর্ক ও একটি অধ্যাপক ব্যাম ছাত্র বিতর্কের অনুষ্ঠান করার আমার ইচ্ছা আছে। দ্রুতের বিষয় যে সময়ের অভাবে ও অন্যান্য গুরুতর কারণে এই সভাগুলির আয়োজন করা সম্ভব হয়ে উঠল না। আশা করি আমার পরবর্তী সম্পাদক এই কাজগুলি করে যেতে পারবেন।

গীয়াবকাশের পর থেকে প্রতি শ্রেণীর বিতর্কগোষ্ঠীগুলি, যথাক্রমে অবৃদ্ধি রায় ও ভারতী সেনগুপ্ত (তৃতীয় বর্ষ), অদীপ গান্ধী ও শ্রামলেন্দু বন্দোপাধায় (দ্বিতীয় বর্ষ) ও প্রথমবর্ষের অধোক চাটার্জির সম্পাদনায় খুবই কার্যতৎপৰতা দেখিয়েছে। তৃতীয় বর্ষ পাঠ্যচক্র "India's foreign policy is out and out neutral" ও "Communism cannot solve the problems of India" সমন্বে দুটি বিতর্কসভার অনুষ্ঠান করেন। দ্বিতীয় বর্ষের বক্তৃতা "Poetry declines with the progress of civilization" সমন্বে আনন্দচন্দ্র করেন। প্রথম বর্ষে "Violation of order is not the right way to solve the food problem of W. Bengal" ও "Third World War is the only way to establish peace on earth" সমন্বে বিতর্কসভার ব্যবহৃত করা হয়। "Nationalism is an international danger" সমন্বে তৃতীয় ও প্রথম বর্ষের মধ্যে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা হয় ও বিজয়বাদী তৃতীয়বর্ষকেই জয়ী ঘোষণা করা হয়। এই সভাগুলিতে অনেক নবীন বক্তৃ বিতর্ক যাপারে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। যে ক'জন কলেজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তারা ছাড়া তৃতীয়বর্ষের অজিত রায় ও প্রতিযোগিতার অন্তর বাগচী ও প্রথমবর্ষের অরূপাত্ম দাশগুপ্ত ও অর্জুন সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ বছর বিতর্কপরিষদের কার্যে যদি কিছুমাত্র উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়, তবে তার প্রধান কারণ হবে কলেজের শ্রেণী অধ্যাপক মহাশয় ও কর্মকর্তা অধ্যাপকের সহায় প্রেরণা। ছাত্রবক্তৃদের মধ্যে অনেকেই আয়োজন যাপারে আমাদের সহায়তা করেছেন। এদের মধ্যে অর্ম্য সেন, নীতিশ সেনগুপ্ত ও পার্থসারথি গুপ্তের দোঁসাই সহযোগিতার জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শুধুমাত্র চক্রবর্তী, বিমল বৰ্মন ও রণেন গুপ্তে আমাকে অকৃত্যভাবে তাদের সাহায্যদান করে ধ্যাবাদভাজন হয়েছেন। বিতর্ক পরিষদের কার্যবর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তারগুপ্ত অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদারের প্রতি আমরা সন্তুষ্টজ্ঞ ধ্যাবাদ না জানাই। কয়েক বছর ধরে বিতর্ক পরিষদকে তিনি যেকোণ অক্রান্তভাবে নির্দেশনান্তর সমৃক্ত করেছেন, তা না পেলে বোধহয় আমাদের কাজ দুঃসাধ্য হয়ে উঠে।

বর্তমানে—বিতর্ক-সম্পাদক

[এই প্রসঙ্গে কলেজের বাইরেও বিতর্কানুষ্ঠানে আমাদের ছাত্রদের কৃতিত্বের নির্দর্শনরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চতুর্বৰ্ষিক শ্রেণীর শ্রীঅমর্ত্যকুমার সেন বহরমপুরে অকৃত্য আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং প্রথমবর্ষিক শ্রেণীর শ্রীঅর্জুন সেনগুপ্ত University Institute-পরিচালিত বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। স. প্রে. ক. প.]

যবীন্দ্র পরিষদ :

গৃহবারের সংখ্যায় 'নবীন' নাটকটি পরিষদের মঞ্চে করা সম্পর্কে কিছু লেখা হয়েছিল। কিন্তু পরিষদের দায়িত্ব থাকলেও সেটা বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেসের সভ্যদের জন্যেই বিশেষভাবে অভিনীত হয়েছিল।

এবারের বিবরণীর মধ্যে যে-সব অনুষ্ঠানের পরিচিতি পড়ে সেগুলো সবই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাত্মী ও অধ্যাপকদের কাছে পরিবেশিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের কলেজে গানবাজনা ছাড়া অন্য কোনো অনুষ্ঠানে ততটা সামগ্রিক সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ সহায়তা পাওয়া যাও না, তবে মুষ্টিয়ে কয়েকজনের আগ্রহে অনেক সময়ে সত্যিই এ ধরণের কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়।

‘নবীনের’ পরে সবার প্রথমে হয়েছিল সংলাপ ও রবীন্দ্রনাথের অবশেষ সংগীতের সহযোগে ‘ঘদেশ’ এই পর্যায়ে একটি অনুষ্ঠান। ১৯১২ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহটি আমাদের কলেজে শাস্তিসপ্তাহ হিসাবে পালিত হয়েছিল; তার কিছু পরেই এটি অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের ছাত্রাত্মীদের দ্বারা পরিবেশিত এই অনুষ্ঠানটি নতুনতে ও সার্থকতায় প্রশংসন অর্জন করতে সমর্প হয়েছিল।

এর পরের অনুষ্ঠান ২৬শে জুলাই তারিখে সন্ক্ষয় একক সংগীতানুষ্ঠান। ‘ঘদেশের’ মত এটিও কলেজের আর্টস লাইব্রেরি হলে হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই বৃত্তি দেখিয়েছিলেন, যেটা দৈত ও সম্মেরুক সংগীতের মধ্যে বেশি সম্ভব নয়। সংগীত পরিবেশন করেছিলেন বীথিকা রায়, মুরত দত্ত, রবীন মুখোপাধ্যায়, রাজবি মজুমদার, দ্বাতীশ দাশগুপ্ত, শংকর সেন ও অরূপ রায়। নিম্নোক্ত শিল্পী হিসেবে গান গেরেছিলেন রঞ্জ সেনগুপ্ত।

নিউএল্পাইয়ার রঙমধ্যে গত ১২ই সেপ্টেম্বর সকালে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান। ‘ঝুঁতুবন্ধ’ নামে এই সংগীতালেখ্যটি পুঁজোর বক্সের ঠিক আগেই অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাতে কলেজের ছাত্রাত্মীরা যেবকম উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা অনেকদিন পাওয়া যাব নি। সংলাপাংশ রচনা করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-সংগীতের ধারায় ষড়খন্তুর দীলাময় প্রকাশ এই অনুষ্ঠানটির বিবরণস্ত ছিল। সংগীত নির্বাচন ও তার সংযোগ পরিবেশনা আকর্ষণীয় হয়েছিল। আনুষ্ঠির অংশ একটু দুর্বল হয়ে পড়েছেও সংগীতগুলি খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বীথিকা রায়, গীতা গুহরায়, দীপালী গুপ্ত, চিরো সরকার, দীপালী ঘোষাল, মাধুবী বড়ুয়া, সেলিমা প্রধান, জয়ষ্ঠী চক্রবর্তী, প্রবী বন্ধু, বেলা ভট্টাচার্য, বেলা ঘোষ, শংকর সেন, রবীন মুখোপাধ্যায়, অমিত মিত্র, গগন দত্ত, অমল মুখোপাধ্যায়, অরূপ রায়—সংলাপাংশে অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, কল্যাণ দাশগুপ্ত, অমর্তা সেন, পার্থসারথি গুপ্ত, সমীর রায়, অর্জুন সেনগুপ্ত এবং সংগীতাংশে নিম্নোক্ত শিল্পী ছিলেন অমিয়া রায়, তরুণ মিত্র ও বিমল নাগ।

যে সমস্ত ছাত্রাত্মীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে শেষের অনুষ্ঠানটির বাবস্থাপনায় সহায়তা করেছিলেন তাদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর শ্রীতরুণ মিত্রের কাছে সংগীতাংশের মহড়ার তত্ত্ববিদানের জন্যে আমি খুবী। আমার কার্যকাল শেষ হ'ল। অনুবর্তী সফলতার হোন এই কামনা করে বিদায় নিছি।

অরূপ রায়—সম্পাদক

সমাজসেবা বিভাগ :

যদিও সমাজসেবা বিভাগের প্রাক্তন সম্পাদক মহাশয়ের ‘অনেককিছু’ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বিশেষ কিছু কাজ করার আগেই তাকে কার্যোগলক্ষে অস্ত্র চলে যেতে হয়েছে। তার বিদায়ের পর ছাত্রপরিষদ যখন আমাকে নির্বাচিত করেন তখন আর আমাদের হাতে এমন সময় অবশিষ্ট ছিল না যাতে অনেককিছু করা যেতে পারে। হত্তরাং ছোট ছোট কিছু কাজ করেই আমাদের এবারকার মত সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই ছোট ছোট কার্যগুলির মধ্যে এই দুরিয়ে নিরন্তর ব্যক্তিকে সাহায্য, মোগাজান্ত বহু ব্যক্তিকে উষ্ণ ও অর্দ্ধের দ্বারা সাহায্য, উল্লেখযোগ্য বিষয়। যে সকল রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করা হয়েছে তার মধ্যে যন্ত্রারোগাক্রান্ত ছাত্রের সংখ্যাই বেশী। এছাড়া T. B. Seal বিভাগের জন্যে এবার কলেজে অভিযান শুরু করা হয়েছিল এবং ছাত্রাত্মীদের উৎসাহে এই

অভিযান সাফল্যান্তরণ করে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর বিশেষ কিছু সমাজসেবা বিভাগ করে উঠতে পারেনি। আমরা জানি, আরও অনেককিছু আমাদের করা উচিত ছিল কিন্তু সময়সূত্রে করা সম্ভব হয়নি। এর জন্য ও আমাদের আরও বহু ক্রটিবিচুতির জন্য ছাইছাত্রীরা আমাদের ক্ষমা করবেন। সবশেষে আমাকে আমার কাজে সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাব শ্রীবীরেন পালচৌধুরী, শ্রীঅশোক চ্যাটার্জি, শ্রীর্গামীদাস রায়, শ্রীশঙ্কর দেন, শ্রীত্রিস্তুন্নাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী গোবী দাসগুপ্তকে। এবং এর ঐকাণ্টিক সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই উপলক্ষে অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁর সাহায্য ও উপদেশ সবসময় আমাদের উৎসাহ দিয়েছে।

স্বিদ্ধুমার চট্টাপাখ্যায়—সম্পাদক, সমাজসেবা বিভাগ

নাট্যপরিষদ :

এ বছরের নাট্যানুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১০ই সেপ্টেম্বর 'নিউ এলায়ার' রঞ্জমকে নাট্যপরিষদের পরিচালনায় বনানুলোপের 'নবসংস্করণ' ও পরিশুরামের 'বিরিপ্রিবাবার' নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। কলেজের ছাত্রেরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এবারকার নাট্যানুষ্ঠানে অভিনয়, পরিচালনা, আর সঙ্গীত রচনা ইত্যাপিতে যে সামগ্রিক নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে বহু বছর নাট্যানুষ্ঠান এ বছরের মত সাফল্যান্তরণ করেনি। নাটকের বিভিন্ন বিভাগে ও ভূমিকায় ধাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুধু নাট্যানুষ্ঠানে নয়, এবার ঐ দিনই একটি বিচিত্রানুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়। পেশাদারী শিল্পীদের বর্জন করে কলেজের শিল্পীরাই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিচিত্রানুষ্ঠানটি ও ছাইছাত্রীদের যথেষ্ট আনন্দ দেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে দর্শক ও শ্রোতৃদের কাছ থেকে বিশেষ আগ্রহ, ধৈর্য ও ভদ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে বহু ক্রটিবিচুতি হয়েছিল। সব অনুষ্ঠানেই ক্রটিবিচুতি হয় এবং আমাদের অনুষ্ঠান তাহার ব্যক্তিগত নয়। এই সকল ক্রটিবিচুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সবশেষে, ধন্যবাদ জানাব তাঁদের, ধাঁদের আন্তরিক সাহায্য ও উপদেশ আমাকে কার্যসম্পাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। অথবেই ধন্যবাদ জানাই অধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠের শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহিষয়কে। তাঁর উপদেশ ও উৎসাহ সব কাজেই আমরা পেয়েছি। অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষ মহাশয়কেও এই উপলক্ষে ধন্যবাদ জানাই। ছাত্রদের মধ্য থেকে ধাঁদের অকৃত সাহায্য ব্যক্তি আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হ'ত না, তাঁদের সকলকার নাম এই অল্পপরিম জাগরণের উল্লেখ করা সম্ভব হবে না, কিন্তু তাঁদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ছাত্রদের মধ্যে শ্রীহনীতি বন্ধু, শ্রীমুখীর চক্রবর্তী, শ্রীর্গামীদাস রায়, শ্রীপ্রদীপ দাস, শ্রীঅনাদিনাথ বলোগাধায়, শ্রীরঞ্জিঙ চট্টাপাখ্যায়, শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্তী, শ্রীশেখর দত্ত, শ্রীবুঝ দে, শ্রীবিমল বৰ্মণ ও শ্রীবীরেন পালচৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরবর্তী নাট্যসম্পাদকের পরিচালনায় নাট্যপরিষদ আরও উন্নতি ও গ্রাগতিশীলতার পথে এগিয়ে যাক এই কামনা করে আজকের মত আমার বিবরণ শেষ করব।

শ্রীস্বিদ্ধুমার চট্টাপাখ্যায়—নাট্যসম্পাদক

ছাত্রাবাস :

বর্তমান বৎসরে ইডেন হিল্স হোষ্টেলের আবাসিক সংখ্যা ১৮০। আবাসিকদের অধিকাংশই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। কিছুমাত্রে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং কিছুমাত্রে মধ্যকলিকাতা কলেজের ছাত্রও আছে। নাই শুধু প্রেসিডেন্সী কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রগণ, যাইদের অভাব আজ প্রতিটি আবাসিকের কাছে

বেদনাদায়ক। ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ আজ শুধু বেদনাক্লিঁষ্টই নয়, কর্তৃপক্ষের এ ব্যবস্থায় রীতিমত দুঃখ। আবাসিকগণের এই র্যাঙ্কিক ক্ষেত্রসমন্বয়ে প্রথমেই কর্তৃপক্ষের সহায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

ছাত্রাবাসের পরিচালনার ভার হ্রস্ব আছে, আবাসিকদের দ্বারা গঠিত কয়েকটা কার্যনির্বাহক সমিতির উপর। সমিতির সদস্যগণ সকলেই আবাসিকদের দ্বারা নির্বাচিত। ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী ছাত্রপরিষদের সভাপতি। শ্রীমুখময় চক্রবর্তী এবং শ্রীমুণ্গালকান্তি মল্লিক বর্তমান ছাত্রপরিষদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

আবাসিকগণের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সহযোগ্য পরিচালনায় এবং সর্দোগৱি ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর স্বেহময় তত্ত্বাবধানে আমাদের কয়েকটা কার্যকে ছাত্রাবাসের অভিত ঐতিহ্যমূল্যপূর্ণ বলিয়া দাবী করিতে পারি।

আমাদের ছাত্রাবাস কর্তৃক পরিচালিত কলিকাতা আন্তঃছাত্রাবাস ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমরা অংশগ্রহণ করি। ছাত্রাবাসের আন্তঃওয়ার্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৪ৰ্থ এবং ৫ম ওয়ার্ড একযোগে চ্যাম্পিয়ন হয়। আন্তঃওয়ার্ড ভলিবল প্রতিযোগিতায় ১ম ওয়ার্ড অতি উচ্চাঙ্গের খেলা প্রদর্শন করিয়া ফাইনালে ৪ৰ্থ ওয়ার্ডকে প্রাপ্তি করে। প্রতিযোগিতা অন্তে অধ্যাপক চক্রবর্তী পুরস্কার বিতরণ করিয়া আবাসিকদের আনন্দ বৰ্ধন করেন।

আবাসিকগণের মননশীলতার ক্ষেত্রে এ বৎসর আমাদের দেয়াল পত্রিকা 'স্কুলিন্ড্রে' উৎকোচন করি। অধ্যাপক চক্রবর্তীর নিকট হইতে আবাসিকগণ মননশীলতার উদ্বীপক যে স্কুলিঙ্গ লাভ করিয়াছে তাহা এখনও নির্বাপিত হয় নাই।

শারদীয়াপূজার পূর্বে এ বৎসর বিশিষ্ট সাংবাদিক ডেটের ধীরেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে আমাদের হোষ্টেলে এক বিতর্কসভার অনুষ্ঠান হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল—'Under the present political set-up, the stand taken by the Kashmir Constituent Assembly is unjustifiable.'

শুধু তাহাই নহে আবাসিকদের মননশীলতার ক্ষেত্রে আরও রহিয়াছে কমনৱেনের বিচিয় ব্যবস্থা ও লাইব্রেরী। এ বৎসরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাত্রাবাসের প্রাচন আবাসিক ভারতবর্দের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডেটের রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছাত্রাবাসে শুভাগমন। বর্তমান আবাসিকগণ তাহাদের একজন প্রাচন আবাসিককে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাস্তে পাইয়া ছাত্রাবাসে তাঁহার আগমন উপলক্ষে বিপুল সংবর্ধনা জানায় এবং এক মানপূর্ণ প্রদান করে। পুরাতন আবাসিকের স্থুতিচিহ্নস্থলে তিনি ছাত্রাবাসের বর্তমান আবাসিকদের প্রদান করেন তাঁহার নিজের এক সুন্দর প্রতিকৃতি আর ছাত্রাবাস কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত হয় তাঁহারই সহিত গৃহীত একটি সমবেত আলোকচিত্র। 'আমাদের কথার' পুরোভাগে এই আলোকচিত্রটি প্রকাশিত হইল। এই প্রমাণে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আবাসিকগণ যখন এই ছবিটি উপহার দিতে রাজত্বনে তাঁহার সহিত দেখা করে তখন তিনি ছাত্রাবাসের বার্ষিক সরবর্তী পূজার জন্য একশত টাকা টাঙ্গা দেন।

রাষ্ট্রপতির আগমনের পূর্বদিন এক মনোজ পরিবেশের মধ্যে পর্যবেক্ষণের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সম্মানার্থে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছাত্রাবাসের দ্বারে স্থাপিত মর্ম ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন।

গতবৎসর আমাদের ছাত্রাবাস হইতে শ্রীমুণ্গালকান্তি করঙ্গণ আই, এস. সি. পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকার করে। এতদ্যুতীত বি. এস.-সি. পরীক্ষায় তিনজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর অনাম্র লাভ করিয়াছে।

সম্প্রতি শীতের সমাগমে অধ্যাপক চক্রবর্তী তুমুল হর্ধবনির মধ্যে হোষ্টেলে ক্রিকেট ফ্লাবের উৎকোচন করেন। তাছাড়া ভলিবল, টেনিসক্রয়ে প্রভৃতি খেলাও বিশেষ উৎসাহের সহিত চলিতেছে।

শ্রীমুণ্গালকান্তি মল্লিক—সাধারণ সম্পাদক, ইন্ডেন হোষ্টেল ছাত্রপরিষদ।

ଚାତ୍ରୀସଂଖ୍ୟା :

গার্নি কমনকমটা সেই বস্তু—ফেটা না থাকলেও চলেনা, থাকলেও চলেনা। উপরন্ত তার কর্ধার যদি দার্শনিক হন তবে তো মাঝেনদৈ হতেই তরী বানচাল হবার আশঁকা। তবু তরী পোছন গিরেছে।

କମନରୁ ସେଟେଟ୍‌ରୀର କାଜେର ସୌମାରେଥୀ ସିଦ୍ଧି ବିଶ୍ଵତ, କାର୍ଯ୍ୟତଃ ତା ଶୁଦ୍ଧ ମେରେଦେର ପାନୀଯେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାର ମଧ୍ୟେ ନୀମାବକ । ତବୁ ଏବାର ଏକଟା ନତୁମ ପ୍ରୋଜନ୍‌ମାର୍ଗ କାଜ ଆମରା କରତେ ପେରେଛି । ମେଟା ହଞ୍ଚେ ମେରେଦେର ଖାରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏ ବିଷୟେ ଅଧିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତିଶକ୍ତ ମେନଣ୍ଡପ ଓ ଇନ୍ଡନ ହିନ୍ଦୁ ହସ୍ଟେଲେର କ୍ୟାନ୍‌ଟ୍‌ମେନ୍‌ର କର୍ତ୍ତପଦେର କାହେ ଆମରା କହନ୍ତାମାନ୍ତର ।

কাজ করতে গিয়ে ছাটো বিষয়ে অভাব অনুভব করতে হয়েছে। এগুলিঃ ইউনিয়নে ছাত্রদের জন্য কোন পৃথক অর্থভাগার নেই, এবং হিতীয়তঃ ছাত্রদের স্বার্থবক্ষ করার জন্য উপযুক্ত ছাত্রপ্রতিনিধি নেই ইউনিয়নে। এর ফলে যখন নানা বিষয়ে ছাত্রদের কাছে আব্লান আসে বিশেষ ভাবে কিছু করবার বা করাবার তখন অর্থ ও সংহারিগত অভাবে পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হয়ে উর্চেন। যথের কথা, এবছর ইউনিয়নে একজন ছাত্র প্রতিনিধি গিয়েছেন। আশা করছি অচিরেই ছাত্রবিভাগের অনুবিধি গুলি দুর হবে।

বাবুণ্ডা সেন—সম্পাদিকা, গার্লস কম্পন্সুম

জুনিয়র কমন্সন :

প্রতিবহরের মত এবারেও জুনিয়ার কমন্ডমেন্ট তরফ থেকে 'শ্বিমার-পার্টি'র ব্যবহাৰ কৰা হয় এবং অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী মিলে প্রায় পঁচাশে জন এতে অংশগ্রহণ কৰেন।

এবারে একটি আস্তঃবিভাগীয় টেবিলটেনিস টুর্ণামেন্ট খেলার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিগত চালিপ্যানশিপ প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা হয়। পরিষদ থেকে এবারে এই বিভাগে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তা'ই প্রয়োজনের তলায় যথোগ্যভাবে নয়। আশা করি, এবার থেকে আরও বেশি টাকা দেবার ব্যবস্থা করা হবে।

অধ্যাপক মামুন সবৰকম উৎসাহ ও পুরামৰ্শ দানে কাজের সাহায্য করেন—এজন্য আমরা উভ কাজে
কৃতজ্ঞ।

কাজল দত্তগুপ্ত—সম্পাদক, জুনিয়র কম্বন ক্লাব

খেলাধূলা বিভাগ :

এ বছরের কর্মকর্তৃমণ্ডলী যথায়ীতি নির্বাচিত হয়ার পর পরিবেশের প্রথম অধিবেশন অধ্যাপক শ্রীনন্দিগোপাল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সাধারণ সম্পাদক এবং বিভাগীয় সম্পাদকগণ নির্বাচিত হন, ফুটবল সম্পাদক ইতিপূর্বেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছাত্রীরা নিজেরা একজন প্রতিনিধিকে নির্বাচন করেন। এই পরিবেশের দ্বিতীয় অধিবেশনে এই বছরের বাজেট গৃহীত হয়—সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রীনন্দিগোপাল চক্রবর্তী। এই বছরের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দিলাম।

হুটুবল : এই বিভাগের সম্পাদক ছিলেন শ্রীমনীগোপাল দত্ত এবং অধিনায়ক ছিলেন শ্রীকাজলকুমার দত্তগুপ্ত। নিয়মিত Practice-এ অনেক ছাত্র যোগদান করেন এবং যথারীতি 'ট্রায়াল মার্ট' খেলার পর কলেজ টীম গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্কলেজ নীতে আমরা আমাদের গ্রুপে বিশ্বাস্থান অধিকার করি। হেরম মেডেল খেলায় বিশীয় রাউটেন্ড আন্তর্বে কলেজের নিকট ১—০ গোলে পরাজিত হই। ১৫ বৎসর বাবে পুরুষ এবং হার্ডিঙ্গ বার্থার্ডে শীল্ডের ফাইনালে উত্তোলিত। নিটকে ৪—০, বিদ্যাসাগরকে ২—০ এবং বঙ্গবাসীকে ২—০ গোলে পরাজিত করে ফিনালে শাশ্বান্ত মেডিকেল কলেজের নিকট ৩—০ গোলে পরাজিত

হই। সেদিন ৬ জন কলেজ চীমের নিয়মিত খোলোয়াড় অনুপস্থিত ছিলেন। এবার নতুন করে আন্তঃবার্ষিক সৌধ খেলার প্রবর্তন করা হয়। চতুর্বর্ষ সর্বাধিক পয়েন্ট পেয়ে লীগবিজয়ী হন আর বি. এম. সেন কাপে চতুর্বর্ষ মাতকোত্তরের নিকট প্রাপ্তি প্রাপ্তি হন। এবারকার অদৰ্শনী ফুটবল খেলা ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে হয়। খেলাটি খুব আনন্দজনক হয়। খেলাটি শেষপর্যন্ত আমাসিভাবে শেষ হয়। মোটের উপর এ বছরকার ফুটবল খেলার গতবারের চেয়ে উন্নতি লক্ষিত হয়েছিল।

ক্রিকেট: এই বিভাগের সম্পাদক শ্রীবীরুন্ন ভট্টাচার্য এবং অধিনায়ক ছিলেন শ্রীধীরেন নিয়োগী। এবার আমরা কলিকাতার যে কয়েকটি বড় বড় ক্লাবের সহিত আমাদের মাঝে খেলেছিলাম তার মধ্যে মোহনবাগান, স্পোর্টস ইন্ডিয়ান, ভবানীপুর ক্লাব উল্লেখযোগ্য। স্পোর্টস ইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমরা ৬ উইকেটে জয়লাভ করি। মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে বাংলার প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় পি. সেন, মস্ট সেন, জোতিষ মিত্র খেলেছিলেন। খদখপুর কলেজের সংগে খেলায় আমরা প্রাপ্তি হই। এবার আমাদের ক্রিকেটদল শাস্তিনিকতনে গিয়েছিল। শাস্তিনিকতনের সহিত খেলাতে অরুণ রায় ৩৮ রাণ করে এবং বিমল বর্মণ ১৮ রাণে তিনটি উইকেট লাভ করে বিশেষ কৃতিত্ব অদৰ্শন করেন। এ বছর ব্যাটিং-এ শ্রীপদ্মীপ দাস এবং বোর্লিং-এ নারায়ণ গান্দুলী উৎকর্ষের পরিচয় দেন।

ক্রিকেট: এবারকার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রী প্রবীর গুহষ্টাকুরতা। ইকিব মরশুম এখনও আরও হয়নি তবে আশা করি শ্রী প্রবীর গুহষ্টাকুরতার পরিচালনায় এবারকার হকিখেলো ভাস্তবাবে সম্পন্ন হবে।

মৌচচলনা: এই বিভাগের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীমনীৰী চাটোর্জি আর অধিনায়ক নির্ধাচিত করবার কোন দরকারই পড়েনি কারণ এবছরের Resolution অনুযায়ী ১২ জন সভ্য না হওয়ায় এই বিভাগটি এই বছরের মত উঠে গেছে। ভবিষ্যতে আরও অধিক উৎসাহ না পেলে ছাত্রগণ Rowing করবার এইসপুর্ণ স্থানে চিরকালের জন্য হারাবেন।

টেনিস: এই বিভাগের সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বিদ্যাস। এবার এই বিভাগের সভ্য আছেন মোট ৮ জন। আন্তঃকলেজ টেনিস প্রতিযোগিতাতে যেমকল ট্রফি আগে আমাদের কলেজ লাভ করত আজ কয়েকবছর যাবৎ তাদের কোনটি আমাদের কলেজে আসে নি। ছাত্রদের নিকট থেকে আবার অধিক উৎসাহ না দেখা গেলে Rowing Section-এর মত এটাও হ্যাতঃ অটোর উঠে যাবে।

স্মল্ল এরিয়া পেম্বস: এই বিভাগের সম্পাদক শ্রীশক্র দেন। আমাদের আন্তঃকলেজ Volley Ball প্রতিযোগিতা শীঘ্রই আরও হয়ে আসবে। Badminton খেলা নিয়মিত হচ্ছে কিন্তু কলেজে কোন ধরণে জয়ের না থাকার দরকার সত্তাই অনুবিধা হচ্ছে।

ব্যায়ামাগার: মোটামুটি ১৫ জন ছাত্র নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করেন।

চাত্রীবিভাগ: এই বিভাগের সম্পাদিকা মলি ঘোষের পরিচালনায় ছাত্রাচারীরা মাঝে মাঝে বাড়মিটন ও টেনিসক্ষেত্র খেলে থাকেন।

এবার বাস্তিক প্রতিযোগিতার দিন ২৭ জানুয়ারী নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার বিস্তৃত বিবরণ পরে সংক্ষেপে শেষ করব।

আমাদের অভ্যাস ও দার্শী: প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মূল্যবৃক্ষির জন্য আমাদের খরচে কুলমো হৃংমাত্রা হয়ে উঠেছে। আমাদের সরকারী বরাদ ১০০০ টাকাকে ২০০০ করার জন্য আমরা বছরের পর বছর দার্শী করে আসছি কিন্তু Red tape-এর কল্যাণে তা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। পরিশেষে আমাদের অব্যক্ত, পরিদৰ্শক শ্রীমতি চাটোর্জি, বিভাগীয় সভাপতি, সম্পাদক ও অধিনায়কদের ধ্যাবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি।

প্রতিগদে তাদের অকৃত সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না।

বাংলা পার্টিগোষ্ঠী :

গতবারের পত্রিকায় পার্টিগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। গত-সংখ্যায় সংবাদপ্রেরণের অব্যবহিত পরে বাংলা-আনাদ'-বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ ও অধ্যাপকদের নিয়ে একটা 'গ্রুপ ফোটো' তোলানো হয়েছে এবং ফোটোখানি 'এন্লার্জ' করে বাংলা-গোষ্ঠীর জন্য নির্মিত বরাটিতে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে।

ধ্যাতনামা কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার-এর মৃত্যু উপলক্ষে বিশেষভাবে বাংলা-পার্টিগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে একটি শোকসভা আহ্বান করা হয়। গত ১১ আগস্ট অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটে কলেজের ১নং ঘরে এই বিষয়ে বাংলা-গোষ্ঠীর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় অধ্যাপকগণ এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সকলে হ'মিনিট নীরবে মণ্ডায়মান হয়ে মৃত কবির প্রতি শুক্রাঞ্চলের পর অধ্যাপক শ্রীদেবীপুর ভট্টাচার্য কবি মোহিতলালের উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সভায় সম্পাদক নির্মলকুমার চট্টাপাধ্যায় 'কবি মোহিতলাল মজুমদার' শীর্ষক স্বরচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর সভায় বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা মোহিতলালের উপরে প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন এবং মোহিতলালের কবিতা আবৃত্তি করেন।

গত ১১ই আগস্ট অপরাহ্ন সাড়ে তিনিটের সময়ে কলেজের ১নং ঘরে বাংলা-পার্টিগোষ্ঠীর চতুর্থ অধিবেশন হিসাবে 'রবীন্দ্র-স্মরণ-বিদ্ব' উদ্বাপিত হয়েছিল। কলেজের অধ্যাক্ষ শ্রীয়তীশচন্দ্র মেননগুপ্ত ও বিভাগীয় অধ্যাপকবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা এই উৎসবে পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ ও স্বরচিত্র কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাফল্যশুভ হয়েছিল। সভাপতি অধ্যক্ষ-মহোদয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্মৃতিস্থিত ও সারগত বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

এটই বাংলা-পার্টিগোষ্ঠীর বর্তমান বছরের শেষ অধিবেশন। এবার আমাদের বিদ্যায় নেবার পালা। আশা করি, নবাগত তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা আগামী বৎসরে বাংলা-পার্টিগোষ্ঠীর প্রভূত উন্নতি ও শ্রেণী সাধিত হ'বে।

ইতিহাস সেমিনার :

প্রেসিডেন্সি কলেজ ইতিহাস সেমিনার পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ও আওয়ার্ড-গ্র্যাজুয়েট এই দুই বিভাগে বিভক্ত। তবে প্রথমোভ বিভাগটির কাজ কেবল এক আলমারী বই নিজেদের মধ্যে বিলি ব্যবস্থা করাতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেমিনারের ঐতিহাসিক মায়িস বর্তেছে বিভাগ বিভাগটির ওপর। ইতিহাসসেমিনার বলতে তাই সাধারণতঃ বিশ্ব বিভাগটিই বোঝাত। চলতি বৎসরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ এই দুই বিভাগের মধ্যে ঘন্টুর সম্ভব একজীবন কোরে সেমিনার পুনর্গঠন করার প্রচেষ্টা। অধ্যাপক শ্রীহশোভনচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে এই দুই বিভাগের এক মুক্ত অধিবেশনে পুনর্গঠন সংক্রান্ত নানা আসোচিয়ার পর ব্যাপারটি সাময়িকভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় সভাপতি ও চারজন সদস্যের এক সমিতির হাতে। বর্তমান বিবরণী লেখার সময় এই সমিতি এক চূড়ান্ত পরিকল্পনা কাজে হাত দিয়েছে। সেমিনারের প্রবর্তী অধিবেশনে এই পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হবে।

কলেজ-পত্রিকার পূর্ববর্তীসংখ্যাপ্রকাশ এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে এছাড়াও সেমিনারের তিনিটি অধিবেশন বসেছিল। এই তিনিদিন নিয়ন্ত্রিত প্রবন্ধক্রম পর্যন্ত হয়েছিল।

১। History—A Vital Study of the Day—বিনয় চৌধুরী।

২। Role of Religion in History—নীতিশ মেননগুপ্ত।

৩। Nature and Development of the Athenian Democracy—হৃষীর সরকার।

তিনিদিনের অধিবেশনেই সেমিনার সভা-সভাগণ এবং ইতিহাসের অধ্যাপকবৃন্দ অনেকে উপস্থিত ছিলেন এবং

পার্টান্সিক আলোচনায় যোগ দেন। বিশেষ করে প্রথম ও ইতীয় দিনের আলোচনার তীব্রতা অনেকের মনেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এ ছাড়া এক বিশেষ অধিবেশনে কেন্টাকী বিবিধালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ টমাস ক্লার্ক যুক্তরাজ্যের বিদ্যবিদ্যালয়সমূহে ইতিহাস পার্ট ও গবেষণা সম্বন্ধে এক ভাবধ দেন।

সেমিনার লাইভেরীতে বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে একশোরও বেশ কিছু বেশী। বংশীয় ইতিহাস পরিদ্বের ত্রৈমাসিক মুখ্যপত্র 'ইতিহাস' এবং 'History' নামক একটি ইংরিজিপত্রিক নিয়মিত আসে। তবে গত বৎসরখাবের মধ্যে বিভিন্নটির একটি সংখ্যাও আমাদের হাতে পোছয়নি। অনাস' ছাত্রদের অবশ্য প্রয়োজনীয় আরো কয়েকখনি বই সেমিনারসাইভেরীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে কলেজলাইভেরী থেকে। তবে ইতিহাসের ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা এবং সেমিনারের পরিমিত বইর সংখ্যার কথা স্মরণ করে কিছুটা উল্লিখ না হয়ে থাকা যায় না। সভ্যদের চাহার প্রকার গৃহীত হোলে সেমিনার প্রয়োজন অনুযায়ী নানান বই কিম্বা এই সমস্তার কিছুটা সমাধান করতে পারবে বলে মনে হয়।

সেমিনারের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অনেক বড় বড় পরিকল্পনা আমাদের ছিল—বেশীর ভাবে পরিষ্কৃত করা যায়নি। যে সব ছাত্রবন্ধু ও পুজুরীয় অধ্যাপক বিগত বৎসরের কর্মচক্রে দিলগুলিতে তাদের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন আনুষ্ঠানিক ধৰ্মবাদে তাদের সাহায্যের পরিমাপ হয় না। কতদুর মাফল্য আমরা অর্জন করেছি সে বিচার করবেন অঙ্গেরা। তবে আমাদের দিক থেকে আবাস দিতে পারি যে, চেষ্টার কোন জটি হয়নি।

নীতিশ সেনগুপ্ত—সম্পাদক

অর্থনীতি দপ্তর :

সেমিনার অংশিকভাবে লাইভেরী, আবার কল্টনের 'কলোকিয়ম'। লাইভেরীর কাজে যথাযীতি বই দেওয়া-নেওয়া চলেছে, তৃতীয় আবার চতুর্থবর্ষের সম্মিলিত সহযোগণে। আবার অধিবেশনও হয়েছে গোটা কয়েক। প্রথম মুক্ত হয়, মুখ্যমন্ত্রীর চক্রবর্তীর রচনা Theory of Economic Planning নিয়ে। ভারতীয় পরিবেশে প্লানিং-এর বাস্তব জগৎ ও সমস্যা নিয়ে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীবত্তোষ দন্ত তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বিভীয় রচনা তুষারকান্তি থেকের Small Industries in India—A Retrospect অনেক নতুন কথা শোনায়। তৃতীয় বৈঠক বদে ব্যতিকুমারী সেনগুপ্তের রচনা 'Community Development Project in India : Its Pros and Cons' নিয়ে। আলোচনা শেষে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীবীরেণ ভট্টাচার্য Community Project-এর অর্থনীতিগত বিশ্লেষণ করেন। বাস্তিগতভাবে রচয়িতাদের আমি ধন্তবাদ জানাই। তবে, প্রেরণার উৎস হিসাবে, অমুরোধ ও উপরোধও করতে হয়েছে। আমাদের সেমিনারের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়কে ধন্তবাদ জানাবার ধৃষ্টতা থেকে বিরত রাখিলাম।

এবাবে সেমিনারের মধ্যেই একটা ছোট পার্টগোষ্ঠী কাজ করেছে। প্রথম প্রথম সেমিনার-অধিবেশন অনেকদিন পর পর হত বলে, কয়েকজন ছাত্র মিলে একটা 'TRIO'-গোষ্ঠী করেন। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা হত বলে এর নাম হয় অয়ী-গোষ্ঠী। এই পার্ট-গোষ্ঠীতে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিশেষ ও আলোচনা হয়েছে। যেমন—(১) 'The Five Year Plan is a feat of economic wizardry'. (২) Political democracy without economic equality cannot thrive in modern times. (৩) The American President and the British Prime Minister ইত্যাদি। এই 'ঘরোয়া' অধিবেশন গুলোতে সভাপতিস্থ ও সহযোগিতা করেছে ছাত্রদের অনেকেই। বাদল চৌধুরী, হুনীল বিদ্যাস, জান লাইড়ি, তুষার ঘোষ, অরূপ দন্ত, মুনীল মিত্র, কল্লোল দাশগুপ্ত, হুনীতি বোস ও মানস দাশগুপ্ত এদেরই মধ্যে কয়েকজন। অয়ী-গোষ্ঠীকে ধন্তবাদ জানাই।

আর্থত্বকুমার সেনগুপ্ত—অর্থনীতি-সেমিনার-সম্পাদক

রাজনীতি সেমিনার :

যে কোন সেমিনারের প্রথম ও অধিন উদ্দেশ্য হ'ল বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার স্থায়োগিতা। সেমিন দিয়ে রাজনীতি সেমিনার সাফল্যালভ করেছে বলে মনে করি।

যে হ'টি প্রবন্ধের উপর আলোচনা হয় সে হ'টি হ'ল ত্রৈজয়স্ত রায়ের “The Role of Political Parties in the Working Constitutions of England, the U. S. A. and India”, এবং শ্রীবাংল চৌধুরীর “World Peace and the U. N. O.” প্রথম অনুষ্ঠানের আলোচনায় অনেকে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু শেষেন্ত প্রবন্ধটির আলোচনা অনেক বেশী চিন্তাকর্তৃক হয়েছিল।

সেমিনারের বই আদান-প্রদানের কাজে কোন ব্যাপাত ঘটে নি। এক্ষেত্রে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদেরও স্ববিধানের ব্যবস্থা আমরা করেছি। কয়েকটি প্রয়োজনীয় বই তাঁদের জন্মে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

বর্তমান সেমিনারের কার্যকালের মধ্যে আরও হ'টি অধিবেশনের অনুষ্ঠান সম্বব হবে বলে মনে হয়। একটির আলোচ্য বিষয় হ'ল Democracy and the Individual”, এবং আর একটির হ'ল “Federalism in India.” প্রথম প্রবন্ধটি পাঁঠ করবেন শ্রীমানস দাশগুপ্ত।

পরিষেবে সকল সভ্যের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও বিভাগীয় অধ্যাপকদের উপর্যুক্ত আমাদের কর্মপর্হা নির্ধারিত করেছে। এইজন্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বর্ণবার দাশ—সম্পাদক

দর্শন পরিষয় :

বৎসরের উত্তরাধি' পরিষদের কার্যনির্বাহে যে বিচিত্র পরিস্থিতির উন্তব হয়েছে কার্যবিবরণী হিসেবে তা নিবেদনযোগ্য কিনা এ নিয়ে সংশয় অন্তর্ভুক্ত করেছি। পরিসংখ্যানের উপর ধাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ তাঁদের সামনে আমাদের নিক্ষিয়তার হেতু ও প্রকৃতি বিশেষণ করতে গিয়ে অগ্রিমত হতে হবে, কেননা এ ধরণের প্রয়াসে তাঁরা শুধু কোনুক অন্তর্ভুক্ত করবেন। তবু কয়েকটি কথা না বললেই নয়।

‘অঙ্গেরবাদ’ বিষয়ে শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘস্থগিত আলোচনা এবার অবশেষে আরম্ভ হয়ে বিবিধ কারণে উগ্রত্বমণিক পর্যায়েই পরিত্যক্ত হয়েছে—পরবর্তী অধিবেশনে ‘বাস্তববাদের অন্যনির্ভর ভিত্তি’ বিচার করবার প্রস্তাবও নির্বাচিত প্রবন্ধকার শ্রীপ্রফুল চট্টোপাধ্যায় পূর্বাঙ্কে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অথচ স্বত্ত্বপ্রস্তুত হয়ে কোন প্রবন্ধ বা আলোচনার ভাব প্রাপ্ত করতে কেউ ইচ্ছুক নন।

পরিষাগবিচারে এতে পরিষদের কার্যবালীর অপকর্তৃত সূচিত হয়ই, উপরস্ত আগ্রহভাবের অপবাদও সভায়ন পুরোপুরি অবৈকার করতে পারেন না। প্রধান দর্শনাধ্যাপক মহাশয় এবার পরিষদ-গ্রহণারের জন্য সংযতে সমস্ত গ্রহ নির্বাচন করে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে নিতান্ত কয়েকখন পাঁঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কিছুতে কেউ আবৃষ্ট হলেন না, এর ইঙ্গিতও অশুভ।

তথাপি পরিষদের অচ্ছতম সভা হয়ে যা অনুভব করেছি, এ প্রসঙ্গে তাঁর অনুরোধে কর্তব্যান্বিষ্টি ঘটবে। তত্ত্বাত্ত্বিক প্রাথমিক সাধনা অবিচারিত নিম্নান্ত প্রত্যাহার করবার। বহিরঙ্গবিচারে তাঁর মৌল নিক্ষয় হলেও সমানধর্মী উপলব্ধি করেন তাঁর প্রষ্টুত্বপ। জিজ্ঞাসুর নীরবতা তাঁর পক্ষে শুধু সহনীয় নয়, প্রত্যাশিতও। তা ছাড়া পরিষদের সংযোগে বিশেষ আকর্ষণ যে নীরবন্ধু শুভিবিচার, তা যদি গাত্রী অভিজ্ঞ করে বিদ্যায়তনের নিয়মিত অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রসারিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে নির্বিশেষ পরিষৎ-সম্মেলনের প্রতি বিশেষ অন্তর্বাগের স্মানতাপ্রাপ্তি দ্রব্যোধ্য নয়।

উপসংহারে পরবর্তী পরিষৎ-সম্পাদক এবং বর্তমান ও ভারী সভায়ন্দ্রের আভ্যন্তর প্রার্থনা করি। সতীর্থবর্গের আন্তরিক শ্রীতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা আমাদের সকলকে নিত্য শেয়ংপথে উন্নত করক।

শ্রীগুরুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়—সম্পাদক

গাণিত সেমিনার :

গত কয়েকবছর ধরে গণিতসেমিনার ক্রমশঃ উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই উন্নতির মূলে আছে আমাদের ছাত্রবন্ধনের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সহায়তা।

গণিতসেমিনার আমাদের হাতে আসার পর কাজ যা হয়েছে তাতে গর্বিত নই, তবে ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখলে নিয়াশ হ্বারও কিছু নেই।

আমাদের প্রথম অধিবেশন—চিরপরিচিত প্রধান অধ্যাপক শ্রীগুরুদাম ভড় মহাশয়ের বিদ্যায়সম্ভাব্য ছিল খুব মর্মপূর্ণ। অধ্যক্ষ জ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে ফিজিক্স লেকচারথিয়েটের এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় অধ্যক্ষ, ডেস্ট্র সনৎকুমার বহু ও বিদায়ী অধ্যাপক শ্রীগুরুদাম ভড় ভাবণ দেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রীআশিসকুমার সাহাল মানবগ্র পাঠ করেন ও সভাশেষে বিদায়ী অধ্যাপককে রবিস্ননাথের করেকথানি পুস্তক অঙ্কাঙ্কলিম্বনপ দেওয়া হয়। অধ্যাপকমণ্ডলী, বিদায়ী ও নবাগত সেমিনারের সভ্যদের ও অস্ত্রাঞ্চলিক ছাত্রদের একত্র সমাবেশে আন্তরিকতাময় এমন একটি পরিবেশের স্থষ্টি হয়, যা উপস্থিত সকলেরই মনে গভীর রেখাপাত্ত করে। অধ্যাপক ভড়ের অভাব যে অপূরণীয় তা আমরা আজ অনুভব করছি অন্তরে অন্তরে।

পূজ্যাবকাশের আগে অধ্যাপক শ্রীকামিলীকুমার দে জ্যোতির্বিজ্ঞানের “Nebulae and the Vastness of the Universe” সম্বন্ধে বাংলায় এক মুন্দুর বক্তৃতা দেন। শ্রাহিদের সাহায্যে বিষয়টিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়।

সেমিনার লাইব্রেরীতে পুস্তকসংখ্যা কিছু বেড়েছে, তাছাড়া অধ্যাপক শ্রীগুরুদাম ভড় তাঁর পুস্তকগুলি আমাদের ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞাতাপাশে আবক্ষ করেছেন।

কিছুদিন হ'ল ডেস্ট্র নন্দলাল ঘোষ এসেছেন আমাদের বিভাগে স্বরেন্দ্রনাথকলেজ থেকে। আমরা তাঁকে সাদৃশ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার নির্দেশে ডেস্ট্র দেবেন্দ্রনাথ মিত্র খঙ্গাপুর ইঙ্গিয়ান ইন্সিটিউট অব টেকনোলজিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। যদিও আমরা তাঁর অভাব বেশ উপলক্ষ্য করছি তবুও তাঁর উন্নতির জন্যে আমরা আনন্দিত।

ছাত্রাবাসের তরফ হ'তে সহযোগিতা ও সাহচর্য এবং শ্রকাপ্ত অধ্যাপকমণ্ডলীর অনুপ্রেৰণা আমাদের স্মরণীয়।

শ্রীহেমত্রকুমার বহু—সম্পাদক

শারীরবৃক্ষ পরিষদ :

বয়েদের দিক দিয়ে দেখলে আমাদের পরিষদ এখনো শিশু—মাত্র তিন বৎসর আগে এর স্থষ্টি হয়েছে। কিন্তু যেরকম দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে এর কর্মচাল্য, তাতে পরিষদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করাটা ছরাশা হবেন।

গত ডিসেম্বরমাস (১৯১১) থেকে আজ পর্যন্ত পরিষদের উচ্চোগ্রে নিম্নলিখিত বক্তৃতা এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়েছে সাংগৃহিক আলোচনা-সভাতে।

Symposium on “Mammary gland”

অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীমুকুল রায়, শ্রীরঞ্জিত দাশ, শ্রীদেবজ্যোতি দাস, শ্রীবিধান রঞ্জন দাশগুপ্ত

২। "Yeast as food." বক্তা—ডাঃ ডি. কে. রায়

৩। "Muscle." বক্তা—ডাঃ এন. কে. সরকার

৪। Symposium on "Adrenal Cortex"

অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীশঙ্কর টান দে, শ্রীমুখময় লাহিড়ী, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীমুকুল বিকাশ দাশ

৫। "What a diabetic should eat." বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসচিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬। Symposium on "Life"

অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবজ্যোতি দাস এবং শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী

৭। "My experience about American Universities"

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীসচিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। "Prolongation of Life." বক্তা—শ্রীপুরক কুমার ঘোষ

৯। Symposium on "Our excursion." অংশগ্রহণ করেছিলেন—শ্রীআমিয় দত্ত, শ্রীরবীজ্ঞান সেন

শ্রীরাজৰ্ম মজুমদার, শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, শ্রীকমলশী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশঙ্কর টান দে

১০। "Human brain—its supremacy." বক্তা—ডাঃ অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

১১। "Isotopes in the study of Physiology." বক্তা—ডাঃ ছলাল পদ সাধু

চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে হয়েছে U. S. I. S. এবং B. I. S.-এর সহযোগিতায়।

১। B. I. S.-এর সহযোগিতায়—Blood transfusion ; Conquest of a germ ; Wonder Jet ; Achievements in the air.

২। U. S. I. S.-এর সহযোগিতায়—In the beginning ; Green mountainland.

৩। B. I. S.-এর সহযোগিতায়—Development of rabbit ; History of writing.

চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রাত্মীদের বিদ্যায় সমর্থনা জানান হয় পরিষদের একটি সভায়। অন্ত একটি সভায় ষষ্ঠিবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রাত্মীদের বিদ্যায় সমর্থনা জানান হয়। নতুন তৃতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রাত্মীদের 'শ্বাগত' জানান হয় একটি সভায়। এই তিনটি সভাতেই টি পার্টি এবং প্রমোদান্বিতানের ব্যবস্থা হয়েছিল।

একটি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে পরিষদের উদ্যোগে। বিতর্কের বিষয় ছিল "In the opinion of the house, vegetarian diet is nutritionally preferable to non-vegetarian diet." প্রস্তাবের পক্ষে বন্দেছিলেন ডাঃ অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীমুখময় লাহিড়ী, শ্রীদ্ব্যৌশ দাশগুপ্ত, এবং শ্রীআমিত রঞ্জন গুহারায় ; এবং প্রস্তাবটির বিপক্ষে বন্দেছিলেন শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্র সিং, শ্রীরঞ্জিত দাশ এবং শ্রীবিপ্রদাম দাশ। অচুর উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয় বিতর্ক-সভাটি।

নবর্ষ এবং বিজ্ঞা-সম্বিলনী উপলক্ষে দুটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয় পরিষদের উদ্যোগে।

এই তো গেল বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক আলোচনার দিক। পরিষদের কার্যবলীর আরও অনেক দিক আছে। পরিষদের একটি মেয়াল-পত্রিকা আছে, তার নাম "প্রাচীরিক"। পরিষদের সদস্যদের নেথে গঞ্জ, প্রবন্ধ, কবিতা এবং স্কেচ এতে বার হয়।

গত আগষ্ট মাসে পরিষদের সাধারণ নির্ধাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে যে কার্যনির্বাহকসমিতি গঠিত হয়েছে, আগামী আগষ্ট মাস পর্যন্ত এই সমিতি পরিষদের সমস্ত কার্য পরিচালনা করিবেন। কার্যনির্বাহক সমিতিতে আছেনঃ—অধ্যাপক শ্রীসচিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি), শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যয় (কো-ব্যাধ্যক্ষ), শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী (সম্পাদক), শ্রীবেদ্যবন্ধু দে (সহ-সম্পাদক),

ત્રીદ્યુતીશ દાશણ્ણુ (યષ્ટ બાર્ષિક શ્રેણીના પ્રતિનિધિ), શ્રીરામનાથ સેન (પંક્તમ બાર્ષિક શ્રેણીના પ્રતિનિધિ), શ્રીનાથ ટાંડ દે (ચતુર્થ બર્ષ સમાન શ્રેણીના પ્રતિનિધિ) એંબ શ્રીમિય દંત (તૃતીય બર્ષ સમાન શ્રેણીના પ્રતિનિધિ) ।

એવારે આસા યાક ભ્રમણે કથાર । પ્રતિ બર્ષની પૂર્જોએ છુટીને આમાદેર એકટ શિક્ષા-અયા (educational excursion) હય । એવારકાર ભ્રમણે આમાદેર પાણી અનેક દૂરેર । અજસ્તા-ઇલોઝ-પુણ-બસે-ઝાગ-દિલ્લી હેઠે કલિકાતા—એહી પ્રાય સાડે તિન હાજાર માટીલ અમણ આમરા સાંજ કરેછે પનેર દીને । પુણાદેખે એસેછી National Chemical Laboratory એંબ Poona Medical College, બદેશે દેખેછી Haffkins Institute એંબ Teddington Chemical Factory.

એવારકાર બાર્ષિક સખ્લિલારી આસન્ન । આગામી ૨૦૩૬ એંબ ૨૧શે ડિસેમ્બર હવે એહી અનુષ્ઠાન* । તાંત્ર આગોજને વ્યસ્ત સકલે । એહી સખ્લિલારીને સભાપતિસ્ત કરેલેન પાટ્ટના મેડિકેલ કલેજેર અધ્યક્ષ ડાં વાયુદેવ નારાન એંબ પ્રધાન અભિધિ હેઠેન કલિકાતા બિદ્વિશ્વાલયેન ઉપચાર્ષ શ્રીસ્તુનાથ બન્દ્યોપાણ્યાર । એહી અનુષ્ઠાનની મૂલી કરે તોનાર જણ સકળ સદ્ગુરેન સક્રિય સહયોગિતા પાછે પરિયદ એંબ પરિયદેર પ્રત્યેકટ કાજે એહી સહયોગિતાર ભાવ બજાય આછે બલેઇ પરિયદેર ઉત્ત્રતિ હચ્છે એટ દ્રસ્ત, કર્મેર પરિધિ હચ્છે સ્વીકરતર આવ સબણેયે કલેજ-મ્યાગાજિને પરિયદેર રિપોર્ટ હચ્છે દીર્ઘતર ।

પંક્તમ ચક્રવર્તી—સંપાદક

[* એહી બિવરણી ગત ડિસેમ્બર માસે પ્રાપ્ત હય । સ. પ્રે. ક. પ. ।]

આય બયય :

૧૯૫૧-૫૨ સાલેર કલેજ ઇન્નિયનેર વાજેટ ૧૧૨ જાન્યારી પરિયદેર સભાય ઉપસ્થિત કરા હય । એહી સભાય સભાપતિસ્ત કરેલ ત્રેકાલીન સિનિયરટ્રોઝારાર અધ્યાપક શ્રીઓનાસ ડડ્ચ । વિસ્તૃત આલોચનાર ગર વાજેટટ પરિયદ કર્તૃ ક મર્યાદાત્ત્વિક્રમે ગૃહીત હય ।

૧૯૫૧-૫૨ સાલેર ઇન્નિયન વાજેટટ ર સંક્ષિપ્ત બિવરણ નિમે પ્રદાન હિન્દુ :—

આય :

કલેજેર પ્રત્યેક છાઓછાત્રીની બાર્ષિક ૧૧ ટાકા સેસન્ કિ બાબદ દિયા થાકેલ । ઇહાર મધ્યે ૪૧૦ ટાકા એથસેટિક ફણ-એર જણ, ૩૦ ટાકા કલેજપત્રિકાર જણ એંબ બાકિ ૩૦ ટાકા ઇન્નિયનેર જણ નિરીષ્ટ થાકે । ઇહા હિંતે એવારકાર મોટ આય ૪૧૧૨ (ચારિ હાજાર એકશત બાર ટાકા) ।

બયય :

કલેજેર બિભિન્ન બિભાગણિતે નિયલિથિતભાવે અર્વાસન કરા હિયાછે :

નાટ્ય પરિયદ	૧૦૦
બિરામ-પીટિકા	૧૫૦
સમાજ સેવા	૩૫૦
રબીન્ન પરિયદ	૧૫૦
વિતર્ક બિભાગ	૩૫૦
અકાશની બિભાગ	૧૨
(પ્રાચીર પત્રેર જણ)	
સાધારણ સંપાદક	૧,૦૦૦

મોટ ૪૧૧૨ (ચારિ હાજાર એકશત બાર ટાકા માત્ર)

আমাদের কথা

সাধারণ সম্পাদকের ফণ হইতে সাধারণতাবে নিম্নলিখিত ব্যয় ধার্য হইয়াছিল :—

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান	১০০
শান্তি সপ্তাহ	১০০
নানাবিধি	৩০০
(ছবি তোলা, মন্তব্য ইত্যাদি)	
মোট	১,০০০

প্রতিষ্ঠাদিবস ও শান্তিদিবসের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

প্রতিষ্ঠাদিবস :

আয়	ব্যয়
রবীন্দ্র পরিষদ হইতে — ১০	ছায়াছবি প্রদর্শন — ২৫০
বিতর্ক বিভাগ „ — ১০	বিচ্ছান্নাস্থান — ৩৫০
সাধারণ সম্পাদক — ৫০	পতাকা উত্তোলন
ছায়াছবি প্রদর্শন উপলক্ষে টিকিট বিক্রয় „ — ১০০	উপলক্ষে — ৩০
মোট — ৭৫০	বিতর্ক অনুষ্ঠান — ৫০
	ছাপাখানা — ৮০
	নানাবিধি — ৩০
	মোট — ৭৫০

শান্তি সপ্তাহ :—

আয়	ব্যয়
স্বাজ সেবা হইতে — ১০	বিতর্ক অনুষ্ঠান — ৫০
নাট্যপরিষদ „ — ৫০	(Symposium)
রবীন্দ্র „ „ — ৫০	ছায়াছবি প্রদর্শন — ৮০
বিতর্ক বিভাগ „ — ৫০	বিচ্ছান্নাস্থান — ২০০
সাধারণ সম্পাদক — ১৫০	প্রদর্শনী — ২০
মোট — ৩৫০	মোট — ৩৫০

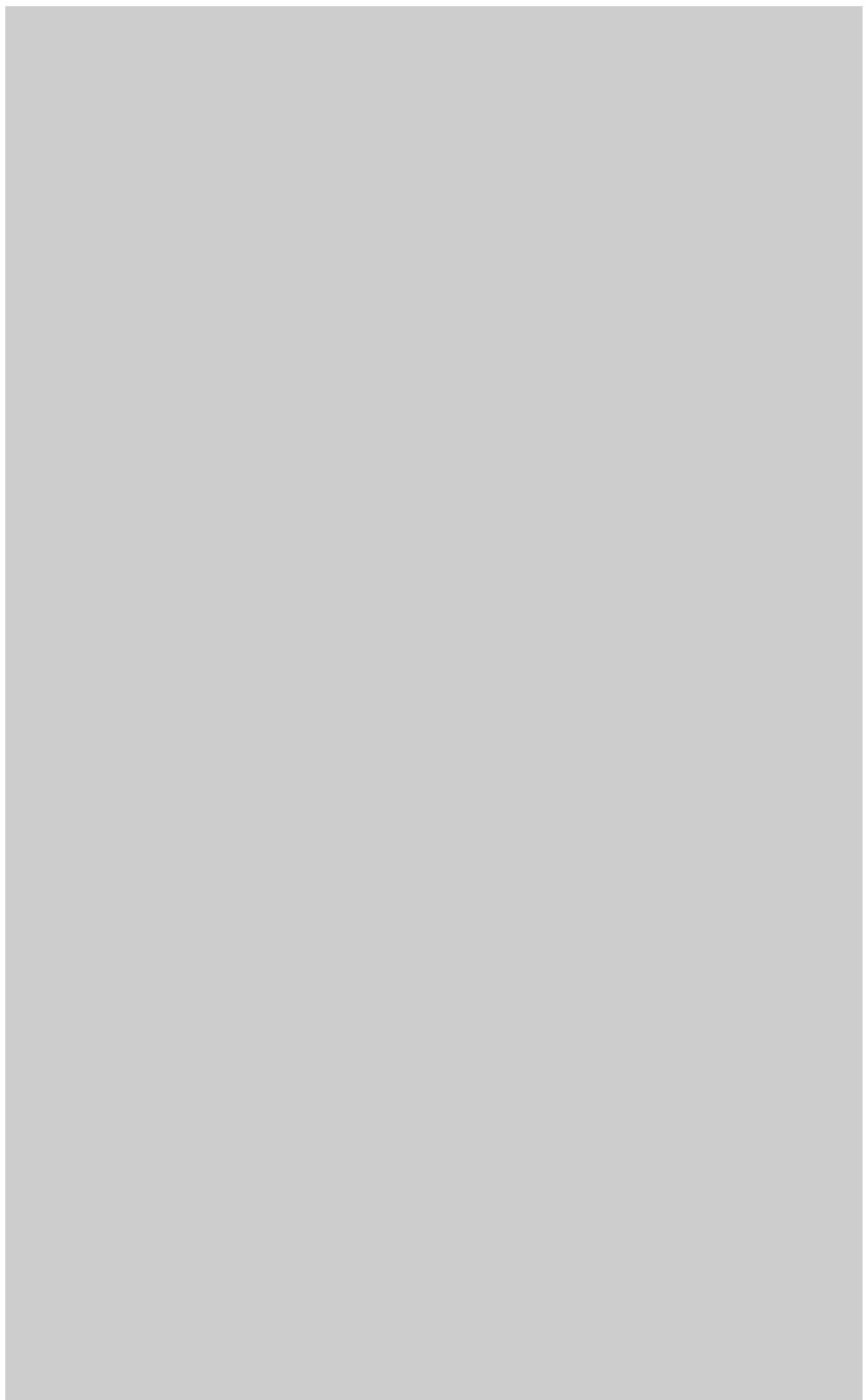
পরিশেষে আমি কাউন্সিলের সিনিয়রট্রেজারার শ্রীসন্তোষ রায়, কোষাধ্যক্ষ এবং অচান্ত বিভাগের সম্পাদকগণকে আন্তরিক মহামোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

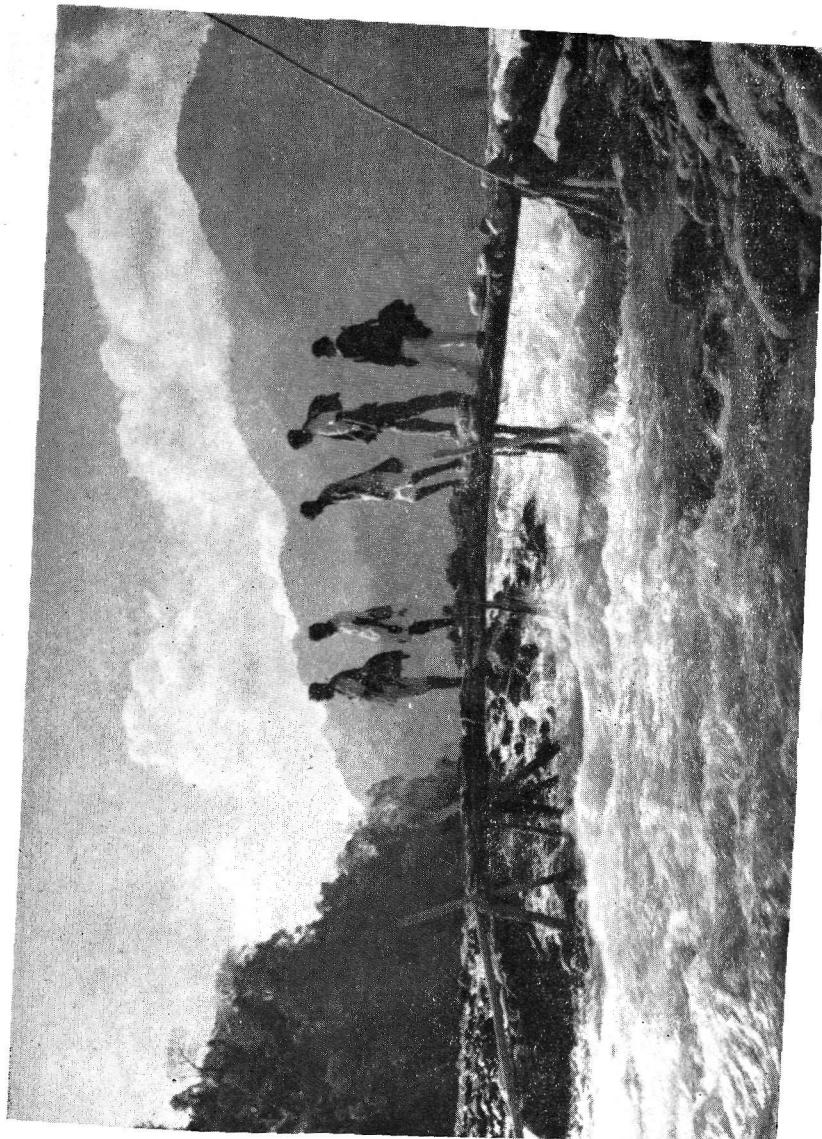
শ্রীসন্তোষ রায়, কোষাধ্যক্ষ

প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্রপরিষদ

শুদ্ধিপত্র

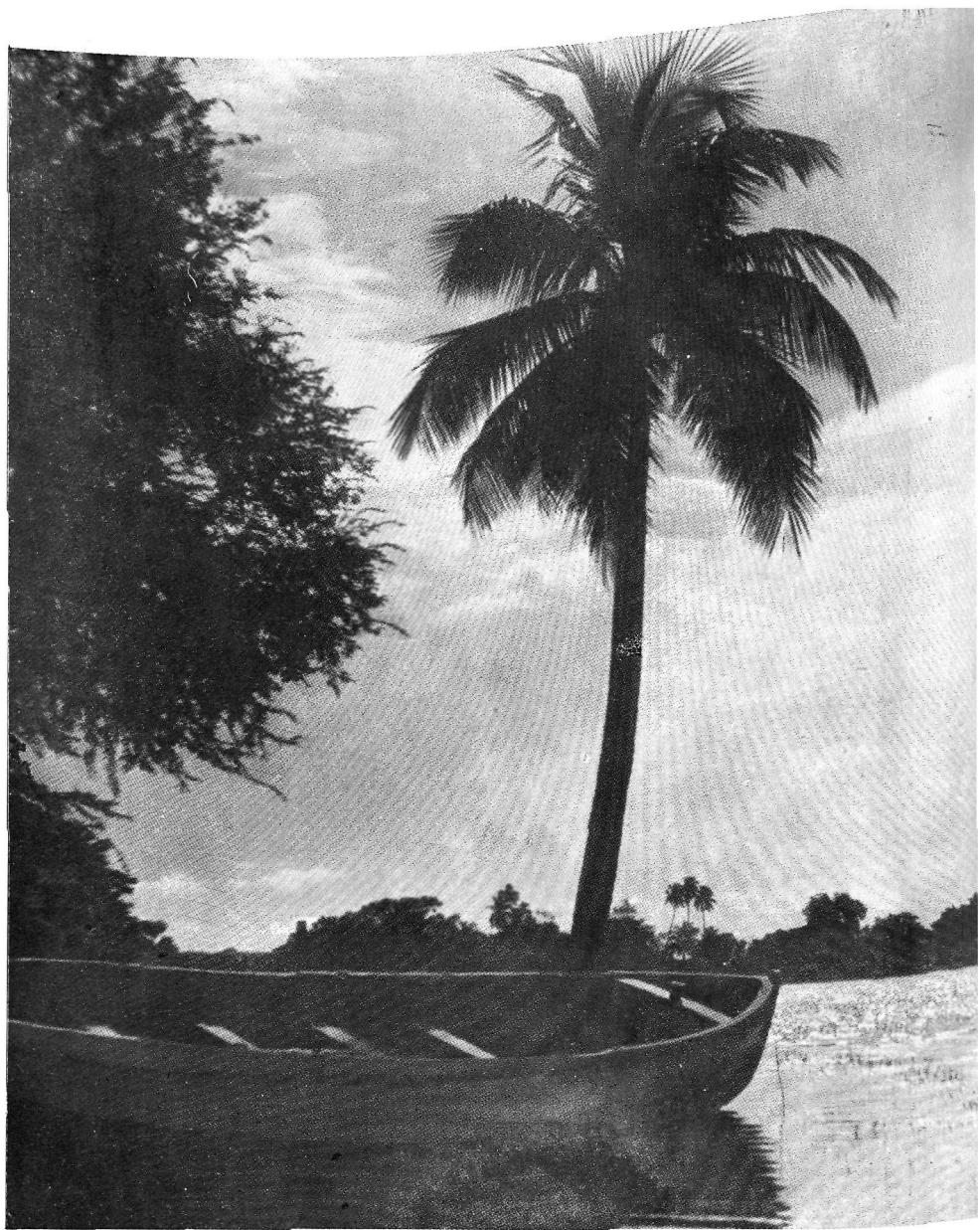
		অশুদ্ধ		শুদ্ধ
পঃ ১ ; পংক্তি ১১	...	ও ও	...	ও
” ২ ; ” ২৮	...	বাঞ্ছনীয়	...	বাঞ্ছনীয়
” ১৬ ; ” ১৩	...	পাঞ্চাত্য	...	পাঞ্চাত্য
” ৭০ ; ” ২৬	...	চন্দ্ৰ	...	চন্দ্ৰ
” ৭৩ ; ” ৩০	...	প্ৰথমাধৈ	...	প্ৰথমাধৈ
” ৭৮ ; ” ৩৫	...	চেনিকয়ে	...	চেনিকয়েট
” ৮০ ; ” ২৪	...	জঘেগা	...	জাঘগা





THE C.M.L. OF THE WHD.

[Photo. : Prof. N. R. Kar,
Dept. of Geography.



A QUIET COVE.

[Photo. : Krishna Chaudhuri,
Sixth Year English.

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

EDITORIAL

University Education

THE universities have lately come in for a good deal of criticism. The season just past of convocations and conferences, with its usual crop of annual educational reflections, would provide enough of a text for an editorial sermon. When we think, however, that our own University, the oldest in the country, will observe its centenary in a few years, thoughts about university education come to acquire a more than seasonal interest for us.

Not that recent criticism lacked a motive deeper than what occasional surveys can be expected to rest upon: it is noteworthy that the most eminent leaders of the nation, frankly expressing their scepticism about the products of our universities, have shown their anxiety for what they love to call a complete re-orientation of the educational system under the changed conditions following independence. The general complaint against the universities today is that they have been "reduced to factories capable of producing only office employees for whom there are not enough jobs."¹ The social and economic implications of the situation have been considered in the context of political independence. But the educational history of a century shows the University in its own struggle for independence, which may be summed up in terms of an aspiration to free itself from the degrading function of an examining body and realise the higher aims of teaching. But the steady expansion of numbers beyond effective teaching power and the consequent deterioration of standards show that the University, still considered to be the purveyor of degrees which, being the sole guarantee of employment, tempt a huge number to oppress the fields of pure learning, has failed to gain the independent status of a teaching body pursuing its own ends. The recent University Act, with its provisions for

¹ So runs the burden of Dr. Rajendra Prasad's address to the last Convocation of the Calcutta University. It has equally unflattering echoes in the strictures of Mr. Nehru and Dr. Radhakrishnan.

distribution of the faculties among constituent colleges, would seem to be the outcome of such a frustration.

Contemplating the strenuous movement of university education down the years, one notes with regret the sad state of neglect in which humanistic, especially literary, studies have fallen. In the growth of the idea of the University in this country and its evolution into practice one can trace the succession of two distinct ideals. The spirit of the older, nobler ideal of liberal education was enshrined largely in the passionate pursuit of literary studies. In course of time the emphasis has shifted on to scientific studies and technical training and the later history of the growth of universities shows the dominance of utilitarian considerations. We in Presidency College cherish the inherited task of "imparting the knowledge of English language and literature" which was the aim with which Hindu College was born. As we think of our University, we recall with pride that the higher study of the mother-tongue was started here on the initiative of one of the greatest of university reformers. For us the old quarrel between literature and science resolves into the ultimate simplicity of the feeling that this thing, literature, is so old, so much older than science. And yet the pity is that its proper study has not yet begun in our universities. Its neglect presents itself in everyday experience in the shape of heterogeneous, overcrowded classes. It is worth noting that admission is restricted in the Science departments of the University. In the Arts classes it is not merely that the majority of students admitted lack an honours degree but, further, there is a discrepancy of standards even among those who have it, owing to different standards of honours teaching in different colleges which, in the case of Arts, are generally low. All this calls for not merely a rigorous principle of selection but also a structural reorganisation of the educational system.

Suggestions have been made to the effect that earlier, self-sufficient courses must be devised for those many who cannot be expected to profit by university education and should learn their proper business instead of wasting invaluable years trying on the gown that simply would not sit on them. The Secondary Education Commission now touring the country is expected to make valuable recommendations towards effective planning for vocational training. Such a bifurcation, whatever be the evils of specialisation at an early stage, would serve to eliminate the present architectural confusion in the design of the general educational scheme. It would imply the need for closer integration between the different stages of higher learning which is dissociated from immediate utility and necessarily restricted to the few who are likely to profit by it. There are immense gulfs separating the post-graduate course from the honours and, still more mysteriously, the honours course from the intermediate. With a vague sense of uplift we have tacitly accepted these artificial marks of distinction as natural barriers, legitimate gradations. We must now give

up this negative way of determining the successive stages of intellectual maturity. If we want to establish the integrity of university education, the Honours teaching should make for a more effective approximation to the standards required for post-graduate study and should be confined to one or two selected colleges. And we must not stop there. We must also be prepared, logically, to think of what may be called, somewhat paradoxically, an Intermediate Honours course specially devised for those who mean to go up for the real honours study and, of course, have the capacity to do so.

It will not do to flinch at the austere vision of lean classes. If there is a real recognition of the evils of unrestricted admission, its logical conclusion, however relentless, must be faced. The dark fate of the great mass of students who face yearly failures or, even if they can scrape a pass, swell the ranks of the unemployed or unemployable educated, is enough to show the wastefulness, from the national point of view, of unrestricted admission to the universities. National interest also demands that those few who have the ability to profit by university education are not submerged in a mass of those who have not. As talented students in our country mostly come from small-income groups, a generous and diversified scholarship system is also an urgent necessity. Nothing could be more sickening than the sight of large numbers of the idle rich lounging in the fields of higher education.

In our country there is a strange etymological confusion in the perverse craze for universal university education. But 'university' has nothing to do with universality ; it simply means a *society* (*universitas*), a corporate body which obviously possesses such unity of aim and homogeneity as we have been speaking of. Here in this society students must be regarded as ends in themselves and not as means. At the university stage the pattern of education should have no direct aim, but must be content with bringing out the intrinsic excellence of the student by offering him ample opportunities of coming under stimulating intellectual influences. The curriculum, also, must not be allowed to petrify itself from any external, purposive direction, but must grow continually from within, as it were, through an almost musical correspondence between the learner's mind and the subtle personal influences around, through the constant variations, modulations and readjustments which will make up the proper internal conditions favouring the growth of individual talent.

It is strange that though there has been much talk, in recent pronouncements, about the need for intimate, personal relationship between the teacher and his pupil, accompanied by the familiar lament over modern departure from ancient Indian practice in this respect, they show, generally, a very imperfect awareness of the approach towards students as ends in themselves which forms the vital element of such

a relationship. On the contrary, the linking of ends to means as being likely to produce a tonic effect throughout the educational system has been mentioned (in the context of the problem of the unemployed educated) at several Convocations in such terms as to encourage public opinion to hold that university education must lead on to satisfying employment and that no university reform will be effective unless more attention is paid to 'the later stage of earning a livelihood'. The theory of adaptation to economic change behind such statements—to which some even like to give a historical colour by describing it as a constant in educational history—reflects the same attitude towards education as existed in the British days when grammar schools were started with the purpose of supplying office staff to serve the new economy. The dominant stress on vocational and technical training that this old colonial attitude under a new national garb implies, may, at best, claim national prosperity as its supreme purpose. But will that serve as a philosophical basis of education?

The problem of university education, as we have sought to look at it, is essentially artistic—the rendering of a homogeneous whole. There is a widespread notion that it is moral. Some of the recent Convocation addresses are marked by familiar pious statements about the moral purpose of education. One of the great defects of traditional morality, as Bertrand Russell says somewhere, is the low estimate it places upon intelligence. It neglects, nay, usurps the importance of what Russell calls intellectual virtues. Its solemn profundities are quite inapplicable to the university stage when the sole stress should be upon intellectual development. The building up of character should be mainly a matter for earlier years. Given the right early training and proper environments, a student is expected to have habits and desires which will lead in the right direction. Such further virtues as are required ought to result naturally from purely intellectual training. The fundamental basis of character, in the shape of certain habits spontaneously induced, should be laid at an early age, further development being produced naturally by intellectual progress.

The psychological necessity of a gradual and consistent transition from boyhood to youth and its corresponding implications for the educational system are not sufficiently realised. The intellectual and imaginative faculties, which are the essential elements of creative education, are not allowed to develop through constant exercise from the pupil's boyhood. When he enters the university, enormous demands are made on his creative power which has been imperfectly developed through neglect of the intellectual and imaginative faculties which can never be had for the asking, but have to be worked up in unison to the requisite degree of fertilisation. All along the educational ladder we trust to memory as the sole guide. But memory alone cannot create. The result is that we go on heaping up materials but we never build anything. The evil at the root of this

confusion of purpose is, of course, the prohibitive presence of a foreign medium of instruction the naturally imperfect knowledge of which would inhibit the free play of imagination and intellect, throwing the young learner on the mechanical resources of his memory. To induce in him a natural desire to exercise his intellect and venture on imaginative thinking it is necessary to make the material (of knowledge) available to him in his mother-tongue. Without such an intimate and effective mode of expression to work with, the student will never attain intellectual independence. The lack of this proper symbol of spiritual independence has its effects on the moral behaviour of our youths which has caused much concern lately. We have already indicated the abrupt transition from boyhood to youth. Arriving at the critical stage of youth one suddenly finds greater freedom in social conduct. But unless it is accompanied by a gift of the more real independence of the intellect ensuring a moral control over conduct, this liberty becomes licence, and in the conduct of the accused youth we find that essential exaggeration and immoderateness that belongs to adolescence which, never really sure of itself, ends in asserting itself in a violent fashion. When we shall be able to solve the problem of enriching the expressive capacity of our own languages, national life will be so much fuller that moral aberrations will have no reason to appear. If an Indian university is accused of neglecting the morals of its *alumni*, its best answer would be to evolve the organic remedy that resides in the collective spiritual heritage of its classical literature, English literature and its native literature, from an integrated study of which in concrete terms of practice will emerge a significant medium of culture containing the guarantee of our intellectual autonomy.

We have now arrived at the familiar problem of developing a vernacular medium of instruction capable of communicating the spirit of a culture at present imprisoned in a foreign medium. The independent choice of our own tongue is likely to appear so much of a privilege that we may not be sufficiently conscious of the obligations it implies. We are familiar, in discussions of this problem, with suggestions for translation of standard texts and finding equivalents for foreign terminology, as if it were a matter of vocabulary alone. It should be clear, however, that the problem is not as mechanical as that, but one of evolving an artistically organised mode of expression, of inventing a style, in short. And this is where the select society at the university comes to transform itself from a sort of masonic brotherhood, existing in isolation from social reality, into the very springs which will overflow into the vast, barren country outside, quenching its thirst for an expressive medium. In impressive contrast to the majority of students haunted by thoughts about 'the later stage of earning a livelihood', there is something fascinating about the vision of the young university student, anxious to earn his title to an independent utterance of his spirit, in his silent progression towards a vivid symbol of his spiritual

enlightenment, his pilgrimage towards a style. In the personal struggle of every university student to achieve an individual style will lie the ideal pattern of the speech we are to devise for the nation, if we are to educate it. What is wanted to-day from every university is an individual movement for a literary revival the aim of which will be to enrich the possibilities of every regional language to attain its autonomy as a self-sufficient vehicle of culture. This may seem heretical in the face of the commonly accepted view of cultivating only one of the languages as the medium of instruction for the whole country in order to secure national unity. But the deeper unity of the spirit will be secured, if the artistic possibilities of every important regional language of our country are developed with our literary heritage of English and Sanskrit as the common cultural basis. Europe once recognised Latin as the only language in the higher spheres of life. But when, after the Renaissance, the cultivation of Latin gave way to the independent growth of the modern European languages, this linguistic individuation made for greater integration of the European culture as a whole, instead of disintegrating it. Our Indian culture would, similarly, achieve a greater degree of synthesis with the individual development of all the modern Indian languages which will mean, in terms of this vast sub-continent, a new Renaissance. And for such a Renaissance the sources of inspiration exist in the shape of our collective literary heritage, ancient and modern, English and Sanskrit. But we have yet to discover a proper approach to these springs of inspiration.

Our political independence, which has perversely imposed a constitutional directive for shortening the life of English education in the country, has, however, unconsciously emancipated English from a degrading material status. Our approach to this rich store of creative thought has always been vitiated by its humiliating association with an economic advantage of the knowledge of the language. But now it is possible to imagine that it will not be necessary for an Indian to learn the language in order to secure employment. English is now, so obviously, a spiritual possession sufficiently removed from the utilitarian context to assume its legitimate status as an Art. The larger passage to a new world of ideas that English opened out to those Indians who were able to perceive in it a medium of spiritual enlightenment instead of an economic panacea, ultimately led to the gates of independence. And now India's freedom has, in its turn, set English free! The way now lies open to us to make an artistic use of the language and its literature towards the ends adumbrated in the foregoing paragraph.

What about Sanskrit? It is time its place in university education was boldly defined. We congratulate the Chancellor of the Nagpur University on having attempted such a bold definition in his address delivered in Sanskrit to the last convocation of that university. It is a pity that even after the attainment of independence our universities are slow to grasp the

cultural opportunities offered by Sanskrit. If there is any subject that could serve universities in free India today as the focal point of a school of studies corresponding in status to the Greats at Oxford, that is Sanskrit. If the Greek and Latin classics can provide Oxford with its leading honours school, there is no reason why Sanskrit should not similarly serve Indian universities. In the subjects we have borrowed from the West Indian universities can never possibly hope to rival their western counterparts, but in Sanskrit and Sanskritic studies they can absolutely hold their own and do some really first-hand research work. By an appropriate elevation of standards they could, if they would, make their M.A. degree in Sanskrit a stamp of very real distinction (which, most unfortunately, it is now far from being).

One notes with regret that there is a greater awareness of the importance of Sanskrit in other States than in our own, which was once a great centre of Sanskrit learning. The recent establishment by the Bihar Government of the Mithila Institute of Sanskrit at Darbhanga and also the Nalanda Institute of Pali on the outskirts of the ruins of the famous ancient university shows a commendable desire to revive Sanskritic learning. The recommendation, made at a recent conference of the Vice-Chancellors of the U. P. universities, of a compulsory course of Sanskrit for B.A. and M.A. students taking Hindi as one of their main subjects, is a recognition of the importance of the study of Sanskrit as enriching the study of languages derived from it. This elementary need is ignored, however, in this University where honours students in Bengali are not allowed to take Sanskrit as a pass subject. Many of them, however, are expected to get through a rather severe test in elementary knowledge of Sanskrit in order to qualify for the M.A. degree.

We have lately been told that the West Bengal Government has a Sanskrit University in contemplation. It is difficult to feel sincerely optimistic about such a notion materialising. Apart from practical difficulties, the desirability of setting up such an isolated unit may also be questioned: it reflects the deplorable tendency of disintegration visible in the new University Act. Moreover, it is a dangerous concession to the traditional snobbery which would confine classical learning to a group of mere scholars. It is time we realised that the study of a culture, however complex, must justify itself by its larger effects on the general cultural enlightenment of society. We should think of Sanskrit as co-existing with its modern descendants in an integrated scheme of a literary revival. Long accustomed to "the daily teaching of dead languages by orthodox, athletic grammarians which little avails to arouse the imagination or trouble the intellect with questionings or doubts", we are dead to the creative aspect of classical studies and are slow to realise that the old masters are the "spiritual begetters of practice." It may not be out of place here to quote the following passage from the late Sir Walter Raleigh's introduction

to Sir Thomas Hoby's translation of Castiglione's *The Courtier*, deplored the modern system of classical education in England :

The great pagan civilisations march their eternal round, like weary ghosts, through the schoolroom; at the stroke of the clock they vanish, and the activities of real life are resumed. By the time that the child reaches manhood, he is so inured to these habitual intruders that he regards them as honourable appanages to an English homestead; hardly does the thought occur to him that these too, like other restless spirits, have a message to deliver and are burning to speak.

When will it occur to us that the ancient culture enshrined in Sanskrit has a message to deliver and is burning to speak?

A passing reference may be made in connexion with all this to the view expressed in recent years in some very high quarters that our universities should reduce their financial commitments by getting rid of subjects like Sanskrit or Pali, Arabic or Persian—subjects which are not 'popular' and which therefore do not pay their way. It is greatly to be deplored that market considerations such as this should be imported into discussions about university planning. 'Paying one's way' is a hopeless criterion to apply to university management. Apply that criterion and there would hardly be a subject left for a university to profess. In fact, this is exactly where the State comes in. It is one of the primary obligations of a modern State to rescue its universities from abject dependence on fee-income and to make it possible for them to pursue their own cultural programmes untroubled by financial worries. Need we stress that the money spent on a university pays itself back a hundredfold in invisible returns of tremendous value for the life of a nation? The ideal of university economy ought to be that a department should be run with its full complement of staff and all equipment that might be necessary even if there was only one student on its rolls. If the State cannot live up to this strenuous ideal, it had better give up its pretence of fostering university education, wash its hands of the entire business and openly confess its failure to discharge a basic responsibility.

The Concept of Ecstasy Reviewed in the Light of Sanskrit Poetics

JOGESHCHANDRA BHATTACHARYA, M.A.,

Lecturer in English, Darjeeling Government College.¹

THE word 'ecstasy' in modern English usage generally means 'rapture' or 'an exalted state of feeling'. This, however, is only a secondary sense of the word. 'Ecstasy' in Greek literally means 'standing out', *i.e.*, going out of oneself. Going out of oneself and becoming another is Ecstasy in Art. In European criticism the concept of Ecstasy is to be found first in Aristotle. To quote from his *Poetics*, Chapter 17 (Ingram Bywater's translation) : "Hence it is that poetry demands a man with special gift for it, or else one with a touch of madness in him ; the former can easily assume the required mood, and the latter may be actually *beside himself with emotion*" (*i.e.*, 'ecstatic', if translated literally).

What Aristotle means to say may be best expressed in the words of Matthew Arnold (in the *Strayed Reveller*), that the doom of the poets is "to become what we sing". The poet, in other words, has to become one with his creation, be it the creation of a character, or a mood or an atmosphere. It is indeed a sort of martyrdom, a supreme self-immolation on the part of the creator. The poet may have to create a character entirely unlike his own. There, in fact, lies the test for him ; and it is precisely there that the poetic life scores over the non-poetic one. We can, in the non-poetic life, lead at best a kind of partial and fragmentary existence. The poet, on the other hand, must have the capacity to become all things at a time. Perhaps the greatest example of this is "myriad-minded Shakespeare". He is at home with Iago as perfectly as with Desdemona, with Hamlet as with Claudius, with Antonio as with Shylock—men and women who lie at the opposite poles of human character. In fact, it is this plasticity, this protean quality of his genius, that is the greatest marvel about Shakespeare.

Coming to English criticism, we find a fine exposition of the concept of Ecstasy in the letters of Keats. When Keats, in his famous letter to Woodhouse (October 27, 1818), wrote that the poetical character has no self, he meant that the poet steps out of his fixed and circumscribed self and becomes another. For a perfect description of the poetical character, we should go to his letter to George and Thomas Keats (December 22,

¹ Alumnus : 1946-48.

1817). "It is everything and nothing", he says, "living at all levels—high and low, mean and elevated. But all kinds come equally and easily to him. . . It has as much delight in conceiving an Iago as an Imogen. Therefore what shocks the virtuous philosopher delights the chameleon poet." And again, "the poet is the most unpoetical of anything in existence, because he has no identity. He is continually in for and filling some other body". Logically, we cannot ascribe to the poet even the poetic character, for he has no unchangeable attributes. Here, however, we should note in passing that the poet becomes that which he creates only for the time being ; he does not mean to fix himself there.

The first two lines of the last stanza of the famous *Ode to a Nightingale* will provide us with a concrete illustration of our point :

Forlorn ! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self.

In this poem Keats achieved Ecstasy in the deeper sense—a complete merging of his own self in that of the bird. But suddenly with a jerk he is thrown back to the trammelled self of his everyday existence. That 'sole self' is exactly the problem of the non-poetic life: how to liberate ourselves from our fixed, circumscribed identities—how, in other words, to universalise our selves? One of the channels of emancipation is offered by poetry, or for that matter, by all Art, through Ecstasy.

Keats gives us yet another beautiful description of the nature of Ecstasy in a passage in *Endymion*, Book I :

Wherein lies happiness? In that which becks
Our ready minds to fellowship divine,
A fellowship with essence; till we shine,
Full alchemiz'd and free of space. . . .

This "fellowship divine," the becoming one with things, comes through some very absorbing sensuous or aesthetic experience :

that moment have we stept
Into a sort of oneness, and our state
Is like a floating spirit's.

The concept of Ecstasy is also traceable in a famous passage in Shelley's *Defence of Poetry*. To quote only a few lines :

The great secret of morals is love; or *a going out of our own nature*, and an identification of ourselves with the beautiful which exists in thought, action or person, not our own. A man, to be greatly good, must imagine intensely and comprehensively; he must put himself in the place of another and of many others; the pains and pleasures of his species must become his own. The great instrument of moral good is the imagination; and poetry administers to the effect by acting upon the cause.

The great secret of morals is found by Shelley in 'a going out of our own nature'—in other words, in Ecstasy. It is only through Ecstasy that we become moral in the fundamental sense, for mere moral doctrines by themselves are not a sufficient impulse to morality.

The yearning for the universalisation of the isolated individual self did not leave the Indian mind untouched. The way suggested by Indian philosophy was the complete merging of individual existence in the Absolute. This is the supreme instance of Ecstasy, a going out of our finite selves and becoming one with the Infinite (ब्रह्मास्वाद). Indian Poetics pointed to an analogous process in the experience of poetry. Thus :

सत्त्वोद्देकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः ।
वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥

(*Sahityadarpana* by Viśvanātha : Chap. III).

Just as in the experience of the Absolute the difference between the knower and the known vanishes, so in poetic creation. The reader or the auditor, too, undergoes a similar process. How is it possible for us, asks the author of the *Sahityadarpana*, to feel pleasure or pain with Ramachandra or Sita while reading the Ramayana, when their delight or sorrow does not concern us in any way? How do, in other words, the feelings of a particular man or woman become universal? To quote a few lines from the *Sahityadarpana*, Chapter III :

ननु कथं रामादिरत्याद्य द्रूबोधकारणैः सीतादिभिः
सामाजिकरत्याद्य द्रूबोध इति, उच्यते—
व्यापारोऽस्ति विभावादेनार्थान् साधारणी कृतिः ।
तत् प्रभावण यस्यासन् पाथोधिष्ठलवनादयः ॥
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥

The objects which arouse emotions have a function of producing a oneness between the writer or the reader and the creation. It is due to this that a right-minded appreciator finds his own self engaged in crossing the ocean like Ramachandra or Hanumana. It is due to this again that an average man can, for the time being, feel himself able to do all sorts of things with the hero. Such experience can, however, continue only for the time being, because, as we have already noted, the poet or the reader does not mean to fix himself in the state of oneness with the creation. Visvanatha, speaking of the appreciator, says that he will have no sense of his own different self so long as he is absorbed in the creation in hand :

परस्य न परस्येति न ममेति च ।
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न विद्यते ॥

Once, however, the experience is over, the reader will regain the consciousness of coming back to his "sole self".

This **साधारणीकरण**, as Sanskrit Poetics calls it, this **तन्मयत्व** (becoming that), is essential for the creation as well as for the enjoyment of Art. Neither the word "absorption" nor the word "Ecstasy" is so apt as the word **साधारणीकरण** or **तन्मयत्व** in describing this process of identification. What was merely touched on by Aristotle, and casually referred to in some of the letters of Keats, found clear and systematic treatment in Sanskrit poetics.

Sinclair's New Epistemology

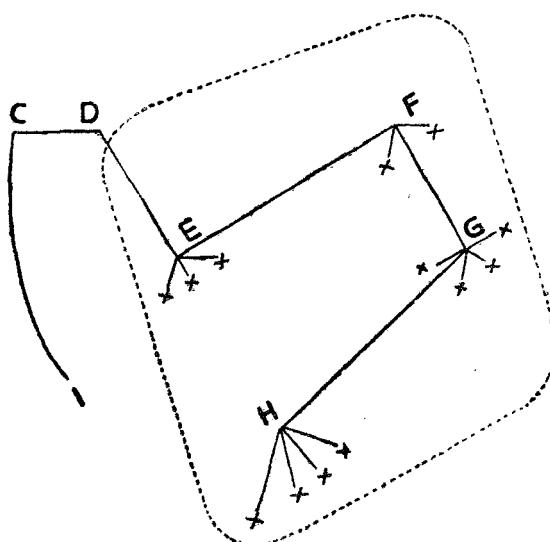
SACHINDRANATH GANGOPADHYAYA—*Sixth Year Philosophy.*

MR. ANGUS SINCLAIR, lecturer in Philosophy at the University of Edinburgh, has lately published an interesting book in which he claims to have discussed problems of the theory of knowledge in a way which opens up a new approach to the field neglected by philosophers for many years. He names the book well: 'The Conditions of Knowing'. All our knowledge is dependent on some conditions of entirely subjective origin, which he calls our 'situations'.

Epistemology has to-day gained a unique and overriding importance in philosophical circles. Mr. Sinclair attempts to show that attitudes play an important part even in our noëtics. So many things depend on a man's attitude. Epistemological attitudes are, in one respect, unique. They are unlike all other attitudes in the range of their relevance. All opinions, particularly in philosophy, are affected by the *attitudes* we hold about the nature of knowledge. And these our attitudes, according to him, form a hierarchy or pyramid of them. They tend to, or actually, build up a system of thought in a man. The particular simple facts are not known without reference to the more general outlook. The true function of a philosopher in a community can therefore be regarded as one of identifying and examining the general attitudes.

The difficulties in epistemological enquiry at present are not due to the subject itself, but are created by not infrequent attempts to bring the particular facts of enquiry under a single epistemological attitude the range of which is wrongly limited. Often, for instance, a point is reached in an enquiry where to have any more effective progress demands a change in the general attitude altogether. But the person, being impervious to that amount of dynamicism, always tries to bring the facts under his own attitude and makes a show of problem.

Mr. Sinclair has given a graphic representation of this puzzle. If we represent any given theory at any given point in time by D in the following diagram, we usually find that it continues more or less unchanged until some later point E , by which time a crop of fresh data has appeared which it cannot account for. Various alternative modifications are tried, retaining the general attitude intact. But the attempts fall, as indicated in the diagram by \times . We may find a point of modification where the fresh data get explained ; but again some fresh data appear, followed by some modifications, and the process is repeated until all attempts are failures.



And then we have to turn our attention to the earlier assumption involved in the general theory. In time somebody lays bare some such assumption at an earlier point C and discovers an alternative to it (I), which does account for the accumulated data.

The normal epistemological attitudes in Anglo-American culture are, according to Mr. Sinclair, all derivations of some such unconsciously held epistemological attitude or complex of attitudes, which is primitive and misleading, and to it we have to find an alternative.

Thus, attitudes (general) are so important in their rôle that they baffle, if wrongly clenched, all attempts of fruitful enquiry in any field of knowledge. Our theories, our explanations of particular facts all depend on our general attitudes.

To prove his contention Mr. Sinclair takes various basic metaphysical problems *e.g.*, causality, progress, inference, probability, space, time etc.,

and discusses them in this light. He attempts to show that they represent only some particular way of knowing, a group of events selected in our attention to build up a general attitude.

Now, let us see how he tackles the problem of causality. Until near the end of the eighteenth century it was believed that an effect is bound up in or with its cause, and that we can foretell the effect if we can know enough about the cause, but Hume then pointed out that we can not. In some Epicurean and other writings and in some Arabic writings there are scattered remarks which may indicate a recognition that this view is too simple. The seventeenth century occasionalists seem to have first pointed out the fact that the cause cannot, in any way, contain the effect, but the issue was narrowed down to the mind-body problem.

Mr. Sinclair says that there are no causes and effects existing as such or, to put it more clearly, we cannot hold that there is an objective principle of causality. So far he follows his precursor Hume. But the explanation he gives of the problem is somewhat peculiar and rather amusing. He opines that when one speaks of a cause and an effect, *i.e.*, of a pair of events and conditions, and their being so related, they form a situation within which holds what we call a causal relation. This situation exists only because one carries a process of selecting and grouping in one's attention in one's own particular way (a unique blend of empiricism, scepticism and solipsism). Thus, 'striking a match' and 'its lighting' are names for certain selections which I take and group in my attention from the range before me at the given time in the given conditions. Any other man forms the situation by selecting and grouping in his way when he asserts that the striking of the match is really the cause of its lighting up, and that all this pedantry about selecting and grouping is only another example of the notoriously perverse ingenuity of philosophers in obfuscating matters that would have been clear enough, if only left alone ; he is, in effect, asserting that all other people follow ways of knowing *i.e.*, selecting and grouping in their attention, which are so similar to his own that nobody notices any difference between these ways and therefore does not notice the ways themselves.

Now the question may arise : why do we believe in such a law ? The answer is that we must. If a man did reject that principle and that belief and acted accordingly, he would find that instead of living his normal life he had involved himself in utter confusion. He could not take any action of even the simplest kind because, on the view he had adopted, anything or nothing might be the consequence of it. The same thing happens in a particular case, only the confusion there is not total but local, limited to the field concerned.

Now the nature of this process of selecting in attention is, like others, not an act once done and thereby completed, but is a continuing process which must be sustained if our experience is to continue as it is.

He derives additional support or evidence—at least he thinks so—on this line from the study of mental disorder. Certain types of psychotic breakdown are marked by an incapacity to experience events as causally related in the same way as normal people experience them.

Sinclair clearly says, "These principles are not inevitable. We can hold them or not hold them ; but the penalty for not holding them is confusion in all fields or in many or in any one, or as the case may be." Now it is very strange that he repeatedly points out what the penalty is for not holding such principles, but he remains conspicuously silent about the question : 'why the penalty ?'

From the above, it will not perhaps be presumptuous to think that what Mr. Sinclair wants to say, if he says any thing at all, is not quite clear.

Undoubtedly, there are some interesting points in his approach. But he states his view too vaguely and carries his inclinations to a point of absurdity. He never clarifies the exact meaning and connotation of the terms he uses, *e.g.*, 'attitudes', 'selection and grouping in attention', 'way of knowing'. Does he mean by this 'way of knowing' a form of knowing or category, as Kant means ? Obviously not, because Kant has stated his philosophy with much more pains than Mr. Sinclair and the latter in that case turns out to be an outdated disciple of the old master.

Attitudes play a part in our knowledge. We select and group in our attention. But that does not in any way mean that there is no objective determination. If Mr. Sinclair claims any novelty in his exposition he becomes illogical (as we shall see afterwards), and if he is to prefer logic his claim to novelty is demolished.

Why do we select in a particular way which is more or less fixed for all, and not otherwise ? He will answer that otherwise there will be confusion. But why such confusion ? His eloquence is significantly bridled here. The answer is simply that in that case there will be two different worlds which will not square—the world of our ideas and the world of the real objects. The real objects behave in a certain way. And we know these objects only as behaving entities in their entire range. And their behaviour in a particular way determines the corresponding way of our knowing. We have to know the objects as they are and as they behave. And we select events accordingly, and not arbitrarily. Our arbitrary selection will only lead us to a bottomless abyss of nonsense and confusion, where knowledge loses all its significance. Moreover, it is not that we know the objects first and then select them at will, but that events get related in our mind, because they are so related in nature and because we can know the objects and orders of nature directly. If we know the objects, there is no reason why we should not know their behaviours and orders. And even if we try, we cannot know them (*i.e.*, select them in attention) otherwise, unless we are unusually indifferent to the data of

our knowledge. Again, why do I perceive in an after-thought that my selection is wrong? Because, the objective grounds for that way of selection are lacking.

It is not infrequent that we group in our attention real objects quite unfamiliar to the nature outside us and feel betrayed. Selection presupposes an amount of elimination which badly requires a standard more or less fixed for all. We always try to reflect nature, as it is, within us. And this process is carried on by our selecting, grouping and empirical verification. We constantly refer our experience to the outer world. That we cannot select at random proves that these principles of nature are not selections ; they are the *given* of our experience. If selection means only knowing particular facts, that is simply on account of our physical as well as mental inability to know the entire nature at a time. About causality in particular, as a principle, Mr. Sinclair says that it is a way of our selecting events in attention. Philosophically, one cannot say 'yes' or 'no' to its objective existence. But this is a challenge to the progress of scientists. Science is possible only because as philosophers we believe—and not without reasons—that we know objects of nature and there are principles operating there. We see that when we throw up a body it comes down to earth. When we strike a match it lights up. Because we see this recurring principle in nature, our knowledge sustains a relation peculiar among the events. And if, owing to my arbitrary selection, things do not come down to earth when thrown up, fires do not burn, I shall feel like a fish out of water. Whenever I know, my knowledge or experience incurs a belief that events in nature behave exactly in their native sphere. If fire and burning were not objectively and universally related, I would not have selected events of fire and burning in a particular relation of causality.

Again, Mr. Sinclair says, "there is a similarity of ways." We admit that, but we as simple souls—however *naïve* he may call us—want to admit something more. We believe that the similarity in our ways of knowing clearly points to an objective sameness of behaving events. Mr. Sinclair falsely alleges that the similarity of experience makes us oblivious of the fact that they are our *ways of knowing*. Nobody denies that we have our ways of knowing. But we cannot accept his illogical and mysterious emphasis on *ways* only, excluding their similarity. We claim humbly that 'similarity' in English vocabulary is not an unmeaning sound.

Mr. Sinclair uses the term 'work'. It has such a strong flavour of pragmatism that Mr. Sinclair appears to be a pragmatist. But he cannot mean anything similar to the pragmatist conception of the word. By 'working', William James only wants to convey that the truth has a content as different from the intellectualists' merely formal truth. But he also says that there is an 'ambulatory relation'. (The term is used by Mr. Strong.) And if followed up, our sensations melt themselves into real

objects. That is why they work. Mr. Sinclair does not and cannot attach any such sense to the term 'working'.

In conclusion, it is possible to agree with Mr. Sinclair, if he only concedes that the objects in nature behave in a fixed way and, in trying to know them, we obtain the principles. There is no reflective selection for the principles to emerge late in our understanding or *better* attention. There is an objective compulsion in our picking up and arrangement ; and this compulsion is only the real nature and behaviour of the objects in the world outside us.

A Trip to Totopara

SUNIL KUMAR MUKHERJEE, M.A., I.A.S.

Additional Deputy Commissioner, Darjeeling¹

THE fast dwindling Toto tribe has given Totopara its name as well as its importance. The spot is on the foothills of high mountains and, apart from its ethnological interest, the visitor who goes there gets ample reward for his pains in the scenery he comes across. When I was Sub-divisional Officer of Alipurduar, the only outlying sub-division of the Jalpaiguri District, I first found Totopara mentioned in the District Gazetteer and was interested. The interest was quickened when one day the wife of an Assistant of a European Tea Estate enquired of me : "Have you managed to visit Totopara, that semi-mythical spot the allurements of which are but partly summed up in its name?"

The opportunity came when I went on tour near the area. Totopara is within the limits of the Madarihat Police Station in the north-eastern corner of the Alipurduar Sub-division. There are two different routes to it—one via Lankapara Tea Estate and the other branching off from near the Hantapara Tea Estate. I was informed that the Lankapara route was shorter but was only suitable for those who were travelling on foot. I therefore went up to Hantapara Tea Estate on a jeep and from there mounted an elephant. It was the 24th of March, 1950. I started from Hantapara Tea Estate at about 9-20 A.M. At first the elephant had to wade through a considerable stretch of mud. Then came dense forest.

¹ Alumnus : 1938-42.

After about two hours the officer-in-charge of the Madarihat Thana who was accompanying me suddenly exclaimed: "We have arrived". My tour diary shows that we arrived at Totopara at 1 P.M. My impression was that the distance from Hantapara Tea Estate to Totopara was some 14 miles—an elephant can move fast.

Our approach however was already being announced from a clump of bamboo trees. A shrill sing-song which was wholly unintelligible to us was emerging from it. Nearing it, we could make out a short dwarfish figure, that of a youngman with Mongolian features. He had only a loin cloth on.

At that time we were on the fringes of Totopara. The elephant passed a field where maize was growing. The road took a crazy turn after that and we found ourselves near a shady open space where a few huts had been built in close proximity. It was the market-place. The huts were shops built by *bhatias* (plainsmen) from far away with their usual *bania* ingenuity.

A crowd soon gathered. A squat, thickset man came forward, announced with an air of importance that he was the headman and immediately started a tirade against the shopkeepers from the plains who, he claimed, had been fleecing them mercilessly. It was with difficulty that he could be soothed and made to talk about himself and his tribe.

From his account I gathered that only some fifty families constituted the Toto tribe. Only a rough guess can be hazarded about the total number of Totos. I would put it at 500. Physically the Totos resemble the Bhutiyas and the Gurkhas. They have the same short, sturdy stature and flat-nosed, round face with scanty beard and beady eyes. The huts in which the Totos live are round in shape and are double-storeyed. They usually stay in the first storey while the ground floor is littered with refuse of all sorts. Usually they keep pigs and poultry in the huts and this factor does not improve matters in point of cleanliness.

As regards the food habits of the Totos, rice is their staple food, while maize is also taken in times of need. Rice is of course also used for preparing *handea* which is so commonly drunk that no stigma whatsoever is attached to it. The Totos are by reputation fairly omnivorous in their tastes and on lean days even mice do not escape their attention. *Pan* is a general favourite and the Totos can be seen chewing pan almost all the time. Another favourite is *biri*. Even small children are addicts.

The Totos are a dying tribe. They are rapidly dwindling in number. Malaria and glandular ailments have been chiefly responsible ; the survivors suffer, almost without exception, from some form of skin trouble. A very high percentage of the incidence of tuberculosis and leprosy is also to be found among them. Anthropologists will perhaps cite inbreeding as the cause for their gradual extinction.

The Totos grow maize, millet and rice in their fields. They are however well known for their *flair* for growing oranges. Up in the hills they have their orange groves and in January and February ply quite a brisk traffic. Silhouetted against the blue mountains, the orange groves provide a feast for the eyes.

The Totos, however, now complain that oranges are becoming more and more difficult to grow as the hill-sides are gradually being shorn of their vegetation. Oranges are the chief source of trade and it is difficult to envisage them after a few decades as thriving, if that trade is lost to them. They have no other means to fall back upon. They are soft, meek, ease-loving and easily satisfied and therefore have little incentive to better their lot or improve the prospects of survival for the tribe.

The Totos worship Mahakal (the God Shiva) who, according to them, lives in the hills which lie beyond the horizon. They are a superstitious lot. When asked whether they were given to hunting, they replied : "No, that is prohibited by Mahakal". When asked to adjust themselves to changing social conditions by learning to read and write, they replied : "No, Mahakal has definitely put a taboo on these things". One who hears their patter cannot but be struck by a curious combination of *naïveté* and native cunning, straightforward acceptance of the ills of human life and the all too human tendency to attribute their woes to caprices of the Designing Hand.

The return journey was uneventful. The headman demanded a price for his "talk". Afterwards he accompanied us up to the outskirts of the forest. We left Totopara at 3 p.m. and returned to Ramjhora Tea Estate at 6 p.m. at the end of a strenuous day.

Satish Chandra Mukherjee and the Dawn Magazine (1897–1913)

HARIDAS MUKHERJEE, M.A.

Lecturer in History, Central Calcutta College¹

SATIS CHANDRA MUKHERJEE (1865—1948) was one of the chief architects of the Swadeshi Movement of 1905, and a prophet of Indian nationalism in the first decade of the present century. His name has been rendered immortal in the cultural annals of Bengal for four notable contributions: the foundation of the *Bhagavat Chatuspathi* (1895), the establishment of the *Dawn* (1897), the organisation of the Dawn Society (1902), and last but not the least, the inauguration of the National Council of Education (1906). Each of these items requires intensive and detailed study. For the present, however, I confine myself to a study of Satis Chandra in relation to the *Dawn* alone.

The foundation of the *Dawn Magazine* (1897) was an epoch-making service of Satis Mukherjee to the nation. Originally, it was a journal of the *Bhagavat Chatuspathi*, but later it became an organ of the Dawn Society and still later, an organ of the Swadeshi Movement, particularly in its “National Education” aspect. The *Dawn* was founded by Mukherjee in collaboration with Rajkumar Banerjee who was Professor of Physics in Bangabasi College, and Manmatha Nath Pal who was a pleader in Alipore Court, but Mukherjee was the life and soul of the *Dawn* throughout its long career of sixteen years (March, 1897—November, 1913).

The *Dawn* was a monthly magazine intended to be a vehicle of higher Eastern and Western culture. Its object was “to make a special study of Hindu life, thought and faith in a spirit of appreciation, while remaining fully alive to the usefulness and the necessity of the existence of all other systems, secular or religious, Eastern or Western”. The spirit or policy of the journal was thus cosmopolitan and all-embracing. The journal carried as its motto a famous utterance of Sankara which means in English: “That which is ever permanent in one mode of being is the Truth.”

THE ‘DAWN’ IN ITS FIRST PHASE

Several well-marked phases are easily discernible in the evolution of the *Dawn*. The first issue of the *Dawn* was published in March, 1897 and

¹ Ex-alumnus.

the initial phase of the journal continued till July, 1904. During this period, the office of the journal was successively at the following addresses : (i) 44, Lansdowne Road, Calcutta (March, 1897—December, 1898), (ii) 3, Puddopukur Road, Calcutta (June, 1899—February, 1902), (iii) 79, Puddopukur Road, Calcutta (March, 1902—July, 1904).

The *Dawn* in its first phase was distinguished by high-class religious and philosophical writings. It occasionally contained articles on science, history and sociology as well as critical papers on education. Among the chief contributors in this period may be counted such names as Annie Besant, Swami Abhedaananda, Mahendra Gupta (author of *Ramakrishna Kathamrita*), Dr. Nishikanta Chatterjee, Ramaprasad Chanda, Durgacharan Sankhya-Vedantatirtha, Principal Nagendra Nath Ghose, Principal Jyotibhusan Bhaduri, Dr. Mahendra Lal Sarkar, Jadunath Sarkar, Brajendra Nath Seal, Pandit Satis Chandra Vidyabhushan, Rajendranath Vidyabhushan, Pramathanath Tarkabhushan, Hirendra Nath Datta, Bepin Chandra Pal, Sister Nivedita, Atul Chandra Chatterjee, I.C.S., Kiran Chandra Dey, I.C.S., Haran Chandra Chakladar, Radhakumud Mukherjee, Rabindra Narayan Ghose, Sir George Birdwood, Dr. Coulson Turnbull, W. A. Rodman, Prof. A. A. MacDonnell and Principal E. B. Havell. Among these names one will encounter some of the most brilliant men and creative thinkers of the age. The topics of discussion were as varied as possible, though the predominant bias was for philosophical writings. Satis Mukherjee, as the Editor, regularly contributed serious and thoughtful articles on philosophy, religion and education, although these writings rarely bore his signature in print.

Within less than a year of its first appearance in March, 1897, the journal made a profound impression on contemporary Bengali thought. It created a stir among the intellectuals of the time on account of its high quality and standard as well as the seriousness and originality of most of its contributions. Sir Romesh Chandra Mitter (offg. Chief Justice of Bengal) wrote on April 12, 1898 : "I have been a regular reader of the *Dawn* since its first appearance. The analytical power, evinced in expounding abstruse thoughts, is of a superior order. It is a valuable addition to journalistic literature in our country." Mr. Kiran Chandra Dey, I.C.S. (Offg. Magistrate and Collector, Faridpur) observed on March 31, 1898 : "I wish to state that the *Dawn* marks a new departure in journalism." Sir Asutosh Mookerjee, then a member of the Syndicate, Calcutta University and a Vakil, High Court, Calcutta, wrote on April 16, 1898 : "I am a subscriber to the *Dawn* and have been a regular reader of its pages. What has struck me most about it is that it does so much *original* work. It is an altogether new thing of its kind in India and deserves for its originality to be encouraged in every possible way by the Government in its Education Department, by other educational authorities, and by the more thinking portion of our community." Similarly, high

opinions about the character and quality of the *Dawn* were expressed by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, Senior Professor of Sanskrit, Presidency College, Calcutta (September 24, 1897), Chandra Nath Bose, then a Bengali Translator to the Government of Bengal (March 11, 1898), Rai Pramada Das Mitra Bahadur, the distinguished Sanskrit scholar of Benares (May 28, 1898) and other competent judges. The *Dawn* also attracted the notice of scholars and journalists beyond the seas as early as August-September, 1898. On August 20, 1898, *The Leeds Times* of England, a well-known weekly of that time, published a leading editorial on it under the title of "Our Influence in India." It was spoken of in that article as a "unique production." The whole article was reproduced in the *Dawn* (October, 1898). It also rose in the estimation of some scholars of America by that time. As time went on, the quality of the journal was more and more improved under the all-absorbing personal care of Satis Chandra Mukherjee. At the turn of the century it succeeded in firmly establishing itself in the world of journals. Commercial motives were entirely lacking in its set-up. The only thing that was always sought to be maintained was the quality of the journal, and the writings were marked by a noticeable breadth of view and depth of thought.

In its first phase the organ propagated, among other things, India's moral and spiritual ideals and values. The comparative methodology was very often resorted to and Indian thought was frequently thrown in bold relief in the perspective of Western ideals. Attention was constantly drawn to the distinctive mark of Indian culture, viz., primary stress on spiritual ideals as central to good living. Young Bengal learnt from Satis Mukherjee that India has a spiritual mission to fulfil. This was in consonance with the spirit of the teachings of Vivekananda and Abheda-nanda, the two monks of the Ramkrishna Order who were propagating Vedanta and Indian culture in the West during the same period. Like the two great Swamis, Satis Mukherjee was a staunch believer in India's inherent spiritual superiority to the West. The *Dawn* expressed and diffused such sentiments among the educated classes. They were made conscious of their worth, dignity and manhood, notwithstanding political enslavement and economic backwardness. A new spirit of self-confidence was instilled into the heart of the nation. This was the first and foremost contribution of Satis Mukherjee during March 1897—July, 1904.

Again, the *Dawn* in its first phase sought to drive home to the readers the truths and triumphs of modern science. The Editor himself occasionally contributed articles under this head, while as a rule he reprinted scientific articles from English and American journals of science. Original articles from well-known scientists, such as Dr. Mahendra Lal Sarkar, Principal Jyotibhushan Bhaduri, Dr. W. R. C. Latson, were published in its pages.

The *Dawn* was also responsible for publication of many historical and

sociological writings bearing on Indian and Western themes. Dr. Nishikanta Chatterjee's English rendering of "The mystic story of Peter Schlemihl by Adelbert von Chamisso" from the original German was serially published in the *Dawn* during 1899-1900. The same author's "Leaves from an unpublished Diary: some Reminiscences of England (1882)" was also published in Mukherjee's journal. And the Editor himself made several historical contributions to the magazine, and wrote many valuable articles on educational problems also. His long article, "An Examination into the Present System of Education in India and a Scheme of Reform", offers a masterly analysis of all the varied problems of Indian education and constitutes a landmark in the history of educational reforms in India. It was published in three issues, April-June, 1902. Few educational charters of early twentieth century can claim so much historic importance as this writing of Satis Mukherjee.

The *Dawn* was at first published as a monthly journal almost regularly on the completion of every month. But after the twenty-second issue (December, 1898), there was an unexpected delay in its publication for five months (January-May, 1899). The sole reason for this delay was the severe illness of the Editor, and the magazine, lest it should lose in quality in Satis Mukherjee's absence, was not published for five months. From a circular letter issued in March, 1899 over the signature of the Honorary Manager, Tinkari Mukherjee, we learn the following fact: "The *Dawn* being the property of the Bhagavat Chatuspathi, a Free Hindu Public Religious Institution conducted under the direction of Sir Romesh Chandra Mitter, Kt., the authorities of the said institution have decided that it would be in the interest of the magazine (having regard to the high-class character which it has always sought to maintain) that its publication be suspended during the period of illness of the Editor".¹ The Editor regained his health by May, 1899 and the *Dawn* resumed its career from June, 1899, with renewed energy and zeal. Every issue of the magazine bore the unmistakable impress of a master-mind—the stamp of Satis Mukherjee's ability and erudition. No thought of personal glory, no desire for reward animated Satis Mukherjee who worked as Editor out of love, being urged by idealism, "from pure patriotic motives at a personal sacrifice," as Jogesh Chandra Mitra (Offg. District and Sessions Judge, Nadia) observed on June 7, 1898. The proceeds of the *Dawn* were entirely devoted to the support of the Bhagavat Chatuspathi for the benefit of young students. From June 1899 to July 1904 the magazine was published every month without any break. Haran Chandra Chakladar rendered a splendid service to the magazine during this period as an assistant to Satis Mukherjee.

We learn from Mr. Chakladar that at first only 300 copies were printed every month. But every year the number increased and the area of its circulation became wider, and by 1902-03 the *Dawn* began to exert a

¹ The Editor's Acknowledgments (*Dawn*, June, 1899).

tremendous influence over the students and scholars of Calcutta. It also circulated in the districts of Bengal and beyond. Several dozens of each issue were despatched to the writers and scholars of England and the U.S.A. In its first stage the *Dawn* had, besides, several eminent contributors from Germany, England and America.

In fairness to Satis Mukherjee, it must be recorded that he was not content with merely running a first-class periodical ; he went a step further in addressing himself to the self-chosen task of training up a band of young enthusiastic writers who would carry forward the spirit and tradition of the *Dawn*. In this regard he faithfully followed the idealistic tradition of Akshay Kumar Datta, the Editor of *Tattva-bodhini Patrika*,² and Bankim Chandra Chatterjee, the Editor of the *Banga-darshan*, both belonging to the nineteenth century. Satis Mukherjee's name will go down in history as one of the best journalists and creative thinkers of Bengal along with Iswar Gupta (1812-1859), Akshay Datta (1820-86) and Bankim Chatterjee (1838-94). Journalism was with him, as with the other three, a mission, not a profession.

THE 'DAWN' IN ITS SECOND PHASE

The *Dawn*, throughout its first phase, had been an organ of the Bhagavat Chatuspathi (founded in 1895). Its second phase began in September, 1904, when it ceased to be an organ of the said Chatuspathi and became the mouth-piece of the Dawn Society founded in July, 1902. During July, 1902—July, 1904, the Society and the journal had separate offices and management till they were linked up and fused into one. The Dawn Society found its mouthpiece in the old *Dawn* which, therefore, in its new series (since September, 1904) took the name of *The Dawn and Dawn Society's Magazine*. The Dawn Society functioned in full vigour up to September, 1906, after which date it gradually declined and became defunct early in 1907. The *Dawn* with its new title was published from September, 1904 down to November, 1913 after which the magazine ceased to exist. During this entire period the journal did not evidently function as the organ of the Dawn Society alone. Even after the dissolution of the Dawn Society, the journal retained its title as *The Dawn and Dawn Society's Magazine* and was successively intended to be an organ of the National Education Movement (1906-1909), and an organ of Indian art, architecture and music (1910-1913). As a real and effective organ of the Dawn Society the Magazine, functioned for about two years (September, 1904—July, 1906).

² *Tattva-bodhini Patrika* was founded in 1843 by Debendra Nath Tagore (1817-1905) with Akshay Kumar Datta (1820-1886) as the Editor (1843-1855). It was an organ of Tattva-bodhini Sabha of Debendranath Tagore, founded in 1839.

Banga-darshan was founded in 1872 by Bankim Chatterjee (1838-1894) who edited it for four years and then for the next six years it was edited by his elder brother, Sanjiv Chatterjee.

The *Dawn* in its second phase became a bi-monthly magazine, being issued every two months since September, 1904 and containing 48 pages of reading matter (Royal size). As a bi-monthly magazine its career continued till July, 1906. During this period (September, 1904—July, 1906), the office of the Dawn Society and the Dawn Magazine was at 22 Sankar Ghose Lane, Calcutta.

SPECIAL FEATURES OF THE MAGAZINE.

The *Dawn* in its second phase introduced several special features, such as *Indiana*, *Topics for Discussion*, *Students' Section* etc. The journal's aim was purposively reformist and propagandist. The slogan of the magazine became at this stage: "To love the country, one must know the country." As the Editor put it: "At the present day we, Indians, have hardly any real or extensive knowledge about India, its people and its princes. We know almost nothing of the actual condition of the teeming masses in the different provinces, of their social manners and customs, their languages, means of livelihood, religion, education or general character. And where there prevails this widespread ignorance about each other's concerns in a community, it is idle to expect that there should be any effective bond of sympathy or unity among its members. All our present unity is because of our living under a common administration, which, however, in our case, is not a growth from within, but a structure imposed from without. Hence this sort of life requires to be strengthened by a strong internal unifying force such as is likely to grow among us from a more intimate acquaintance with each other's actual wants and conditions in life." It was, therefore, intended by the Editor that the *Indiana* portion of the Magazine should be devoted to articles on things Indian—its provinces, peoples, princes and nobles. This portion, the first in the new series, remained a permanent feature of the Magazine down to November, 1913. Among the writings published in the *Indiana* section during September, 1904—July, 1906, Haran Chakladar's serial papers on "Bengali as Spoken by the Bengalis" (September, 1904—January, 1906) as well as his article entitled "Fifty Years Ago: The Woes of a class of Bengal Peasantry under European Indigo-Planters" (July, 1905) deserve special mention. Among the unsigned writings from the pen of the Editor himself, published during this period, "Principles of the Swadeshi Movement: Its Influence on the Indigenous Cloth Industry" (November, 1905), "The True Character of the Boycott in Bengal," "The True Character of the Swadeshi in Bengal" and "Prospect of the Swadeshi" (March, 1906) were outstanding contributions. Many unsigned articles written by the *Dawn* students were also published in this section.

Apart from *Indiana*, there was another very important section devoted to *Topics for Discussion*. This was the second part of the Magazine and included "short paragraphs on important national

subjects, not political, presented to readers as *Matters for Discussion*." We learn from Mr. Chakladar that this section usually contained the thoughts of Satis Mukherjee, but not infrequently writings from other leading celebrities of India and abroad were presented to the readers for debate and discussion. This section had the great merit of focussing attention on the more important aspects of modern problems.

The third important section was the *Students' Section* which contained, first of all, the writings of recognised members of the Dawn Society in its two weekly classes. The English portion of this section contained writings of members of the General Training Class, while the Bengali portion published writings of members in the Moral and Religious Training Class. This *Students' Section* was introduced as a regular feature of the Dawn Magazine in September, 1904.

But several months later, a Correspondence Column was opened under this section for the students alone. In response to a suggestion from Bhanushankar Manshanker Mehta of Bhavnagar, Gujerat, a Students' Correspondence Column was started. In the July (1905) issue several questions from Mehta were published, inviting students to offer solutions. The Editor in the same issue exhorted the students throughout India (whether subscribers or not) to utilise the magazine as a common medium for exchange of thoughts and views (*Dawn*, July 1905—Part III, pp. 63-64). The Editor's call was at once responded to from diverse parts of India by the students who began to take a keen interest in the magazine. Among the students who participated in this Correspondence Column during July, 1905 to July, 1906 the names of Popatlal Govindlal Shah (Ahmedabad), Bhabani Charan Mitra (Patna), Kripashankar Prabhashankar Acharya (Kathiawar), Haripada Ghoshal (Tamluk, Bengal), H. H. Maniar (Kathiawar), Hari Raghu-nath Bhagvat (Poona), Rajendra Prasad (Saran, Behar), Rabindra Narayan Ghose, Kishori Mohan Gupta, Surendra Nath Das Gupta (Calcutta), G. Krishan Poti (Trevandrum), Satis Chandra Guha (Barisal, Bengal), Venka Swami Rao (Chittoor, Madras Presidency) may be picked out as the more important writers. The *Dawn* thus offered a platform to the Indian students for mutual exchange of views. The students throughout India were invited to suggest important and useful questions for discussion and to provide answers to the questions. The questions were usually set on Indian topics of national or social importance. The main object of these questions and answers was to enable the Indian students to come nearer one another through the medium of the Magazine and increase knowledge of each other and of the country. Maximum freedom was allowed to students in the matter of framing questions, but the Editor reserved the right of disallowing questions which in his opinion were "of a purely abstract nature" or "of a technical character" or would not serve "any practical or useful purpose." (*Dawn*, November, 1905, Part III, p. 8).

In its second phase (*September, 1904—July, 1906*) the magazine became an all-India influence and rose very high in the esteem of thought-leaders of the country, as is borne out by the numerous reports published in it. Its subscribers were drawn from different parts of India such as Calcutta, Travancore, Gujerat, Baroda, Tanjore, the Punjab, Vizagapatam, Behar, Poona, Ahmedabad, Madras and Bombay.

During the same period, the *Dawn* rendered several other memorable services to the country. From September, 1904, it began to encourage discussions on and researches in economic topics and values. Satis Mukherjee himself wrote (in the period following September, 1904) numerous articles on economic topics and tendencies and he inspired his pupils with his characteristic research-spirit and guided them quite creditably in that direction. The Editor made it a point to publish facts and data about the economic conditions of contemporary India, both rural and urban. Well-written articles on trade and industry, banking and commerce, agriculture and population frequently found a prominent place in the *Indiana* section of the *Dawn*. Statistical reports as well as facts and figures about economic life were always realistically approached and published in the Magazine. The readers were thus used to "objective, quantitative and statistical conceptions" of economic movement and morphology. So far as Young Bengal was concerned, Satis Mukherjee functioned as one of the early *Gurus* of economic researches during the first decade of the present century. Public attention to this important aspect of Mukherjee's life has been repeatedly drawn by Benoy Sarkar in his *Bādīr Pathe Bangalee* (Cal. 1934), *Creative India* (Lahore, 1937) and other publications, as well as by Shib Chandra Datta in his scholarly publication, "*Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought*" (Calcutta, 1934).

The *Dawn* as an organ of the Dawn Society functioned effectively during September, 1904—July, 1906. The Dawn Society continued to exist till the earlier part of 1907, but between September, 1906 and the dissolution of the Dawn Society, the Magazine was only formally the Society's organ ; it materially became a mouthpiece of the resurgent Bengal in its economic and cultural aspects. After July, 1906, the patriotic and national character of the Magazine became conspicuously prominent. It was openly and directly employed in the dissemination of ideas and schemes of National Education under national control. Considering this, the third phase of the Dawn Magazine may be said to have started not from early 1907 after the formal dissolution of the Dawn Society, but from September, 1906 when the National Council of Education was functioning in full vigour and overshadowing the Dawn Society.

THE THIRD PHASE OF THE 'DAWN'

The *Dawn* in its third phase approximately covered a little more than seven years (*September, 1906—November, 1913*). The first important

change was the transformation of the bi-monthly magazine into a monthly organ. From September, 1906 down to November, 1913 *The Dawn and Dawn Society's Magazine* was published almost regularly as a monthly journal. The only four months when the Magazine was not published in this period were November-December, 1907 and November-December, 1908. The office-addresses of the Magazine during this whole period were, in order of sequence : (i) 191/1, Bowbazar Street, Calcutta (September, 1906—May, 1907), (ii) 166, Bowbazar Street, Calcutta (June, 1907—October, 1909), (iii) 12, Lall Bazar Street, Calcutta (November, 1909—April, 1911), (iv) 8/2, Hastings Street, Calcutta (May, 1911—November, 1913).

The second important change was that the *Dawn* developed into a full-fledged organ of Indian nationalism in its broadest sense. The cultural aspect of this nationalism, in which Mukherjee himself was more interested than in anything else, naturally received greater prominence than the economic or political. During 1906-1908 the *Dawn* was, above all, a most powerful organ of the National Education Movement in India. The Magazine published regularly detailed notes and news as well as critical essays on the prospects and progress of the National Education Movement in the country. The movement was not confined to Bengal alone, but overstepped its boundaries. In Bombay, Madras, Gujerat and the Punjab it roused numerous men to have National Education under national control. The *Dawn* was functioning as a most powerful force in the intellectual world of India. Even outside India, the influence of the *Dawn* was felt in many quarters—in Switzerland, England and America. The number of its western subscribers rapidly increased at this stage. For a historical study of the National Education Movement in our country during the first decade of the present century, the issues of the *Dawn*, particularly for the period of 1906-1908, are invaluable aids. Benoy Sarkar's article on *The National Council of Education—and National School at Malda—in Bengal* (*Dawn*, August, 1907) is a most valuable historical document of the Swadeshi days. It at once drew the notice of Aurobindo Ghosh and Bepin Pal who commented on it in editorial articles of *Bande Mataram* and *New India* respectively, during August—September, 1907.

The economic studies and investigations were continued in the *Dawn* during this period as in the previous phase, but major attention was gradually concentrated on historical researches. It is not perhaps generally known that Satis Mukherjee was one of the most energetic and vigorous research workers in ancient Indian history. His historical papers, published in the *Dawn*, were numerous. He also inspired his pupils to carry on intensive researches in historical topics. From 1909, the *Dawn* became virtually a journal for the publication of historical research-papers. In quality as well as in influence the journal achieved the height of success. Late in 1908 he had withdrawn from the Bengal National College and devoted himself whole-heartedly to his old magazine, the *Dawn*.

Krishnadas Sinha Roy, one of his young pupils, was chosen as his personal assistant. Satis Guha, another pupil, was appointed manager of the Magazine.

The *Dawn* throughout its career since March, 1897, had functioned as an organ of patriotic propaganda. Nevertheless, the patriotic character of the Magazine became more pronounced during 1904-1908. But the height was reached during 1909-1913. It became one of the most eloquent exponents of nationalism and patriotism in India. Its circulation further increased and its appeal spread in different parts of India and beyond the seas. The distinctive character of Indian civilisation was constantly stressed and the achievements of the ancestors in mental and material progress were frequently displayed in the pages of the Magazine. Its articles on Indian creations in trade and commerce, art and industry, education and society, architecture and music as published during 1909-1913 belong to an exceptionally high category of scholarship. The Editor himself was as ever the most prolific contributor to the journal on a variety of topics.

The *Dawn* was at its best in its final phase. Its services to the nation in this period were something which any institution can be proud of. Its contribution to the enrichment and expansion of historical scholarship deserves the highest recognition. The old pupils of the Dawn Society were some of the best writers of the journal at this stage.

Radhakumud Mukherjee contributed several historical papers of which "The Wonderful Unity of India: A Deeper View" (January, 1909) was the most illuminating. Brilliantly written with a historian's outlook, the paper was a contribution to Indian nationalism and was intended to stimulate the spirit of Indian nationalism by drawing attention to the fundamental unity of India in the midst of her immensity and variety. And that unity, argued the author, was not wholly the product of British rule, but had a proud heritage behind it. In a revised form the paper was subsequently published as a brochure entitled "The Fundamental Unity of India" (London, 1914), with an Introduction by J. Ramsay MacDonald, M.P. As a historical study of Indian nationalism the book is still valued by scholars.

Rabindra Narayan Ghose, another brilliant pupil of Satis Mukherjee, contributed several historical papers, each giving proof of the writer's deep study and careful thinking. His papers on "India's Literary Wealth: A Connected Story of Her Libraries from the very Earliest Times Downwards" (April to June, 1909 and January, April, 1910), "Indian Nationalism and Indian Art" (May, 1910), "Indian History and Indian Nationalism" (October-November, 1910), "Indian Civilisation and Indian Nationalism" (December, 1910) and "The Civilisation of Northern India: A Contribution to the Study of Hindu-Moslem Relations" (May to July, October and December, 1911) are remarkably illuminating and can still be

regarded as documentary contributions to Indian historical scholarship as well as to Indian nationalism.

Haran Chandra Chakladar, the seniormost pupil of the Dawn Society, made during this period (1919—13) some historical contributions the value of which is only now being properly understood. His papers on "Maritime activity and Enterprise in Ancient India : Intercourse and Trade by Sea with China" (May-August, 1910, February, May, August-September, 1911 and February-March, 1912) and "Ship-Building and Maritime Activity in Bengal" (September-October, 1910, January, March-April, 1911 and September, 1912) were not only outstanding contributions, but pioneering works on the history of Greater India. Chronologically, these writings anticipated Radhakumud Mukherjee's "History of Indian Shipping and Maritime Activity" (London, 1912) and had long been predecessor to Dr. Ramesh Chandra Majumdar's "Champa" (1927). These articles had at that time attracted the serious notice of scholars. In the leading editorial article of the *Indian Mirror* (June 5, 1910), the first of these two serial articles from Chakladar's pen was highly spoken of. The second article attracted the notice of Prof. Vidhushekhar Shastri whose controversy with Chakladar illustrates the kind of reaction that the latter produced on contemporary Bengali scholarship.

The most precious of all writings in the *Dawn* at this stage (1909-13) was Satis Mukherjee's monograph on "Swadeshi India or India without Christian Influences" (July-November, 1909, January-April, July-August, November-December, 1910). It was powerfully conceived and boldly executed. The mass of facts employed to substantiate his proposition as well as the method of analysis, was indeed superb and incisive. The greatness of Indian culture or civilisation before Christian influences was the main thesis of Mukherjee on that occasion. This monograph of Mukherjee is one of the best writings contributed by Indian scholars to historical scholarship at the beginning of the present century. India's nationalism and patriotism were powerfully fed and encouraged by this and other writings of Mukherjee during this period.

In connection with the visit of George V to India and the shift of the capital from Calcutta to Delhi (December, 1911), the India Government made a declaration of their policy of modelling the New Delhi buildings on the European Renaissance architectural style. The Indian architectural tradition was flatly disregarded by the Government. This provoked sharp criticism of the Government policy from the Indian press and platform. Non-Indian lovers of Indian art and architecture also raised their voice of protest against the India Government's move. In the opposition, thus organised, Satis Mukherjee as the Editor of the *Dawn* took a leading part. His article on "Wanted a New Policy : The Government and Indian Craftsmen" (February, 1912) powerfully pleaded for the acceptance of Indian claims of architecture in the construction of the

New Delhi buildings. He criticised, in a like manner, the India Government which had been "quite unsympathetic to Indian art-traditions." The *Dawn* since then became a mighty vehicle for the propaganda of Indian art-ideals and Indian architectural traditions. The Editor was in constant touch with Dr. A. K. Coomarswamy, Mr. E. B. Havell, Major J. B. Keith and other recognised authorities on Indian art and architecture. Their numerous articles and papers bearing on Indian art-traditions, which were published in the *Dawn* during 1912-1913, created a stir among scholars and Government officials both in India and England. In a letter to the Editor, Major J. B. Keith condemned the India Government's plan of accepting the European architectural style for the buildings at New Delhi as "a projected act of vandalism, the worst I have known in India." Keith wrote further in that letter (*Dawn*, January, 1913) : "My devout hope is that Government will reconsider this before it is too late, for it is deceived on the subject. And I hope every lover of a beautiful, traditional and living art such as we have in India will enter a righteous protestation. No other country that I am aware of in the East has a traditional Art, nor in the West either. It would be a flagrant injustice to the Native Architect and to my old friends the masons and craftsmen, and a fine illustration of the extent to which Europeanisation is being carried." The movement in favour of a better recognition of Indian art and architecture by the Government of India soon assumed remarkable dimensions and behind that movement there were none more active than Satis Mukherjee, J. B. Keith, E. B. Havell and A. K. Coomarswamy. This movement produced tremendous reaction even in England and was accelerated by the London *Morning Post*'s advocacy of the claims of Indian Craftsmanship (*Dawn* : March, September-October, 1913) in the contemplated building-constructions at New Delhi. In view of this tremendous agitation in the country, the India Government had to revise its policy in favour of Indian art-traditions. The buildings at New Delhi constructed since 1912-13 owed their ideological planning in part, at least, to the constructive criticism and suggestions of the Editor of the *Dawn*.

“As Civilization Advances Poetry Declines”

KARUNASANKAR ROY—Fourth Year English.

IT is Macaulay who made this startling statement. The statement means that poetry cannot thrive in a civilized world, that when we were getting civilized through all these centuries our poetry was actually on the decline. The statement, while it means all that, implies much more. It implies that poetry is going to be extinct. How shocking! But before we agree with Macaulay, it is necessary to examine the validity of the premises that warrant such a grim conclusion.

We should know first of all what civilization is. It is, as Clive Bell says, the means to the good states of mind. It also implies reformation and recreation of social values, if and when necessary. Now when civilization means all that, it is difficult to imagine how its advancement signifies the decline of poetry. Poetry is the expression of certain primary emotions which have nothing to do with civilization. They were there ten thousand years ago; they still exist and they will be there ten thousand years later. Thus hopes and disappointments, joys and sorrows were there in the past and will be there in the future. And so long as primary emotions will be there, poetry will continue to exist.

If we turn to the past, we shall find numerous historical events confirming it. Poetry is not the antithesis of civilization. Thus, in the Elizabethan era when we find new learning pouring in, new discoveries taking place, in other words, when we find the advent of a great civilisation backed up by material prosperity, we also find brilliant efflorescence of poetry. There was Marlowe, there was Spenser, and above all there was the Titan, Shakespeare. If, indeed, the advancement of civilization implies the decline of poetry, Elizabethan period should have been barren. But it was not so. And it had not been so at least in the case of another civilization. In the 5th century B.C. Athens was at the height of material prosperity. Marathon had given her fame and renown in the Hellenic world and Salamis did the rest. It gave her a rich civilization. If we turn to the literature of the period, we are certainly not disappointed. Aeschylus, Sophocles, Euripides were dramatists and great poets, too.

Is Macaulay's saying then to be rejected? Are we to regard it as an empty, categorical assertion with no logic behind it? Perhaps not. The author of the statement must have had some reason, though it may

be assailable. By poetry, possibly, he means a particular species which is born of a sense of wonder and is nursed by crude beliefs. And if poetry means that and that alone, then Macaulay is justified.

In ancient poetry there was wonder. The ancient man could believe that gods lived on the Olympus, that like men they had their quarrels too and that to settle their disputes they had to invite human beings. Hence the ancient Greeks could figure Pan by the woodside on a summer noon trolling on his pipe until he charmed the hearts of upland ploughmen. Hence they could think of Iliad, of Helen's face that launched a thousand ships and burnt the topless towers of Ilium. This sense of wonder gave birth to magnificent imaginative poetry. The ancient man was credulous. Hence he could believe Alcestis' return from the underworld or could think of a Prometheus stealing fire from heaven, and fighting for man against the might of Jupiter. If we turn to 'Macbeth' we find the same old truth repeated. The story has a stormy background of strange and mysterious highlands where the weird sisters dwell. This element of wonder that we find in the setting produces in its turn marvellous imagination. In 'Othello' again, when the hero describes his adventures on sea and land, we find once more a brilliant masterpiece of rich and virile imagination. Here, too, at bottom lies the sense of wonder that is roused by the land of the Anthropophagi, of men whose heads do grow beneath their shoulders.

As civilization advances, this wonder declines. Thus the imaginative splendour is lost. Reason replaces old beliefs, and man puts everything to the severe test of reason. The startling discoveries of science help man in the execution of the test. And what had so long been the crude beliefs of a preceding age now collapse before the severe scrutiny of the modern man. The modern man no longer believes in the weird sisters and his whole civilization induces him to regard Hellenic stories as myth. Thus, what appeared vast and hence, strange and mysterious to our predecessors, is now reduced for us to a finite stretch of time and space. We know it, every bit of it,—we know it well and too well perhaps. Hence, though the Atlas mountain is still there, Shelley's Atlas has flown from our midst. If our ancient forefathers were extremely credulous, we are all born sceptics. That is why the poetry that had its roots in wonder is practically non-existent in the modern times. And that is why the works of epic grandeur that were produced in primitive times cannot be expected to be written again in an age when the ever-swelling tidal wave of civilization is destroying old beliefs and wonder. Modern poetry is written about familiar objects. We know them closely, we know them well. Hence it lacks that imaginative splendour which was of the essence in the primitive times.

To conclude, if we mean by poetry one of its special kinds, Macaulay is right. But poetry is not all wonder. Poetry must keep pace with our

life. And it does so in modern times. T. S. Eliot thus expresses the despair, the deepening sense of frustration in his "Waste Land". Indeed our life is bleak and barren, presenting a dismal spectacle of a sad and lamentable waste. "Waste and void, waste and void and darkness was upon the face of the deep". Thus modern poetry has its roots firmly planted on the earth. Poetry is, as Arnold says, the criticism of life under the laws fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. Now the laws fixed for such criticism are not the old ways of the past, but they are laws all the same. And that is why Macaulay's words hold good no longer.

Mirza Raja Jai Singh—A Forgotten Rajput Statesman

BARUN DE—*Fourth Year History.*

THE Rajput state of Jaipur has seldom conformed to the usual standards of Rajasthani statecraft, standards which have grown up round the tales of folklore and balladry, which James Tod has so admirably retailed in his "Annals and Antiquities of Rajasthan" and on which a number of Bengali authors like Rangalal, Madhusudan, R. C. Dutt, Rabindranath and finally, Abanindranath have drawn. Their typical Rajput has, by now, become almost a mythical figure. He is represented as an intrepid warrior possessing a self-effacing loyalty to tradition and principle; scrupulous to the core, he seems to be devoid of cunning and deceit. In fact, instances may be cited where Rajput princes have wasted opportunities of getting the better of the enemy, simply because they thought it was not the right thing to do. This idealized portrait bears a remarkable likeness to that of their predecessors, the Kshatriyas of the Mahābhārata, or in fact, the Knights-errant of the Middle Ages with whom the medievalist romantic Tod almost certainly compared his heroes.

The rulers of Jaipur of the Kacchwaha clan are, however, as Dr. K. R. Qanungo has remarked, unlike their compatriots, proverbial for their unwarlike nature. This statement should not be taken as an imputation, but may in fact be explained by their environments. Unlike the more liberty-loving Mewar or Marwar, Jaipur or Amber, as it was known in the Mughal Period, has been endowed by nature with an indefen-

sible terrain which enabled the sovereigns who held Delhi and the Jumna Doab to overrun her territory with ease. This explains why there are few sieges of Amber like the famous sacks of Chitor. The rulers of Amber had nothing for it but to play second fiddle to the Agra rulers, and the Deosa Interview in 1562 between Beharimall of Amber and the young Akbar marks the beginning of a long *entente* between them and their successors. This would explain why we find no prominent mention of a Rajput prince on the roll of great Rajasthani patriots.

But their peculiar situation made the princes of Amber as good statesmen as soldiers. Though, perhaps, no match in valour for their compatriots of Bundi and Marwar, they possibly knew the art of war better, serving as they did all over India under the Mughal colours. The pliancy of her rulers enabled them to aggrandize steadily their territories by keeping in the good books of the Emperors, while their more chivalrous and nationalistic compatriots kept themselves fruitlessly aloof.

This essay tries to give some account of one of the greatest Amber princes, one who so represents the characteristics which have been described that he might almost be compared with Brasidas who, according to Thucydides, was so un-Spartan, but yet the best Spartan of them all! A mighty captain and a consummate statesman, he was one of the major moderating influences in the reign of Aurangzeb, and it would be no exaggeration to say that with his death and that of Jaswant Singh one of the main checks on the monarch's fanaticism was removed.

Jai Singh I, given the title of Mirza Raja by a grateful emperor, came to the throne in the closing years of Jahangir's reign on the death of his worthless cousin, Maha Singh, who had succeeded his equally worthless father, Bhao Singh. Bhao Singh's father was the great Man Singh—perhaps, the greatest of all Rajputs including even Rana Pratap—whose career deserves a monograph entirely devoted to it. After his death, much of Amber's fame had suffered a diminution, thanks to his degenerate offspring, and it was at a very low ebb when, in 1625, Jai Singh came to the throne, destined to raise it to a pinnacle of glory. An interesting anecdote about him when a lad of eighteen, narrated by Tod in his Annals, gives us a glimpse into the control which the Mughal harem in those days exercised over the investiture question. According to Tod, there were several claimants for the *gadi*, and Jahangir threw his power in favour of the grand-nephew of Man Singh only on the advice of Jagat Gosain, his Rathor consort. When Jai Singh went to perform obeisance for the investiture, the emperor directed him to the Rathorni, for she, he said, was his benefactress. But the punctilious Rajput refused to offer *salaam* to Jagat Gosain, as it ill became one of princely birth to bow before a fellow-prince's daughter. "It matters not," cried out the good-natured princess, "I give you the Raj of Amber". The story might be inaccurate and anachronistic, but it is illustrative.

As regards bravery, Jai Singh made his mark early in the reign of Shah Jehan. The young prince, Aurangzeb, was once attacked at a show by a mad fighting elephant and although he encountered it bravely, he would probably have been killed, had not his brother Shuja and the Raja galloped up amid the general confusion, the latter putting the monster to flight with his lance. His first venture, worthy of note, was with the ill-starred expedition which Shah Jehan sent to fulfil his "famous but fatuous" idea of reconquering the ancient Timurid dominions of Balkh and Badakshan. The expedition bears a remarkable resemblance in motives and difficulties to the British army in the First Afghan War. Aurangzeb's army, though it fought bravely, found its supply lines cut off and had to fall back as precipitately as the British army which retreated to Jalalabad in 1840. The Amber Raja played a prominent part in covering the retreat and bringing his troops out of the passes of the Hindu Kush. He certainly handled them better than Elphinstone and the rest of the British generals in 1840.

We next hear of him at the beginning of the fratricidal wars of succession at the close of Shah Jehan's reign. The prince seems to have been high in the imperial favour, for he and Dilir Khan Ruhela were appointed advisers to the son of Dara Shukoh, the young prince Sulaiman Shukoh who was sent to quell the insurrection of Shah Shuja who had been marching on Agra with the Bengal army and the "nawara" (navy). Although Sulaiman was the nominal commander, "the real power", says Sir Jadunath Sarkar, "lay in the hands of the politic and experienced Rajput chief, Jai Singh". The first adjective sums up the situation well, for although Shuja was checked at Bahadurpur on the Ganges, Jai Singh must have divined which way the wind blew. We do not know when he left the army of Sulaiman and transferred his valuable allegiance to the rising "Southern Light", Prince Aurangzeb, but he managed to keep the Amber contingents out of the well-known battles of Dharmat, Samugarh and Deorai. He was, however, detached later by the new Emperor to pursue Dara out of India and, if possible, capture him. Jai Singh revelled in this type of campaign. He hung on to the fleeing prince's flanks—he possibly did not want to imprison a man whose salt he had partaken of. But Dara had no way of getting rid of the Raja, and was driven unceremoniously out of India into Sind, only to be betrayed later on by Malik Jiwan. During the pursuit occurred what, according to Sarkar, was "a most remarkable feat", that of crossing the Great Rann of Cutch in record time with an already worn-out army. The Jaipur Raja's diplomatic manoeuvres are as remarkable in this period as ever. The Mirza Raja's son, Ram Singh, was instrumental in making the hill chiefs of Kangra give the young prince Sulaiman Shukoh up to the tender mercies of the Emperor. Jai Singh himself helped Aurangzeb greatly, by weaning from his rival side many powerful Rajput chiefs—principally,

the doubly treacherous Jaswant Singh of Marwara. Of course, had Dara become Emperor, his manifold defects might have as soon brought the Empire to downfall, but, as Sarkar and Datta point out, it is an open question whether Jai Singh and Jaswant did not themselves pave the way for the Rajput War of the '70s by strengthening the cause of Aurangzeb, when the combined Rajput support might have helped the eclectic Dara on to the throne. Cautiousness in their case certainly did not have very fruitful results.

His successful encounters with Shivaji won for Jai Singh a premier position in Indian history. The Raja, besides perhaps Zulfiqar Khan,¹ the Ulysses of the succeeding reign, was among the few diplomats serving the interest of the Mughals who were able to beat the Mahrattas at their own tactics ; his ultimate failure in no way detracts from the glory of his victory and virtual capture of Shivaji. After the War of Succession, he was engaged in minor campaigns—he once withdrew his contingent on Imperial service from the borders of the Santal Parganas, refusing to proceed against Shuja who was still fighting a losing game against his brother. Mir Jumla now took up the attack. Jai Singh's appointment was perhaps a rebuff to Jaswant Singh, who had failed miserably at Poona, and is an instance of the eternal Rathor—Kacchawaha² rivalry. It reflects all the more credit on the Mirza Raja that the sole command of the army was given to him and Aurangzeb did not indulge in his love of "duality of power" to which may be partly attributed the failure of the Mughals against the Mahrathas. In the Deccan campaign Jai Singh followed the policy of "divide et impera". The western part of the Deccan was in those days comprised of the kingdom of Bijapur and the hilly Maratha country, besides which there were some patches of territory, ruled by petty Maratha princes like the Morés of Javli. Shivaji had consolidated his power by putting down these chieftains, mainly by a politic mixture of force and fraud, and they, in turn, rallied to the Mughal cause. It redounds to Jai Singh's credit that he was able to find this weak spot in Shivaji's armour. Bijapur had been marked out for conquest by Aurangzeb since the days of Shah Jehan, but it stood too much in dread of Shivaji's policy of aggrandisement to lend him a helping hand. It is certain that an *entente* between the Marathas and the Muslim powers of the Deccan would have wrecked the southern ambitions of the Mughals, considering the past records of the latter ; but, as it was, the Maratha-Bijapur rivalry was the key-stone to Jai Singh's activities in the south.

¹ Zulfiqar Khan, a Mughal noble in the later years of Aurangzeb's reign, first became prominent for his methods of fighting the Marathas. In an age when huge Mughal armies were cut up by the mobile Maratha columns, he employed the guerilla tactics of warfare to combat their light cavalry. His capture of Jinji is one of the main Mughal triumphs in poliorcetics. Zulfiqar later, became almost the king-maker in the reigns of Bahadur Shah and Jahandar Shah, and met a violent end.

² Kacchawaha is the clan name and must not be confused with Kacchwara which is the tract of territory they inhabited.

Instead of dissipating his military strength in a futile struggle against the Maratha guerilla bands, Jai Singh decided to seize the nodal point of the far-flung net of Maratha fortresses which crested the Western Ghats. He invested Purandar where Shivaji's family and treasures were kept, and formed a base six miles away at Saswad. It enabled him to keep his supply lines intact, send foraging parties into the Maratha territory and also 'mask' the Bijapur border. We see that his plan of campaign was more enlightened and paying than that of his predecessors who would sit down in Poona and angle for bribes from the enemy. To capture Purandar was difficult, but the Maharaja cordoned off the entire fortifications and set the Mughals and Bundela warriors under Dilir Khan Ruhela to batter their way upward. This "attrition" policy was bound to succeed and Shivaji, faced with the dishonour of his family and finding the Mughal pressure on his territory intolerable, decided to avoid a total wreck by capitulating before his entire army was decimated. His interview with the Maharaja³ has been made much of, and was indeed a triumph of diplomacy for the latter. By the Treaty of Purander concluded in 1665, Shivaji agreed to give up twenty-three of his forts and send his son with a contingent of 5,000 horse to Agra in return for being allowed to keep a few forts. By a second clause, Shivaji was to be permitted to conquer a lowland tract of the Konkan and the western highlands of Bijapur (Balaghat Bijapuri) for which he would have to pay 40 lakhs of *hun* (2 lakhs of rupees) to the Imperial Treasury. Jai Singh dilates on the merits of this clause in a despatch to Aurangzeb: "This policy will result in a three-fold gain: *first*, we get 40 lakhs of *hun*; *secondly*, Shivaji will be alienated from Bijapur; *thirdly*, the imperial army will be relieved from the arduous task of campaigning in these two broken and jungly regions as Shiva will himself undertake the task of expelling the Bijapur garrisons from them." This shows that the Mughals regarded the defeat of the Marathas merely as a stepping stone to the conquest of Bijapur.

Shivaji himself accompanied the Imperial army with a large contingent on its somewhat unjustified march into Bijapur. The Maharaja had once again flung his diplomatic net of bribery far and wide among the higher classes in Bijapur, but though many did take the bait, they in fact played false when he appeared before the walls of the capital. Secure in the hope that most of the Bijapuri subjects would come over to his side, Jai Singh collected a vast army on his own liability, as Aurangzeb had been trifling about sending him money, and did not even wait for his siege guns. The

³ Ramesh Chandra Dutt in his 'Maharashtra Jeevan Prabhat' has given a fanciful account of this interview. Both the Mirza Raja and Shivaji are made to bandy high-sounding nationalistic jargon, highly anachronistic with the real circumstances. But the author has given a vivid picture of the Raja as a typical Rajput with a flowing white beard, and majestic appearance. An authentic picture of the Mirza Raja was displayed in the Annual Exhibition of the Royal Asiatic Society of Bengal in 1951 by Mr. S. K. Saraswati. It is an 18th century painting, and is said to be "characteristic of his forceful personality".

forts of Phaltan and Mangalvidé fell in the first shock, and though some detachments of the enemy did not come over to his side, Jai Singh soon found that he had to deal with a "people's war"; for, when after several skirmishes he arrived within 12 miles of Bijapur, he found the environs ruthlessly laid waste and the city put in a state of defence with 20,000 men in it, while another army under Sharza Khan and Siddi Masaud was ravaging the Mughal *subha* in his rear. Only the missing siege-guns would have done the trick, and Jai Singh had perforce to retire if he would keep his supply-lines intact. That day, 5th January 1566, marks the end of the ever-successful Amber Raja's career. The retreat presented the sight of a shambles, for the unwieldy Mughal army was harassed on the flanks and the rear by the mobile, though small, Bijapuri host, and gave a foretaste of Deccan military operations in the years to come.

The Maharaja returned to Aurangabad to find another blow awaiting him, for he had prevailed on Shivaji to visit the Imperial Court at Agra partly at Aurangzeb's command, and partly because he had fears about Shiva's life, when he thought of the disaffected Mughal soldiery who attributed their disaster to Maratha treachery. The treatment of Shivaji at the hands of the Emperor is well known. Jai Singh had given his word of honour to Shivaji that he would not be ill-treated, and there is reason to believe that he was helped in his subsequent escape by the Maharaja's son, Kunwar Ram Singh, in restitution of his father's word. At any rate, Aurangzeb took this view of the matter and sent the Kunwar in disgrace to the operations in the pestilence-ridden Assam. The charge might have been true, for a Rajput chief of those days seldom hesitated to redeem his pledged word, even by foul means. But the Maharaja asserted with politic vehemence in his despatches that he knew nothing of the escape and let out a flood of invectives on the helpless Shivaji. He was even busy propounding further schemes of tricking the Maratha into captivity again. But Jai Singh had shot his last bolt, and when the Emperor repudiated his vast Bijapur debts, he sank under his calamities and died, perhaps, of a broken heart and over-work at Burhanpur in 1667. Even his death is a matter of controversy, for Tod would have it encompassed by his own son, Kirat Singh, at the instigation of the ever-malevolent Aurangzeb; Kirat Singh on the other hand believed that his father had been poisoned by his favourite secretary Udairaj, who would have been beaten to death, had he not apostatized—this form of escaping punishment being favoured by the Emperor at this time. Kirat Singh is, however, depicted by contemporary sources in a favourable light, and Rajput bards too often explain deaths by parricide or other foul means even when there is no supporting evidence.

This recital of dry facts might have made the reader think that Jai Singh's achievements were no higher than those of a mere campaigner possessing little or no culture. All contemporary chronicles militate

against this view. He greatly embellished and expanded the palaces of his capital city—though it was left to his descendant Sawai Jai Singh and a Bengali called Vidyadhara to build the model city of Jaipur—and was also a lavish patron of the arts. He followed the tradition of Hindu-Muslim cultural *rapprochement* among the higher classes, initiated by Akbar and Mirza Abdur-Rahim Khan-Khanan, and was equally at home in Persian and Arabic. He was a good letter-writer as is attested by his recently-discovered despatches to Aurangzeb, the *Haft-Anjuman*, which are distinguished for their polished style and force of diction. As a matter of fact, we do not hear of his cultural activities, only because his campaigns were long and frequent.

Jai Singh's character was a peculiar mixture of nobility and baseness. That he was brave is beyond doubt—he once led a storming party over the walls of the fortress of Mhow. Coupled with this bravery is also an extraordinary astuteness, a power "to humour and manage the various Rajput clans and make all obey the will of a common head," which makes him one of the greatest captains of the age and in his own race places him on the same plane as Rana Sanga and Raja Man Singh. Jai Singh had the eminently Rajput trait of arrogance examples of which have been furnished above.⁴ But though honest in all his personal dealings, Jai Singh was politically unscrupulous and unlike the ordinary Rajput, never hesitated to play the traitor to gain his own ends. He lays his heart bare in his despatches, where he describes all the promises which he never intended to keep, *e.g.*, his promise to wed his daughter to Shivaji in order to lure the Maratha into his clutches. He would compliment a man with honeyed words, and then heap filth on him behind his back. Money was, to his corrupt mind, verily the sinews of war.

But we must not judge Jai Singh solely by our standards. He grew up in a court where fraud and chicanery thrived and were employed as legitimate means of gaining one's ends. Jai Singh cannot be blamed for fighting his enemies on their own ground. If he had not been as diplomatically deceitful as he was, his lot would have been that of his contemporaries, the noble-minded and yet idle Ranas of Mewar, Karan Singh and Jagat Singh. Jai Singh was the child of his age, and ought to be judged by the standards of that age, though not completely excused. We ought also to remember that while he lived the Emperor did not dare to vent his spleen on the Hindus, and it was two years after the death of Mirza Raja that he released his anti-Hindu legislations, which ended in

⁴ Tod tells a story of the Mirza Raja in his cups, holding two glasses of wine in his hands, and while crushing one, vaunting "Here goes Satara ; I hold the fate of Delhi in my hands and can deal with it in like manner." Tod has blundered into his usual inaccuracy, for Satara was the Maratha capital long after Shivaji's time, but Jai Singh seems to have had an inflated opinion of his power in the Mughal empire. The hollowness of the vaunt is all too patent.

undermining the strongest pillar of Mughal rule in India, the willing co-operation of the Rajput races. The whole life of Jai Singh of Amber is an appropriate commentary on that principle of co-operation.⁵

Lingering Imperialism

MIHIR KANTI RAKHSIT—*Third Year Economics.*

THE POST-WAR YEARS have witnessed the revival of the dormant imperialistic attitude of the Western powers as expressed in their frantic efforts to maintain their hold on the colonies and exploit their peoples. During the Second World War the Allies expressed their firm "faith" in justice, equality, fraternity and all that democracy stands for. While fighting Hitler's theory of racial supremacy, they were loud in declaring that they were the true upholders of the doctrine of equality of man and in their liberal promises to the subjugated peoples they kindled hope in the minds of the unfortunate people of the colonies that the cessation of hostilities would usher in their freedom. But after the war, the die-hard imperialists were again seen in their old rôle of exploiting the colonial people and all the assurances and guarantees to the subject millions were thrown to the four winds. Indeed, as an instance of betrayal, the infamous "Munich" Pact pales into insignificance when it is compared with the imperialist powers' betrayal of wartime promises to the colonial people.

ECONOMICALLY EXPLOITED NATIONS

It is true that after the war the imperialists were forced to grant political independence to some countries on account of irresistible popular movements. But the vested interests of the imperialist nations are still playing a major rôle in the economy of these countries, which will be clear on an examination of the trade and industry of the countries that became free from western domination recently. In India the bulk of the jute and tea industry is under foreign control, and the major part of India's trade is also carried on with the Anglo-American bloc. In 1951-52, 42.6 per cent of the total export of India went to Britain and America, while 42.2 per

⁵ I am indebted to Tod's "Annals and Antiquities of Rajasthan" (Crooke's Edition) and to Sir Jadunath Sarkar's larger edition of the 'History of Aurangzeb' for materials for the preparation of this article. All unspecified quotations are from Sir Jadunath Sarkar's work. The quotation in footnote 3 is from the Yearbook of the Asiatic Society for 1950.

cent of the total import came from the same countries. Similar is the case of Ceylon, Pakistan, Burma and other Asiatic countries. Owing to war-preparations of the Western powers, the prices of raw materials have gone up, though this has brought no relief to the toiling masses of the Asiatic countries, as their trade and industry is under the control of foreign companies and banks. In the Middle East and Egypt, under treaties signed under unequal strength of the parties, the western powers are trying to further their economic and political interests. In Persia Britain, through crude tactics, is trying to hinder the nationalisation of the Anglo-Iranian Oil Company. In Egypt, also, the British are trying to dominate the Suez Canal Zone.

MOTIVES BEHIND MAINTAINING COLONIES

But this is not the whole picture. Apart from these so-called free nations, there are still colonies of Britain, France, Portugal, and Holland and these powers are in no mood to give the colonial people the right of self-determination. The conservative element is now dominant in the political arena of these countries after a brief spell of socialist rule, and there seems to be no change in their outlook regarding the colonies. Indeed, they cannot afford to lose their hold on existing colonies for certain important reasons.

The standard of living in these imperialist nations is very high and this cannot be maintained without drawing on the resources of these colonies. The aristocrats, who control the political wheel of these nations, will, therefore, be in a difficult position. For, wherever the imperialists established colonies it became a happy hunting ground for the whole capitalist class of the dominant nations and thus a few whites, constituting only a small percentage of the total population, oppress and exploit vast masses in political as well as economic sphere. As Lenin rightly points out, the imperialists monopolise the colonial industries and resources and treat the colony as a market rather than as a community of human beings. So, as a result of the *laissez-faire* policy pursued by the imperialists, the colony has remained as a source of raw material and a market for finished goods. Thus, the capitalist class will not be able to earn handsome profits without the colonies. As Mr. Hobson (in his book "Imperialism") says, "The chief economic source of Imperialism has been found in the inequalities of industrial opportunities by which a favoured class accumulates superfluous elements of income which, in their search for profitable investments, press ever further afield ; the influence on state policy of these investors and their financial managers secures a national alliance of other vested interests which are threatened by movements of social reforms ; the adoption of Imperialism thus secures the double purpose of securing private material benefits for forward classes of interests and traders at public cost, while sustaining the general cause of conservatism, by

diverting public energy and interests from domestic agitation to internal employment."

The second reason for maintaining the colony is that its raw materials are essential to the Imperialist nations in the production of armaments. Thirdly, the bases of these colonies in Asia and Africa are of great importance to the Western powers to fight communism.

Thus, though the Western powers are proclaiming that they are engaged in uplifting the backward colonial peoples, their real motives are not far to seek and these will become clear if we examine the conditions of the following countries :

THE EAST INDIES

After the war was over, the Dutch, contrary to popular expectations, did not grant independence to the Indonesian people. They tried, in the name of "police action", to continue their colonial rule and exploitation. For, Indonesia has always been a major reservoir of important raw materials. How important it is as a source of raw materials will be evident from the fact that in 1939 it produced more than a third of the world's natural rubber, more than a sixth of its tin, about a fourth of its palm oil and cocoanut products, and large quantities of petroleum, tea, cinchona bark, sisal, kapok, pepper, bauxite, sugar and coffee. Indeed, Holland built its wealth and power on the East Indies to a great extent. It is estimated that the total capital investment in Indonesia before World War II was some four billion guilders (roughly one billion U.S. dollars) about 70 per cent of which was held by the Dutch interests. The investment paid handsome returns which constituted sixteen per cent of the Dutch national income. This explains why Holland was eager to maintain her control in Indonesia and in her efforts to do so she was helped by America who now returned, in the eyes of the Asian people, as one of the protectors and preservers of the colonial system. "American tanks and planes enabled the Dutch forces to carry out their infamous 'police action' and when the United Nations intervened in the dispute, American sympathy for the Indonesian cause was too lukewarm and equivocal to impress Asia in anything more than a pious protestation of an intention already discarded in practice." Thus, through fire and water, the people of Indonesia gained their independence on December 27, 1949 ; but she is not yet completely free from Dutch influence. A part of the East Indies is still under Dutch occupation and the Dutch government is still trying in some way or other to maintain their influence in Indonesia which evoked contempt from the people of Indonesia. This was expressed in an unmistakable manner through mass demonstration and tearing of the flag of the Dutch embassy and it represents the true feeling of all the oppressed people of the world towards their oppressors.

FRENCH AND PORTUGUESE POCKETS IN INDIA

The French and the Portuguese governments, strangely enough, are trying their level best to retain their pockets in India. Seeing the result of the referendum in Chandernagar, the French Government have taken to the tactics of terrorising the pro-merger movement in Pondicherry and other French pockets in India and have created such a situation there that an impartial plebiscite cannot be held. The leader of the pro-merger movement was attacked and similar attacks are being made on other leaders also. Hundreds of persons wanting their destiny to be united with India's had to take refuge in Indian territories for fear of goondas.

Portugal, inspired by the "noble example" set by France, has also created a reign of terror in Goa and other places. Keeping portraits of Indian leaders is prohibited and in some cases these portraits have been burnt down by the police.

INDO-CHINA

Ironically enough, France, known as the motherland of liberty, equality and fraternity, is trying to restore the Bao Dai regime with the help of the American armaments against the wishes of the people of Indo-China. The French government have declared that they are fighting the revolution in Indo-China only because the Nationalist Party led by Ho Chi Minh is communist and that they will hand over the authority to the Annamite Government of Bao Dai. But it is a clear fact that Bao Dai is only an instrument in the hands of the imperialists and if he succeeds, the people of Indo-China will be for years subjected to imperialist exploitation. The motive of French imperialists will be clear from the provisions of the Elysée agreement between Bao Dai and M. Vincent Auriol, the French President, on March 8, 1949 when Bao Dai was staying in France, while the Vietnamese were fighting to drive out the foreign exploiters from their motherland. According to this agreement, Viet Nam is to become an "associated state" which is, in reality, nothing more than a colony under the French Union. Hence in 1950, the Republican Radio of Viet Nam rightly condemned the Elysée agreement as a treaty of treason and demanded a total French evacuation of Indo-China. But the French cannot retreat because of political and economic interests. Indo-China, being situated in the south of China, is essential to the Western powers to stem the advancing tide of communism, and that is why America is so much interested in preserving French domination there. Apart from this political aspect, the economic importance of Indo-China to the French is in no way insignificant. "Indo-China was the third most important exporter of rice in the world. A substantial quantity of rubber and maize was also exported from here. Its wealth lay not only in agriculture but also in minerals and timbers ; it had anthracite coal (most of which is exported),

as well as iron ore, tin, zinc, phosphates and tungsten." For centuries France has dominated trade and industry in Indo-China and earned fabulous profits. As in many other colonial countries, there was over-emphasis on the production of raw materials and foodstuffs for export. Industry was not developed and the French treated Indo-China pre-eminently as a source of raw materials for France and a market for French manufacturers. On the other hand the Indo-Chinese peasant lived in abject poverty, barely able to feed himself. He suffered under a grinding burden of debt as he had to pay as much as one-fifth of his meagre annual income to the government in order to keep the huge administrative machinery of the French moving. Yet the Indo-Chinese contribution to French prosperity is not small. During World War I, France got from Indo-China half the loans and gifts made by its colonies and a substantial amount of war materials. More than forty-three thousand Indo-Chinese soldiers and about fifty-nine thousand workers had been sent to Europe. After the war, the French looked to Indo-China to earn some of the dollars they needed so badly, since it was one of the few colonies in their empire which exported more than it imported. The great rubber plantations in the South and the mines in the North were in French hands. The Indo-Chinese economy was dominated by French banks. In 1938 investments from abroad amounted to \$384,000,000 of which more than ninety-five per cent was held by Frenchmen. So "Indo-China in 1945 appeared a valuable reservoir for France which was rich neither in men nor in materials. Possession of Indo-China, again, meant a foothold in Asia—a 'balcony to the Pacific', as Frenchmen were fond of saying—important not only militarily, but also for less tangible reasons of influence and prestige in Far-Eastern and World affairs." For these reasons the French, in the name of securing peace, are trying to maintain their control there and exploit the people of Indo-China.

MALAYA

Britain is playing the same rôle in Malaya. In the name of exterminating Communist bandits who have the support of the majority of the Malayan people, she is in truth fighting a total war against the people of Malaya from the middle of 1948 and thus trying to 'save' South-East Asia from communism. How untenable the British stand is, and how far they are sympathetic to the people of Malaya will be clear from the fact that when the Japanese Army completed their occupation in Malaya in the year 1941, the British Army withdrew, leaving the people of Malaya at the mercy of the Japanese. During those dark days the freedom-loving people of Malaya gave a creditable account of themselves in fighting the Japanese. They formed "the Malaya People's Anti-Japanese Army" and put up a strong guerilla fight against the Japanese. In successful landing of the Allies and in their ultimate victory of Malaya, the Malayan people

themselves played a great part. But yet, after the war was over, the British did not give independence to this heroic nation. Britain is now telling the world that the majority of the people of Malaya want British rule. But in fact, she is trying to maintain her control over Malaya for her own economic and political interests and not for uplifting the backward people of Malaya. This truth comes out from the words of Mr. Woodrow Wyatt, Under-Secretary for War in 1951 under the Labour Government in Britain. Mr. Wyatt observes that Malaya's dollar earnings are in the neighbourhood of 250 millions a year—the highest of any country in the sterling area. Without those dollars, Britain's dollar gap cannot be bridged. Malaya is the single greatest producer of tin and rubber in the world. Hence, without Malaya the sterling area would be in a difficult position financially. Once Britain's control over Malaya's rubber and tin export is gone, her important position in the world market will fade out. Besides this, the base of Malaya is essential to the Anglo-American bloc to fight communism in Asia. These are the considerations which work behind Britain's maintaining the colony in Malaya.

AFRICA

The picture in Africa is essentially the same, though the colour question is more acute there. The whites, under the plea of bringing light to the people of the Dark Continent, came there in thousands to explore rich mines and established colonies there, making the black people practically their slaves.

The Union of South Africa, though known to the world as a democratic country, is in fact a government of the whites over the coloured people who constitute nearly 83.3 per cent of the total population. The constitution of South Africa provides no facility to the coloured people for representing them adequately in the legislature. Out of 153 members constituting the House of Assembly in the Union of South Africa, 150 are elected by the white people, while only 3 seats are allotted to the Africans. So the white exploitation is going on in full swing and the condition of the Africans and Indians is going from bad to worse. Besides, the Nationalist Party, at present in power in the Union of South Africa, has been preaching the doctrine of "Apartheid", literally meaning a state of separation with a view to justifying its racial policies. In order to secure and further strengthen the position of the whites, the South African Government have enacted various laws of which the "Asiatic Land Tenure and Indian Representation Act" depriving the Indians of the right to buy land in white areas, and the "Group Areas Act" are the most obnoxious. The latter Act provides for the division and control of all land in the Union for ownership and occupation by the three racial groups—whites, natives and the coloured—in which the entire population of 12 million (of which non-whites number 10 million) is divided. According to this Act,

the government by proclamation can establish group areas for exclusive occupation of both or any of the groups. Various other social disabilities also stand in the way of the coloured people to lead an honourable life. In the policy of perpetuating white supremacy, the Malan Government has found ally in the white imperialists who always speak of equality and justice. In the United Nations, Britain has already joined her voice in defending the Malan Government while America, lest she should lose the friendship of the Asian countries which she badly requires in fighting communism, has mostly abstained, thus in a way, revealing her real attitude towards the coloured peoples of Asia and Africa. All over Africa, the story is much the same. Everywhere the whites get a lion's share of the social, political and economic benefits. There are still colonies of France, Britain, Portugal, Spain and Belgium attended with the common feature of white exploitation. The French Government have declared in unambiguous terms its determination not to give the right of self-determination to the people of Tunisia. In Morocco also, according to the provisions of French Protectorate treaty of 1912, signed under much unequal strength of the parties concerned, the French are trying to maintain their control. How far this treaty is applicable to Morocco now is not at all taken into consideration. As Sultan Sidi Mohamed Yusuf of Morocco said, "If you compare the 1912 treaty to a suit of clothes made for a child, you will see that the child has grown up, that its body has developed while there has been no change in the clothes." But France is bent upon maintaining her colonies. This obstinate attitude of France has evoked strong contempt from all right-thinking people of the world. But France and her fellow-travellers do not seem to care much for world opinion, and France has threatened to walk out of the U. N. Assembly when the Tunisian question will be discussed.

BRITISH RULE IN AFRICA

Britain also is carrying out the same policy. In Central Africa, the Tory Government have been pressing forward with the federation scheme, "although it is abundantly clear that the great bulk of African opinion is bitterly against it." The wishes of rather less than 1.8 million Europeans are to prevail over those of 6 million Africans.

In Kenya too, the same policy of furthering the interests of the whites is being pursued. The British are trying to misrepresent the happenings in Kenya, necessitating a declaration of emergency and bringing of troops from the Middle East to Nairobi; in truth they are due to economic exploitation by the whites and consequent poverty of the Africans. In Kenya, half of the inhabited land is owned by thirty thousand whites, while the other half is owned by five million Africans and ninety thousand Indians. Again the best lands are in possession of the whites and the area owned by the Europeans is expanding at the cost of the African and

the Indian. Two Labour M.P.'s, Mr. Brockway and Mr. Hale, after visiting Kenya, have referred to the excesses done by the Government there and have pointed out that if the existing process of pauperizing the Africans continues, there will come a time when every African in Africa will begin to hate all Europeans. In a recent speech in Parliament Mr. Hale compared the industrial wages paid in Kenya to Europeans and Africans and showed the disparity between the two ; there were 28,440 Africans in private industry receiving under £24 per year (Rs. 26 per month), and 34,000 more being paid between £24 and £36. In the Public Services there were 17,700 Africans earning under £24 a year and 31,000 more under £36. Besides this economic poverty, socially also the coloured people are subjected to hateful treatment by the Europeans. So it is not at all difficult to trace the origin of the present unrest in Kenya and other western colonies in Africa.

VICTORIOUS MARCH OF THE COLONIAL PEOPLE

We have seen that everywhere the Western imperialists are engaged in exploiting the backward peoples of Asia and Africa and in some cases waging predatory war against the people for strengthening their economic and political position in the world. But the tyranny of the imperialists is not an unmixed evil ; it has aroused the patriotism of the oppressed peoples who were submissive so long and the more the imperialists are trying to crush, the greater the momentum the oppressed peoples' movement acquires. The patriots of Malaya and Indo-China have shown in no uncertain manner their indomitable spirit and courage in fighting the British and the French forces, well-equipped with American armaments. Through this hard struggle the Indo-Chinese people have been able to establish and maintain a sovereign republic in the face of French opposition. In 1950 Ho Chi Minh told the people of Indo-China : "A few years of resistance have brought our country the greatest success in the history of Viet Nam—recognition of the Democratic Republic of Viet Nam as an equal in the world democratic family by the two biggest countries in the world—the Soviet Union and Democratic China—and by the new democratic countries. That means that we are definitely on the democratic side and belong to the anti-imperialistic bloc of 800 million people." In Malaya also, General Templer's method of mass scale arrest and brutality, reminiscent of the Dark Ages, in dealing with large numbers of villages, has failed to crush the popular movement.

The fight against imperialism is also extended to the dark continent. The riots in Port Elizabeth and other places and the violent way in which the Malan Government is trying to resist the passive resistance movement—all these clearly indicate what shape ultimately the non-violent resistance will take. Prayer and peaceful movement will only fall on the deaf ears of the die-hard imperialists. In response to the demand of Mr. Kenyatta,

President of the Kenya African Union, for more land, better social service and abandonment of racial discrimination, he has been put into prison and thousands of Africans are being rounded up and inhumanly tortured everyday in the name of suppressing terrorism. The "Mau Mau" Society, though described by the British as only a terrorist gang, represents the bitter feelings of all Africans towards their white oppressors. Thus, everywhere the fight against imperialism is in full tide which the imperialists are trying their best to stem with brute force. But as Lincoln pointed out, "It is possible to fool some people for all time and all people for some time, but it is not possible to fool all the people for all time." So the death-knell of imperialism will ring in no distant future and as recent happenings indicate, the freedom-loving peoples of the world are well on their way to achieve their freedom, however difficult and hazardous the path seems to be at the present moment.

An Apology for Statistics

RADHA GOVINDA LAHA, M.Sc.*

*Technician, Division of Theoretical Research, Indian Statistical Institute,
Calcutta.*

In J. A. S. A. (1951) appears this remark of H. G. Wells, the prophet of the modern scientific age: "Statistical thinking will one day become as necessary for efficient citizenship as the ability to read and write". Only a few years back, however, the majority of people, as it appeared from their attitude towards Statistics, were little appreciative of its utility as a scientific method. It has been already pointed out by Prof. P. C. Mahalanobis in his presidential address at the 37th Session of the Indian Science Congress, January 1950—"Evidently, statistics and astrology were bracketted together in the mind of many of our scientists. The forecasting of future events is, of course, a common feature; and the basis was felt to be equally unscientific." But that situation is now over, and the popular as well as the scientific opinion about statistics has thoroughly changed. It is at present admitted as an indispensable scientific method by workers in the various fields of agriculture, anthropology, biology, genetics, economics, sociology, psychology and even engineering and medicine. From day to day new statistical methods are being devised for application

* Alumnus : 1945-51.

in unexplored fields and the statistical techniques, which to-day appear to be the best, are being replaced by something better to-morrow. As a consequence, more and more complicated problems both in theory and practice are emerging in various fields.

Among no fewer than a hundred definitions of statistics it would be difficult to choose the most comprehensive. But the following may do: "Statistics is that branch of scientific method which deals with the data obtained by measuring or counting the properties of *populations*, particularly of natural phenomena." Here the term "populations" is not confined to human population only, but is generally used to denote any group or aggregate of subjects whether animate or inanimate. Even physical observations, such as the simple measurement of the length of a scale, when repeated indefinitely, may form an aggregate which may be called a population of measurements. Statistics is mainly concerned with the study of groups and not of individuals. For example, in studying a population of statures the statistician is not in the least interested in knowing whether the height of a particular individual exceeds six feet but rather, how many have heights above six feet.

The definition of statistics as a scientific method for studying the properties of populations automatically leads to the conclusion that it is also the study of *variations*. Variations are found to form the intrinsic features of all kinds of measurement and statistical investigation largely centres around variation. We can never think of any science without measurement, nor any measurement without its characteristic variation. This would fairly justify the claim that statistics is indispensable in every science.

The main purpose of the theory of statistical inference is to draw some sensible conclusions from a particular set of measurements about other similar sets after paying due attention to its characteristic variation. In the vast majority of cases, the particular set of measurements or observations at our disposal is interpreted as a *sample* drawn from a hypothetical finite or infinite *population* which is supposed to be composed of all possible sets of such similar measurements. Expressed in a more lucid manner, the principal object of a statistician is to extract as much relevant information as possible about the parent population from the given sample. It is generally supposed that the population which is the main subject of our investigation can be specified by a mathematical formula involving a certain number of constants or *parameters*. The population and its parameters are so intimately related that knowing the exact values of the parameters is equivalent to knowing all about the population. But the task of determining the exact values of the parameters is well-nigh impossible, and the best we can do is to find out *estimates* of their true values. These estimates are usually calculated from the sample observations. The primary task of a statistician is to select a particular mathematical form

of the parent population (which is called the *problem of specification*) and next, to compute from the sample the best possible estimates of the parameters characterising the populations (which is called the *problem of estimation*).

A point deserving special mention in this connection is that in order to isolate the maximum possible relevant information about the population, it is absolutely essential that the samples given should be representative of the population. This is the reason why we lay special stress on the phrase "the sample should be strictly *random*." Here the term 'random' has a technical significance quite apart from its colloquial use. A sample is said to be random when each individual of the population has the same *chance* or *probability* of being included in the sample. It is important to note here that the main advantages of random sampling are two-fold—firstly, with the help of the calculus of probability we can make valid conclusive statements about the parent population and secondly, we can calculate directly the magnitude and nature of the *sampling errors* to which the estimates, as discussed above, are subject.

Now it may be desirable, in passing, to let the reader have some idea about the calculus of probability for understanding, roughly, the theory of random sampling. The tossing of a coin provides a very simple example for illustrating the concept of probability. Assuming the coin to be unbiased (that is, free from any bias of turning up either head or tail), the probability that it will turn up head at any throw is $\frac{1}{2}$, meaning thereby, that if the tossing of the coin is repeated *infinitely* then the ratio of the number of times it turns up head to the total number of throwings approaches the quantity $\frac{1}{2}$ in the long run." In other words, if the coin is thrown a large number of times, heads and tails will turn up approximately in equal numbers.

The nature of the statistical inference, generally arrived at, is quite interesting. It should be emphasised that all our prediction about the characteristic properties of the population is based on only one random sample and it is quite likely then that there may be practically an infinite number of such random samples. Thus conclusions about the population based on a random sample are bound to be uncertain. But it may be claimed that although statistical prediction is never absolutely certain, it is possible to estimate the limits of uncertainty. For example, let us suppose that we have a number of height measurements of individuals at our disposal, from which we have to predict the average height in the population from which the above data are considered to be "random samples". We may now calculate two quantities—say, a and b —from the sample observations and then make some statement like this: "The probability that the average height in the population lies between the two limits a and b is 0.99." The above statement appears to be paradoxical,

since the average height in the population is a *constant*, not subject to any variations or fluctuations and hence, only one of the two alternatives must take place, that is, either it will lie between the limits *a* and *b* or outside the above limits ; hence, the above probability is either zero or unity. But the exact meaning of the above technical language may be given as follows :—If we continue drawing repeated random samples, each having the same number of observations, for an indefinite number of times and then for each sample we calculate the two qualities *a* and *b* based on the sample observations and finally, make the statement that the true average height for the population lies between *a* and *b*, then the proportion of our correct statements will be 0.99 in the long run, that is, we are likely to be wrong in our statements in 1 p.c. of the cases in the long run.

As an illustration of how statistical investigation has rendered invaluable service, we may quote an example from Prof. Mahalanobis' presidential address already referred to above :

"In 1926, a catastrophic flood occurred in the Brahmani river in Orissa. An expert committee of engineers appointed by the Government of India reached the conclusion that the bed of the river had risen by several feet and consequently the flood level was likely to be higher in future. The Committee naturally recommended raising the height of the embankments by several feet to give 'protection' against higher floods. At the request of the Government of Bihar and Orissa, I made a detailed statistical study. Using the statistical relationship, I found that the abnormal rise of the river in 1926 could be reasonably ascribed to exceptionally heavy rainfall in the catchment areas. On the basis of such statistical evidence, it was possible to advise Government that there was nothing wrong with the river and it was not necessary to increase the height of the embankment. This advice was given in 1930. The fact that no change has occurred in the severity or frequency of floods during the last 20 years shows that the statistical findings were correct. Direct experimentation in such cases is out of question; the statistical method supplies the only valid tool for scientific investigation. Incidentally, in this case it also saved several crores of rupees. Also, the statistical studies made at this time supplied the basic information for the Hirakud Dam, one of the river valley projects in India."

Numerous illustrations of the above kind may be cited where statistical techniques have been proved to be immensely successful and all other scientific methods have failed. Statistical methods have been tried and proved to yield extremely satisfactory results in the various branches of science wherever we have to predict the nature of the whole from only a part given to us.

In conclusion, it may not be out of place to draw attention to certain prevalent misunderstandings about statistics. Occasionally, it is remarked that statistics is good for nothing, since the forecasting on the basis of

statistical investigations often comes wrong. But statistics as a scientific method must not be blamed for what is mainly due to the inefficiency of the staff of the various departments. A point that will bear emphasis is that it is better to go without statistics than call for quack statisticians. What our country needs to-day is efficient statisticians with a sound theoretical background and fit to cope with the problems that may emerge in the different applied fields.

Rastrapati Dr. Rajendra Prasad's Visit to Presidency College : December 24, 1952

THE PRINCIPAL'S WELCOME ADDRESS

DR. MOOKERJEE, MEMBERS OF THE PRESIDENCY COLLEGE: PAST AND PRESENT, LADIES AND GENTLEMEN,

It is a unique occasion that calls us here together this memorable morning. An old boy of this College comes back in our midst as Rastrapati—President of the Republic of India, the country's first citizen and embodiment of its achievements, hopes and aspirations. For forty long and arduous years, as devoted lieutenant of Mahatma Gandhi, our Rastrapati has been in the forefront of the national struggle for freedom. Now that the goal has been achieved, after years of suffering and sacrifice, it is in the fitness of things that he has been elected to preside over the destinies of the young republic he has helped to bring to birth. One is indeed proud of belonging to a College that has contributed to the national struggle leaders of such calibre and eminence as Rastrapati Rajendra Prasad, Deshabandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhaschandra Bose, not to mention the numerous alumni who have given their lives and labours to the national cause.

In the making of the new India of today Presidency College has played no mean part. Starting in 1817 as the Hindu College, it was the first institution to bring western education to this country and thus paved the way for the great Indian Renaissance of the last century. In 1855, a year before the establishment of the Calcutta University, the Senior Department of the Hindu College was separated from the Junior and re-

named the Presidency College. In 1858 Presidency College sent out her first batch of graduates, among whom was the seer Bankimchandra Chatterji, who gave to our national movement its sacred *mantram* of *Bande Mataram*. Years rolled by, and Presidency College, like its predecessor the Hindu College, went on contributing year after year men of first-rate distinction to the various walks of Indian life—the arts and the sciences, law, politics and administration, education and social service. In 1902, a young man from the Chapra Zilla School, who had occupied the first place in the Entrance Examination of the Calcutta University of that year, came and joined this College as both student and boarder. For five years he studied at this College with such eminent professors as H. M. Percival, Dr. P. K. Ray, Harinath De, Manmohan Ghose, Benoyendranath Sen and others. He came out at the top again at the F. A. Examination and graduated with double Honours (in History and in English Literature) and the Eshan Scholarship for being the first graduate of his year. That young man was Rajendra Prasad, the future President of the Republic of India.

Since those days the College has expanded in many directions till we have arrived at a position where the two buildings of the College together, the main one put up in 1874 and the Baker Laboratory put up in 1913, are unable to meet all its needs (even with structural additions to the Baker Laboratory last year). The problem of accommodation is the great problem before us at the moment. The problem is at its acutest perhaps in the science departments of the College. Science is an ever-growing subject, and our science departments have been developing at a pace that has outrun all available accommodation. It may just as well be mentioned in this connection that, besides normal teaching and research work, our science departments have also to take up various schemes of scientific research sponsored either by the State Government or by various bodies under the Central Government. Actually, at the moment, a number of such schemes, both State and Central, are being worked out in the different departments of the College. All that requires space, which is not simply there. I am afraid, if the problem of accommodation is not immediately tackled, science teaching and research in this College will come to a dead end. Which will be a great pity, for this College has a great tradition in matters of science ; it was in its laboratories that the foundations of modern scientific research in India were laid by Acharya Jagadishchandra Bose and Acharya Prafullachandra Ray.

In point of fact, this problem of accommodation has been pressing the College in *all* its departments. We are short of lecture and seminar rooms. Our libraries, our laboratories, our offices, our Common Rooms, are all badly cramped for space. New subjects have been taken on, departments have multiplied, teaching and office staff has increased, so has the number of students on the rolls (and within the last seven years the College has

thrown open its doors to girl students as well). Yet accommodation has remained what it was since 1913.

This is really an impossible situation for the College. What is needed is another comprehensive plan for an all-round expansion like the one that was drawn up and officially approved in 1907 (many parts of which, unfortunately, still remain unrealised). For some time past we have been engaged on a plan like this, which provides for a much-needed Assembly Hall, additional lecture and seminar rooms, and extension of accommodation for all departments of the College. A special point is being made in the plan of providing adequate accommodation for research work in both Science and Arts. On the Arts side we have specially in contemplation, in view of the increasing importance of the subject, a School of Economics with its own set of rooms. This College has recently been declared a constituent college under the latest University Act, which means in practical terms that the possibility of revival of post-graduate classes, taken over by the University in 1917, is in the offing. That makes such a plan as I have been speaking of all the more necessary.

Our plan is nearly ready ; actual execution depends almost entirely on governmental sympathy and help, which, we most earnestly hope, will be forthcoming in due measure. Presidency College, I make bold to claim, is much more than a local college. She is a national institution. She has played a great part in the making of the new India of today. Given the right amount of sympathy, encouragement and State support, she has a great part to play yet in the making of the new India to be.

Ladies and Gentlemen, I am deeply thankful to you and to our Rajyapal, Dr. H. C. Mookerjee, yet another of our old boys, for having come and joined us here in today's memorable function. On behalf of you all, on behalf of the Presidency College, its staff and its students, and on behalf of the Presidency College Alumni Association, I offer our most respectful welcome and homage to our honoured visitor of today, Rastrapati Rajendra Prasad. The Rastrapati, as you know, has just completed his sixty-eighth year. I am sure you would all join me in wishing him a long life and health, happiness and prosperity. May he be spared for us for many years yet ! The country needs him, his inspiring leadership, his sage counsel and guidance, in the difficult journey that lies ahead. May the new India that he has helped to build up find her way to the great destiny he has visualised for her for forty long years ! And may this College of his and ours attain to greater glory in the future and continue as ever to attract to her countless generations of students, the flower of the intellect of West Bengal, who would enter her portals proud of the knowledge that it was the *College* that had produced Rajendra Prasad !

Acknowledgment

We acknowledge with thanks the receipt of the following :—

- The St. Xavier's College Magazine, Calcutta.
- The Scottish Church College Magazine, Calcutta.
- The St. Paul's College Magazine, Calcutta.
- The Vidyasagar College Magazine, Calcutta.
- Jadavpur Engineering College Magazine (Silver Jubilee Number).
- The University Law College Magazine, Calcutta.
- The Hooghly College Magazine.
- The Darjeeling Government College Magazine.
- The Presidencian (The Madras Presidency College Magazine).
- Malabar Christian College Magazine.
- The Batanagar Recreation Club Magazine.

EDITORS AND SECRETARIES

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15	PRAMATHA NATH BANERJEE, B.A.
1915-16	MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1916-17	MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1917-18	SAROJ KUMAR DAS, B.A.
1918-19	AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1919-20	MAHMOOD HASSAN, B.A.
1920-21	PHIROZE E. DASTOOR, B.A.
1921-22	SYAMA PRASAD MOOKERJEE, B.A.
1921-22	BRAJAKANTA GUHA, B.A.
1922-23	UMA PRASAD MOOKERJEE
1923-24	SUBODH CHANDRA SEN GUPTA
1924-25	SUBODH CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1925-26	ASIT KRISHNA MUKHERJEE, B.A.
1926-27	HUMAYUN Z. A. KABIR, B.A.
1927-28	HIRENDRA NATH MUKHERJEE, B.A.
1928-29	SUNIT KUMAR INDRA, B.A.
1929-30	TARAKNATH SEN, B.A.
1930-31	BHABATOSHI DATTA, B.A.
1931-32	AJIT NATH ROY, B.A.
1932-33	SACHINDRA KUMAR MAJUMDAR, B.A.
1933-34	NIKHILNATH CHAKRAVARTY, B.A.
1934-35	ARDHENDU BAKSI, B.A.
1935-36	KALIDAS LAHIRI, B.A.
1936-37	ASOK MITRA, B.A.
1937-38	BIMAL CHANDRA SINHA, B.A.
1938-39	PRATAP CHANDRA SEN, B.A.
1938-39	NIRMAL CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1939-40	A. Q. M. MAHIUDDIN, B.A.
1940-41	MANILAL BANERJEE, B.A.
1941-42	ARUN BANERJEE, B.A.
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	SUDHINDRANATH GUPTA, B.A.
1948-49	SUBIRKUMAR SEN, B.A.
1949-50	DILIPKUMAR KAR, B.A.
1950-51	KAMALKUMAR GHATAK, B.A.
1951-52	SIPRA SARKAR, B.A.
1952-53	ARUN KUMAR DAS GUPTA, B.A.

Secretaries :

1914-15	JOGESH CHANDRA CHAKRAVARTI, B.A.
1915-16	PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1916-17	PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1917-18	RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A.
1918-19	MAHMOOD HASSAN, B.A.
1919-20	PARAN CHANDRA GANGOLI, B.A.
1920-21	SHYAMA PRASAD MOOKERJEE
1921-22	BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA
1921-22	UMA PRASAD MOOKERJEE
1922-23	AKSHAY KUMAR SIRCAR
1923-24	BIMALA PRASAD MUKHERJEE
1924-25	BIJOY LAL LAHIRI
1926-27	LOKES CHANDRA GUHA ROY
1927-28	SUNIT KUMAR INDRA
1928-29	SYED MAHBUB MURSHED
1929-30	AJIT NATH ROY
1930-31	AJIT NATH ROY
1931-32	NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1932-33	NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1933-34	GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI
1934-35	SUDHIR KUMAR GHOSH
1935-36	PROVAT KUMAR SIRCAR
1936-37	ARUN KUMAR CHANDRA
1937-38	RAM CHANDRA MUKHERJEE
1938-39	ABU SAYEED CHOWDHURY
1939-40	BIMAL CHANDRA DATTA, B.A.
1940-41	PRABHAT PRASUN MODAK, B.A.
1941-42	GOLAM KARIM
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	JIBANLAL DEV
1947-48	NIRMAL KUMAR SARKAR
1948-49	BANGENDU GANGOPADHYAY
1949-50	SOURINDRAMOHAN CHAKRAVARTY
1950-51	MANAS MUKUTMANI
1951-52	KALYAN KUMAR DAS GUPTA
1952-53	JYOTIRMOY PAL CHAUDHURI

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
কলেজ প্রসঙ্গ	
বাংলা কথাসাহিত্যে ঢাটি দিক	১
সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার গতি	৫
দেখা (কবিতা)	৯
বৃষ্টি শেষের বিকেল (কবিতা)	১৮
স্বধা সন্ধান (কবিতা)	১৯
শুঁয়োপোকা (গল্প)	২০
আমেরিকা আবিষ্কার (অহুবাদ গল্প)	২১
জ্যোতির্ভূক্তি (কবিতা)	২৬
দিনের কবিতা (কবিতা)	৩২
উত্তর-স্থান্ধর (কবিতা)	৩৩
সমাজবিজ্ঞানের গোড়ার কথা	৩৪
ইতিহাস-বিজ্ঞান	৪৫
বাঁশীর স্তর	৪৮
আমাদের কথা	৫০
Editorial	১
The book of Psalms—an appreciation	৭
Stalin's last thesis	৯
Democracy and freedom of thought	১৩
In defence of P. G. Wodehouse	১৭
Materialistic Interpretation of History	২১
Periodisation in Indian History	২৬
Sports and Presidency College	৩১
Alumni Association	৩৪

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক শ্রীসুনীতকুমার ইন্দ্র (সভাপতি)

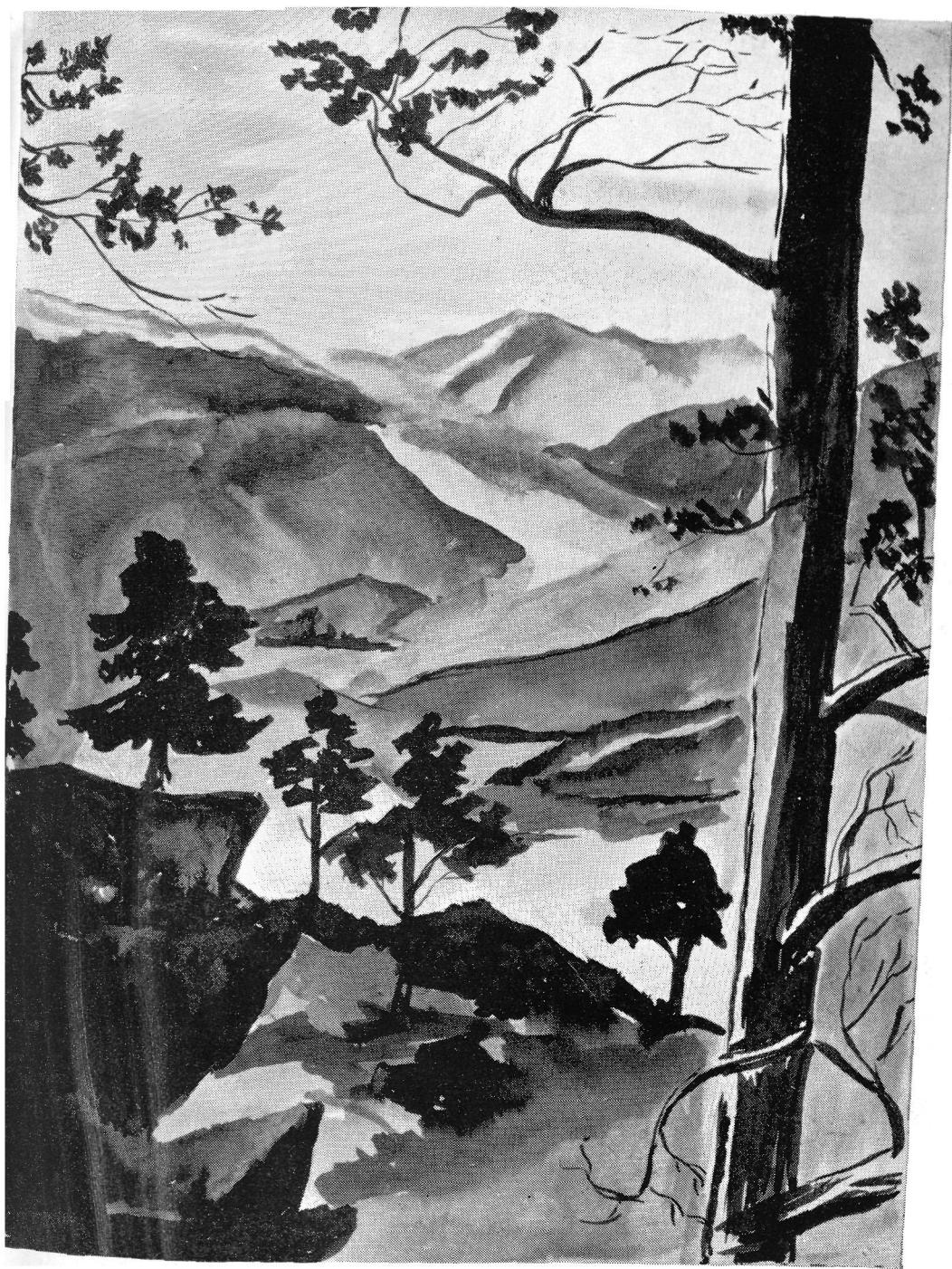
„ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

„ শ্রীঅমল ভট্টাচার্য

„ শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীঅশীন দাশগুপ্ত (সম্পাদক)

শ্রীজ্যোতির্ময় পালচোধুরী (কর্মসচিব)



শিল্পী : দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ন্বতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজ

পত্রিকা

অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ ১১

পঞ্চক্রিংশ বর্ষ

১১ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

কলেজপ্রসঙ্গ

পত্রিকার কথা

পরিবর্তনই জগতের নিয়ম, এই ধরনের একটা কথা আজকেরদিনের প্রগতিশীল বাক্তিমাত্রেই বলে থাকেন, আর নেহাত দায়ে না পড়লে প্রগতিশীলমতবাদ বাজে কথা বলে না। কাজে কাজেই কথাটার সত্য প্রতিপন্ন হওয়ার সমূহ সন্তান রয়েছে। এই ধরনের পটভূমিকার সামনে পরিবর্তনসাধনের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। আজ তার পঞ্চাশ বছর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা বিশ্বব্যাবের মত রূপ পালটাল।

বাংলাদেশ তথ্য ভারতের সমস্ত কলেজ পত্রিকার ভিত্তির আমাদের পত্রিকাই বোধকরি মুগ্ধিতে প্রাচীন। পত্রিকা একাশের আদিপর্বে, প্রচন্দপটের আলোঁঁাধারি পটভূমিকায় আবহা ফুটে উঠে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছবির ভিত্তি দিয়ে তার এই বয়োজ্যস্তের গান্তীর্থ মহেশেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠত। একনজর তাকিয়ে নিলেই পত্রিকার প্রাচীনত্ব স্পর্কে সমস্ত সন্দেহ মুক্ত বিলীন হতে বাধ্য হত। তার এই প্রাচীনস্বরের গ্রন্থাগ প্রচন্দপটে ফুটিয়ে তোলার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিত্যাগ করে সে আজ গ্রাম বিশ্ববচরের কথা। তার পরের প্রীপলাঙ্ঘন প্রচন্দপট আপনাদের স্বপরিচিত। আমাদের পত্রিকা জানের প্রদীপের ধারক ৭ বাইক, এই ধরনের একটা কথাই আমরা বলতে চাইতাম পত্রিকার সামনের প্রদীপের দালোর ভিত্তি দিয়ে। এবার আমরা এই প্রদীপকে মুছে দিলাম। এই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের মনমৌলিকতার ধারা মুছে গেল কিনা সে বিচারের ভার আপনাদের। প্রেসিডেন্সির চিঠিবার স্বাক্ষর ছাড়িয়ে রয়েছে পত্রিকার পাতায় পাতায়। এই ধারাম্বোতে কি কাজ হয়ে গলছে, আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে, এ এখনের নিষ্পত্তি করতে পারে শুধুমাত্র আমাদের

পাঠকদের মননশক্তি। এবারে তার নিলিপ্ত আত্মপ্রকাশের ভিত্তি দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা নিঃশব্দচিত্তে সে তার আপনাদের হাতে তুলে দিল।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন বর্তমান জগতের অজ্ঞ দুর্গতির মধ্যে সর্বহাস্য শ্রেণীর দুঃখ আর সম্পাদকদের দুর্গতি এচুটোই সবচাইতে প্রণিধানযোগ্য। এবারে আপনাদের অকৃষ্ট সহযোগিতা আমাদের দুর্গতির বোৰা অনেকটা লাঘব করেছে। ছাত্রছাত্রীমহল থেকে যেরেকম সাড়া পেয়েছি তাতে ভরসা হয় অদূরভবিষ্যতেই আমাদের এ বছরের দ্বিতীয় সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। আপনাদের লেখনীচালনার প্রাচুর্যে আমাদের অধ্যাপকের এবার স্থানচ্যুত হয়েছেন। এতে বোধকরি তাঁরাই সবচাইতে আনন্দিত। অনেকগুলি চে এবং অচেনা কলমের সহযোগিতা এবারে ছাপার হৱফে স্বীকৃতি পেল না। এরজন্য দে প্রধানতঃই আপনাদের এবারকার সঙ্গীর্ণচেতা সম্পাদকের। স্থানভাবের জরুর অভ্যন্তরে কিন্তু অত্যন্ত সত্য। এসমস্তের কথা ভেবে আমাদের অক্ষমতা নিজগুণে ক্ষমতা করবেন। আপনাদের কাছেই আমরা সবচেয়ে বেশী অপরাধী আর সবচাইতে ক্ষতজ্ঞ।

পত্রিকাকে সফল করে তুলতে সম্পাদকের দায়িত্ব রয়েছে প্রচুর কিন্তু অবকাশ অত্যন্ত সামান্য। আসল কাজের ভার সব সময়েই থাকে সাধারণ ছাত্রছাত্রী সকলের উপর। এ বছরের প্রথম সংখ্যা আপনাদের সামনে উপস্থিত। আপনাদের অকৃষ্ট সমালোচনা আলোচনাতে আশা করি এবারের অজ্ঞ দোষক্রটির কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে পঞ্চাশ বারের প্রকাশে। কলেজ পত্রিকার সম্পাদক প্রথারূপায়ী দুবার করে পাঠকদের আক্রমণ করার স্বযোগ পেয়ে থাকেন। ইংরাজী জ্বানীতেও এ সম্পর্কে আমরা বিছু গবেষণা করেছি আশা করি আপনাদের মননশক্তি অক্ষমহাতের পরিচালনার দোষক্রটিকে অতিক্রম করে আপনাদের পত্রিকাকে সফল থেকে সফলতর করে গড়ে তুলতে পারবে।

কলেজে পরিবর্তন :

কলেজে পরিবর্তনের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই মনে হয় প্রেসিডেন্সি কলেজ তা জনপ্রিয় অধ্যাপক, স্ববিদিত মনীষী, শ্রীভবতোষ দত্তের সংস্পর্শ হারিয়েছে। পাণ্ডিতের এই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে এমন গ্রন্থিভাব মালিককে আর ছেট জায়গার সকীর্ণ পরিয়ে আটকে রাখা সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে না। এর আগেও ভারত-সরকার শ্রীযুত দত্তকে বৃহত্তর কাছে মধ্যে দেকে নিতে চেয়েছেন। এবারে বিশ্ব-ব্যাক্সের আহ্বান তাঁকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিল। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ডিবেষ্টের হিসাবে আমাদের অধ্যাপকের কাজ এবার দ্বিতীয়ের সম্মান লাভ করবে। তাঁর মনীষার এই স্বাভাবিক স্বীকৃতিতে আমরা আনন্দ কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়। আমাদের এই পত্রিকার দ্বিতীয় ছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। এই সংখ্যার প্রকাশ পর্যন্ত হয়েছে তাঁরই মূল তত্ত্বাবধারী তাঁর বিদেশ যাত্রায় এ পত্রিকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল।

অগ্রান্ত বিভাগেও বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে। ইংরাজীর স্থানে অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র ঘোষ পাস্টুর সার্ভিস কমিশনের অ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জাগরায় এসেছেন শ্রীশেলেন্দ্রকুমার সেন। দর্শনবিভাগের শ্রীনিধিলচন্দ্র সেন, অবসর গ্রহণ করেছেন। এই বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে এসেছেন শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী। গণিতবিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সনৎকুমার বস্তু ছগলী মোহসীন কলেজের অধ্যক্ষের পদে যোগদান করেছেন। এই বিভাগের শ্রীমুরুরেন্দ্রনাথ দাস বিদায় নিয়েছেন। শ্রীশ্বামসাধন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকাশীনাথ নন্দী নতুন যোগদান করেছেন।

বিজ্ঞানের দিকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খবর বোধহয় পৃথক প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের সংগঠন। এবিভাগ পরিচালনার ভার পেয়েছেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মিত্র। পদার্থ বিজ্ঞানের শ্রীভগবতীচরণ গুহ বদলী হয়েছেন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে। এই বিভাগে নতুন এসেছেন শ্রীনগেন্দ্রমোহন সাহা। শ্রীপরেশকিশোর সেন চৌধুরী এবং শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ও এই বিভাগ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এঁদের স্থান পূরণে এসেছেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস। বসায়ম বিভাগের কৃতী অধ্যাপক ডক্টর রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদয়ানন্দ ভাদুড়ী বিদায় নিয়েছেন। এবং এই সঙ্গে বিদায় নিয়েছেন শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য। এই বিভাগের কাজে যোগদান করেছেন অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অনিলকু দক্তগুপ্ত। উদ্দিদিবিজ্ঞান বিভাগ হারিয়েছে শ্রীষ্টীন্দ্রনাথ মিত্রকে। এ বিভাগে এসেছেন শ্রীসুতীনাথ ভাদুড়ী ও শ্রীপ্রচুরেঞ্জন দাস। শারীরবিজ্ঞান বিভাগ জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীহুলালপদ সাধুর বিদায় গ্রহণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বিভাগের শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুন্দও বিদায় নিয়েছেন।

পরীক্ষার ফলাফল

প্রেসিডেন্সি কলেজের উচ্চল ইতিহের অনেকটাই গড়ে উঠেছে বিশ্বিদ্যালয়ের পরীক্ষাফলের খাতার পাতায়। এবাবেও আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এর কোন ব্যতিক্রম হতে দেন নি। এবাবেও আই. এ. ও আই. এস. সি. পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে ৯৮% ও ৯১%। আই. এ. তে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে চারজন এবং আই. এস. সি. তে পাঁচজন, প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন। এর মধ্যে আই. এ. তে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শ্রীঅমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আই. এস. সি. তে শ্রীঅশোক সেন। এঁদের দুজনের মত মিতিহের পরিচয় অনেক বছর এ ছাটি পরীক্ষাতে কেউ দেখাতে পারেন নি।

এবাবে বি. এ. ও বি. এস. সি. পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৮০% ও ৭৫%। বি. এ. পরীক্ষাতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন নয়জন, এবং বি. এস. সি. তে মোলজন। বি. এ. পরীক্ষার সর্বোচ্চ সম্মান দ্বিশান্নভূতি লাভ করেছেন ইতিহাসে

শ্রীপার্থসারাথি গুপ্ত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, শ্রীপার্থসারাথি গুপ্ত এবং অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, শ্রীঅমর্ত্য সেন, উচ্চশিক্ষার জগ্ন ইংলণ্ড যাত্রা করেছেন ।

শোক সংবাদ

এবছর প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্রকে হারিয়েছে । শ্রীশামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে সারা ভারতই বিষাদে আচ্ছন্ন হয়েছে । শ্রামাপ্রসাদ ছিলেন আমাদের সর্বজনবিদিত ছাত্রদের মধ্যে একজন । এ কলেজে তাঁর স্মৃতি রয়ে গেছে অজস্র । এই পত্রিকারই সম্পাদনার ভার তাঁর হাতে ছিল ১৯২১-২২ সালে । ছাত্রজীবন শেষ করার পরেও তাঁর সঙ্গে কলেজের যোগ ছিল নিবিড় । আমাদের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি । তাঁর মৃত্যুতে প্রেসিডেন্সি কলেজ একজন দরদী বন্ধুকে হারিয়েছে ।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যুতেও প্রেসিডেন্সি কলেজের অপূরণীয় ক্ষতি হল । আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রের নাম বাংলাদেশে স্মৃতিদিত । কলকাতা-মগরীর মেয়ের থাকাকালীনই তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন । শ্রীহীরালাল চক্রবর্তীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত আইনজীকে হারিয়েছে । বিশেষ করে হিন্দু-আইন সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনবিদিত । শ্রীফণীন্দ্রনাথ দের মৃত্যু আমাদের অত্যন্ত ব্যথিত করেছে । তিনি ছিলেন আমাদের একজন বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র ও আমাদের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সদস্য । লক্ষ্মিপতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহের মৃত্যুও অত্যন্ত দুঃখজনক । আমরা এইদের সকলের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিনীত শুদ্ধ জ্ঞাপন করছি ।

বাংলা কথাসাহিত্যে দুটি দ্রিক

শ্রবণ গুপ্ত—চতুর্থ বর্ষ আর্টস

‘জনান্তিকে’র বিখ্যাত লেখক যাথাবরের (যিনি দ্বিজ,—অর্থাৎ তাঁর নিজের ভাষায়,— যিনি একই দেহে দ্ব্যাবার আঘাতপ্রকাশ করেছেন ;—‘দৃষ্টিপাতে’র যাথাবরের মৃত্যুর পর সেই দেহেই নাকি ‘জনান্তিকে’র যাথাবরের জন্মগ্রহণ ।) মতে একালে আর ‘সত্যিকারের গল্প’ লেখা হবে না, কেননা, এ বুগের বুদ্ধিজীবী মন রূপকথায় তৃপ্তি পায় না, অবিশ্বাসে বিশ্বাস-স্থাপন করতে নারাজ । তা ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় জীবনের সম্বন্ধ হারিয়েছে আজকের জীবন, তাই আজকের সাহিত্যে নেই বিরাটত্ব, মহস্ত ইত্যাদি । আজকের জীবনের প্রকৃতি অমূল্যেরই নাকি সাহিত্য লঘু চপল হতে বাধ্য ।—আর সাহিত্যে নাকি মানুষের দ্বন্দ্ব নিয়ে কারবার,—আধুনিক জীবনে সেই দ্বন্দ্বকে মানুষ বুদ্ধির অধীনস্থ করেছে,—স্বতরাং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্ফটি আজ অসম্ভব ।

সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য সম্পর্কে মতান্তরের অভাব নেই,—তবে মতভেদ থাকা সহেও, বিভিন্ন মতগুলি যে সব সময়েই অশ্রদ্ধেয়, তা নয় । কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন সৌধিন সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর উপদ্রব সহের সীমা ছাড়িয়ে যায় । এরা তাঁদের সাহিত্য-শিশুটিকে জীবনের বাস্তব ও প্রাণবন্ত ক্ষেত্র হতে, ‘রাজনীতি’, ‘বুদ্ধিবাদ’ ইত্যাদি জুজুবুড়ির কবল হতে উদ্বার করে নিয়ে বেড়ে পুছে আড়ালে আবড়ালে তার পরিচর্যা করেন । এর্দের মতে সাহিত্যিকের শিল্পস্ফটি কোন সামাজিক কর্তব্য নয়, তা হোলো ব্যক্তিবিশেষের একান্ত নিষ্পত্তি খেয়ালখূশীর যথেচ্ছ চরিতার্থতা । এমনি করে যারা সাহিত্যকে ক্ষণে ক্ষণে ‘ডিনার টেবিলে’র সঙ্গে উপর্যুক্ত করেন, যাদের মতে সাহিত্যের মধ্যে মানুষ জীবন-জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পায় না, পায় কেবল অলসভাবে অবসর বিনোদনের অফুরন্ট রসদ, সাহিত্যস্ফটি ও খেলাধূলা যাদের কাছে প্রায় সম্পর্যায়ভূত, আমাদের পক্ষ থেকে তাদের কিছু জবাব দেবার আছে । আমরা তাঁদের সচেতন করে দিই,—ছেলেখেলায় মানুষের মন ভোলাবার দিন সত্যই গেছে, সাহিত্যে আজ মানুষ কেবল আরাম আর আমোদই পেতে চায় না, চায় তাঁদের জীবনের সকলাদিকের বলিষ্ঠ ও সমৃক্ষ শিল্পরূপায়ণ । জীবনের সমস্তাগুলির প্রতিফলন শিল্পে খুঁজে পেলে সংবৰ্ধক্ষিত সাহিত্যপদ্ধতিনে ‘মন্তব্ধস্তী’র দুরাগমনের আশংকায় যাঁরা উৎকৃষ্টিত হন, তাঁদের প্রবল একটা নাড়া দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, পদ্মমধু পান আর মলয়বায়ু দেবম আজকের জীবনধর্মীদের শিল্পরসিক মনের পক্ষে যথেষ্ট নয় । আর সেই সঙ্গে বিশেষ ক’রে যাথাবরকে মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে,—যে জগৎ ওথেলো-ডেসডেমোনা আর তিলোত্মা-জগৎসিংহের জন্ম দিয়েছিলো, যে জগৎসমেত তাঁরা আজ অন্তর্ভুক্ত ; যে জগৎ

জন্ম দেৱ অমিত, সবিতা, ইন্দ্ৰাণী, মহুকে (‘একদা’, ‘অগ্নিদিন’, ‘আৱেকদিন’) ইন্দ্ৰজিং, শকুন্তলা, শাস্তিকে (‘কিছু গোয়ালার গলি’) নতুন সমন্বিত বিপুল সন্তান। নিয়ে
সেই জগৎ আজ উপস্থিত। ইতিহাসের অব্যাহত নিয়মানুসৰে যা যাবাৰ তাই গেছে;
সেই শোকে যা আগত ও আগামী তাকে অস্বীকাৰ কৰাটা যুক্তিযুক্ত নয় (অবশ্য ‘একদা-
অগ্নিদিন-আৱেকদিন’ আৱ ‘কিছু গোয়ালার গলি’ ‘সত্যিকাৱেৰ গল্প হয়েছে’ কিনা তা যাবাবৰই
ভাল জানেন)।

‘সত্যিকাৱেৰ গল্প’ আজ যখন স্থষ্ট হওয়া সন্তুষ্ট নয়, তখন অবশ্যই যাবাবৰেৰ ‘জনান্তিক’
‘সত্যিকাৱেৰ গল্প’ হয়নি—এ আৱ বেশী কথা কি? তবে, এই রচনা ‘সত্যিকাৱেৰ’ কী
হয়েছে তা আমাদেৱ বুদ্ধিৰ অগোচৰ। মলী সেন নামধাৰী এক বিচিত্ৰ চৱিতকে কেন্দ্ৰ কৰে
লেখকেৰ ‘জনান্তিক’ নামধাৰী না-গল্প—না-উপন্যাস—না-প্ৰবন্ধ—না-কাব্যেৰ স্থষ্ট। সেই
মহিলাৰ পৱিত্ৰেশে ইঙ্গ-মাৰ্কিনী ‘আভিজাত্য’, বিলাসিতাৰ বাড়াবাঢ়ি, অপচয়েৰ ছড়াছড়ি।
নিজেৰ খেয়ালখূশী মত তিনি যা ইচ্ছে তাই কৱেন, কেননা, তিনি স্বামীৰ ভালবাসা পাননি
জীবনে। কেন? তাৱ মনেৰ সঙ্গে, মতেৰ সঙ্গে মেলেনি তাঁৰ স্বামীৰ মন ও মত
এতে স্বভাৱতই প্ৰশংসন জাগে মলী সেনেৰ মনটি বা মতটি কি রকমেৰ। মতঃ—ভাৱতবৰ্ষে
পেস্ বোলাৰেৰ অভাব, লাইকা ক্যামেৰা অপেক্ষা রোলীকৰ্ড সৰ্বাংশে শ্ৰেষ্ঠ। বিশেষ
ক্ষমতাঃ—বিশুদ্ধ ইংৰাজী উচ্চারণ (হিষ্টৱিকাল স্থলে হিটৱিকাল)। বিচিত্ৰত মনেৰ
থবৰ আমাদেৱ অজ্ঞাত।

আসল কথা হোল,—আমাদেৱ দেশেৰ ‘আভিজাত’ শ্ৰেণীৰ শূণ্যগৰ্ভ চটকদাৰী-সৰ্ববৰ্ষ
এক মেয়েকে কেন্দ্ৰ কৰে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে একসূত্ৰে গাঁথবাৰ ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰেছেন
লেখক। বিচ্ছিন্নভাৱে বিচাৰ কৰতে গেলে দুয়েকটি কাহিনী বা এসিসোড মন্দ লাগেনা
হয়তো (যেমন মাৰামাসি-গৌৰমোহন), কিন্তু সবে মিলে যে কি বিশেষজ্ঞ স্থষ্টি হোল—তা
জানিনো।

এই মলী সেন আৱ তাৱ পারিপার্শ্বিক তথাকথিত অভিজাত সমাজেৰ প্ৰতি লেখকেৰ
মনোভাৱ কৌতুকপ্ৰদ। ‘অভিজাত’ সমাজেৰ অসাৱতা আৱ অপচয়কে লেখক খেলাচলে
ব্যঙ্গ কৰতে ভালবাসেন। আবাৰ তাৱ নায়িকা (যাৱ প্ৰতি তাঁৰ কৌতুহল নেই, কিন্তু
‘মনোযোগ’ আছে—অবশ্যই সশ্রদ্ধ মনোযোগ) এই শূণ্যগৰ্ভ অসাৱতাৰ মাৰাখনে নিজেৰ
শূণ্যগৰ্ভ চমৎকাৰিত নিয়ে সমন্বয়ে বিৱৰণ কৰে। নায়িকাৰ চৱিত্ৰেৰ লব্যাকে লঘু কৰে গুৰুৰ
আৱোপ কৱবাৰ-কাজে লেখকেৰ আংপ্রাণ চেষ্টা আৱও হাস্তকৰ হয়ে উঠেছে। ভাৱসাম্য
ৱক্ষাৰ তাগিদে নায়িকাকে হতে হয়েছে রবীন্দ্ৰংশীতপ্ৰিয়—আৱ তাৱ অনিছাকৃত বিবাহেৰ
পশ্চাতে লেখককে দাঁড় কৱাতে হয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্যকে—বাবাকে নিঃস্বতাৰ হাত হতে
ৱক্ষাৰ দায়িত্ব। কিন্তু এত চেষ্টাতেও লেখকেৰ কাজ হাসিল হয়নি;—সমস্ত বই জুড়ে আপন
অকিঞ্চিতকৱতাৰ পৱিত্ৰ দেয় যে মেয়ে—কৃত্ৰিম উপায়ে পাঠকেৰ মনে তাৱ প্ৰতি সহাহৃতি

বাংলা কথাসাহিত্যে ছুটি দিক

জাগাতে লেখক সমর্থ হবেন কি কোরে? আর যে চরিত্র পাঠকের মনে কোন সহানুভূতি জাগায় না, তার পরিণতি সম্পর্কেও পাঠক স্বত্বাবতই উদাসীন হয়। তাই পরিশেষে, মায়িকার জীবনে বেদনাবিধুর ট্র্যাজেজোর উন্নত হোল—এই ‘সত্য’ উপস্থাপিত করবার কাজে মায়িকার পক্ষে লেখকের ওকালতি নিষ্ফল হোল।

শুন্তগর্ত ‘অভিজ্ঞাত’ শ্রেণীর ফাঁপা চরিত্রগুলিকে নিয়ে লেখা এই শুন্তগর্ত রচনাটি পড়ে, ননী ভৌমিকের অনুসরণে এর সঙ্গে একটি মাত্র জিনিসের তুলনা করতে মন চাষ—‘হট কেক্স’ ‘ডিনার-টেবিল’ ধার যথাযোগ্য আসন।

* * * * *

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে হালের আমলের এই ‘যায়াবরী’ অসারতা আমাদের তখনই হতাশ করেনা, যখন আধুনিক সাহিত্যের বলিষ্ঠ জীবনধর্মী ধারাটি সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় আজকের দিনের যে শিল্পীগোষ্ঠী জীবনের বাস্তব সত্য অবলম্বনে সাহিত্য রচনার বেলা সমস্ত বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করছেন, তাঁদের জয়বাজার সার্থকথা এই অন্তঃসারশৃঙ্খল দেউলেপনাকে অগ্রাহ করবার প্রেরণা দেয়। যে জীবন আগত এবং যা আগামী তাঁর সর্বাঙ্গীন রূপায়ন এই নতুন সাহিত্যকে অশেষ মূল্যাদিকারী করে তোলে।

‘পদ্মানন্দীর মাঝি’ আর ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’র মাণিক বন্দেয়াপাখ্যায়ের সাময়িক অধ্যপতন আমাদের মনকে বিশ্বক করে তুলেছিলো। মানসিক অস্থৃতা (morbidity) তাঁর রচনাকে ক্রমাগতই জীবনবিদ্বেষী, পদ্মু করে তুলছিল। কিন্তু সম্পত্তি প্রকাশিত ‘সোনার চেয়ে দামী’ উপন্যাসে আমরা আবার ‘পদ্মানন্দীর মাঝি’র মাণিকবাবুকে ঘেন ফিরে পেলাম। সমস্ত অস্থৃতাকে কাটিয়ে উঠে তাঁর রচনা আবার বলিষ্ঠ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মধ্যবিত্তসমাজের দুঃখবেদনাকে চিত্রিত করবার বেলা এবার মাণিকবাবু কোন বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দেননি, বরং তাঁর সহানুভূতিশীল মনের ছাপটি এখানে স্পষ্ট। এই মধ্যবিত্তসমাজের সর্বগ্রামী ভাস্তবকে ক্রপায়িত করবার বেলা সন্তোষ ঘোষ তাঁর ‘কিমু গোয়ালার গলি’ উপন্যাসে যে স্তুতীর জীবনবোধ আর অসামান্য শিল্প-নৈপুংগের পরিচয় দেন, ‘সত্যিকারের গল্প’ না হওয়ার অজুহাতে তাকে অস্বীকার করা হয়তো যায়াবরের পক্ষেও অস্তুব হবে। প্রবেশ সাম্রাজ্যের ‘বনহংসী’ উপন্যাসে এক অসামান্য ‘বাস্তব’ সমাজচিত্র পাওয়া যায় বলে যাঁরা সম্পত্তি ইঁক ডাক শুরু করেছেন, তাঁদের এটুকু জানা দরকার, ‘বনহংসী’র তথাকথিত বাস্তবতা আর ফাঁকা আদর্শবাদের জগাখিঁড়ি ‘কিমু গোয়ালার গলি’তে নেই, এদিকে চরিত্রচিত্রন আর ঘটনাবিদ্যাসে শিল্পীর যে বাস্তবচেতনার পরিচয় এ উপন্যাসে পাই, ‘বনহংসী’র কোথাও তাঁর চিহ্ন মাত্র মেলেন। নববেদ্যনাথ মিত্রের ছোট গল্পে আর নবীন লেখক সমরেশ বস্তুর রচনায় এই বলিষ্ঠ বাস্তববোধ আর শিল্পনৈপুণ্যের সমষ্ট বাংলা-সাহিত্যধারার অগ্রগতি সংস্কৃতে আমাদের নিঃসন্দেহ করে তোলে।

এই নবপ্রচেষ্টার মাঝাখানে গোপাল হালদারের ‘একদা-অগ্নিদিন-আরেকদিন’ কেবল

প্রতিনিধিত্বানীয় রচনা হিসাবেই গণ্য হবেনা—বাংলা সাহিত্যে সার্থক উপন্যাসের সংখ্যালভতা-জনিত কল্পনা লাভ করবার গৌরবও এর প্রাপ্য। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে যাঁরা হোমরা-চোমরা গোছের আমীর-ওমরাহ এ স্থষ্টি যদি তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় তবে দুঃখিত হবোনা, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে এ রচনার গ্রন্থ পরিচয়টি অনাবিস্কৃত থাকলে, সেটা অনেকটা ক্ষতিকর এবং দুঃখজনক হবে।

গোপালবাবুর এ স্থষ্টি একাধারে সাহিত্য এবং ইতিহাস, তাই একে মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে মন কুষ্টিত হয় না। বিংশ শতাব্দীতে বাংলার চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থ সংঘাত, এবং সেই সংঘাতের মাঝখান দিয়ে বাদামী সমাজ যে অবশ্যভাবী পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, সেই ঐতিহাসিক সত্যই উপস্থাপিত হয়েছে এই উপন্যাসমালায়। নায়ক ‘অমিতের’ মধ্যে তাঁর সমগ্র পরিবেশ (রাজনৈতিক ও সামাজিক) গ্রন্থিত হয়েছে, আবার অমিতের দৃষ্টিকোণ হতেই লেখক সমগ্র পরিবেশের উপরে আলোকপাত করেছেন। ‘গোরা’র মধ্যে যেমন করে পাই উনবিংশ শতাব্দীর সর্ববিধ কুসংস্কারমুক্ত নবজাগরিত মানবিক চেতনার প্রতিচ্ছবি, জাঁ ক্রিস্টফের মধ্যে যেমন মেলে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশের বিকল্পে বিদ্রোহী নবচেতনার রূপ, ‘অমিতের’ মধ্যে তেমনি করে পাই, আমাদের আজকের দিনের বিদ্রোহী চিন্তা এবং কর্মোন্নাদনার সৃষ্টি রূপায়ন।

কোনক্রমেই যখন কোন শ্রেষ্ঠ স্থষ্টির মূল্য অস্বীকার করা সম্ভব হয় না, তখন সৌখিন সমালোচকেরা তাঁর আঙ্গিকরণ কাল্পনিক ভৃতি আবিষ্কার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। সোভিয়েট চিত্রকলার আঙ্গিকের বিকল্পে সমালোচনার বচা যখন কলকাতাকে প্লাবিত করে তুলেছিলো, তখন ‘পরিচয়’ পত্রিকায় গোপালবাবুই জানান, শ্রেষ্ঠ শিল্প স্থষ্টিতে আঙ্গিক বিষয় বস্ত্রের অরুগামী হয়, স্টাইল বা টেকনিকের কালোয়াতি যে সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ, তা আর যাই হোক শ্রেষ্ঠ স্থষ্টির মর্যাদার অধিকারী হয়না। গোপালবাবুর এ উপন্যাসমালার বেলাতেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। মহাকাব্যেগঘোগী বিষয়-বস্ত্রের অরুগামী যে বলিষ্ঠ আঙ্গিকের ব্যবহার গোপালবাবু করেছেন, তাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘ক্লাসিক’ বিশেষণে অভিহিত করে স্ববিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন বলেই মনে হয়।

দুর্বল ভাবানুভাব, ফাঁপা আদর্শবাদ, সৌখিন আধ্যাত্মিকতা আর টেকনিকসর্বৈষ শুণ্যগর্ভ চালবাজির সর্বগ্রাসী কবল হতে আপনাকে রক্ষা করবার শক্তি বাংলা সাহিত্যের প্রাণবন্ত দিকটি সংঘর্ষ করেছে, এ সত্য আমাদের আশাকে পরিত্পত্তি করে, আর সেই সঙ্গে সমস্ত সৌখিন সমালোচনাকে তুচ্ছ করে নতুন আশাসঞ্চারণ করে আমাদের মনে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার গতি

শ্রীসুম্মাত গংগোপাধ্যায়—ষষ্ঠ বর্ষ, বিজ্ঞান

পুরাতনীর চিরস্তন পথ পরিহার ক'রে নতুন পথ স্থষ্টির যে প্রয়াস, তাকেই আমরা বলি আধুনিকতা। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। অবশ্য 'আধুনিক' কথাটার বিশদ সংজ্ঞা নিয়ে ইতিপূর্বে বহু বিতর্ক—বিচার ও বাগ্বিস্তাৰ হ'য়ে গেছে। তবু সাম্প্রতিক বা আধুনিক কবিতার মানসপ্রকরণ আলোচনা প্রসংগে এখানে এটুকু বলা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হ'বে না যে, যে-কোনো পরিবর্তন বা নৃতন্ত্রকেই আধুনিক বলে দাবী করা যায় না—যদি না তাৰ পেছনে থাকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীৰ প্রেরণা। এই দৃষ্টিভঙ্গীৰ পরিবর্তনেৰ মূলে রয়েছে মানবদেৱ সমাজ-বিবর্তনেৰ ইতিহাস। তাই আধুনিক কবিতাকে শুধু কাব্যবোধেই নহ, যুগবোধেও আধুনিক হ'তে হবে। রবীন্দ্রনাথেৰ উক্তি এই প্রসংগে স্মরণীয় : “যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ কৰেছে, সেই কালটি লেখকেৰ ভিতৰ দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পাৰি বা না পাৰি, এ কথা বলা চলে যে, লেখকেৰ কাল লেখকেৰ চিন্তেৰ মধ্যে গোচৰে ও অগোচৰে কাজ কৰছে।” অৰ্থাৎ যুগেৰ হাওয়া এসে লেখকেৰ মনে চেউ তুলবেষ্টি, তিনি যতোই আত্মকেন্দ্ৰিক বা অস্তমুখীন হ'ন না কেন।

রবীন্দ্রনাথেৰ লিৱিকমার্গ থেকে বাংলা কবিতার বিচ্যুতি ঘটিছে বহুকাল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে গেছেন। তাৰপৰ বাংলাদেশেৰ বুকেৰ ওপৰ দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মৰ্মস্তৰ ও মহামাৰীৰ বাড়াঝাঁ বয়ে গেছে। ফলে সমাজেৰ বনিয়াদে সেদিন ভাঙ্গে ধৰেছিল। সেদিনেৰ কেন্দ্ৰিয়ত ক্ষয়িয়ু জীবন মধ্যবিত্ত মানুষেৰ মনে এনে দিয়েছিল দৈনন্দিন আৱি নিৱাশেৰ শৃংগতা—তাৰ চারিদিক শুধু অবিচ্ছিন্ন হাহাকাৰ আৱ মৃত্যুৰ মিছিল। যুদ্ধোত্তৰ সমাজ-জীবনেৰ এই অবক্ষয় চতুর্থ দশকেৰ বাংলা কবিতার ওপৰ তাৰ কৱাল ছায়া বিছিয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনেৰ এই হতাশা, হাহাকাৰ আৱ কদৰ্তা কবিৰ স্বন্দৰেৰ স্বপ্নকে সেদিন আচ্ছন্ন কৰে দিয়েছিল। তাই চতুর্থ দশকেৰ কাব্য ছিল ভাঙ্গেৰ কাব্য—সেদিনকাৰ কবিতায় ছিল শুধু অবিষ্টাস, অবসাদ, আত্মবিলাপ আৱ অস্থু নেতৃত্বাদ। এই ধূসৰ বিবৰণ জীবনেৰ রিক্ততাৰ কথা মনে কৰে সেদিনেৰ কবি লিখেছিলেন :

‘আমাৰ কথা কি শুনতে পাও না তুমি,

কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?

কোথায় লুকাবে ? ধূধূ কৰে মৰুভূমি,

ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মৰে গেছে পদতলে !’

(উটপাথী : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

‘ইতস্ততঃ মনের অলিগলিতে

অসমাপ্ত সাধনা ।

অঙ্গাপের রৌদ্রে জলে

দিঘিজয়ী কামনা ।

বেড়ায় ঘেরা বাগানে আজ

ভদ্র পদচারণা ।’ (পদচারণা)

দিনেশ দাসও কাব্যরীতিতে দুই দশকের মধ্যে পঞ্চী । আধুনিক মনের জটিল সমস্যা তাঁর কাব্যেও সংক্রান্তি, কিন্তু বিষয়বস্তুকে ছাড়িয়ে তা এক স্বচ্ছ সৌন্দর্যলোকের দিশারী । তাঁর কাব্যে নতুন শব্দসংগ্রহের চমক নেই, কিন্তু ছন্দে, মিলে আর ধ্বনিমাধুর্যে তা স্থথন্ত্রাব্য :

‘এই যে খুনে সভ্যতা ।

অনেক জনের অম মেরে কয়েকজনের ভব্যতা ।

এগোয় নাকে। পেছোয় নাকে। অচল গতি ত্রিশঙ্কুর—

হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আস্তাকুড় ।’ (কালো আকাশ)

রোমাঞ্চিক কবিতার অপূর্ব সৌন্দর্যস্থষ্টিতেও তাঁর নৈপুণ্য বিশ্যবকর :

‘আমি যদি ওই টেউয়ের মতই

চুপেচুপে ভেঙে ষেতাম তোমার দেহে

অক্ষুট গুঞ্জনে

সারাদিন—সারারাত—

আর তুমি যদি ওই নির্জন সবুজ ধীপ হ’তে !’ (সবুজ ধীপ)

বাংলা কাব্যের আংগিকে এক মৌলিক সুর এনেছেন অশোকবিজয় রাধা । গঁরের আভরণে কাব্যের এই নবসজ্জা বাংলা কাব্যসাহিত্যে নতুন আবিষ্কার । অশোকবিজয়ের মন বুদ্ধিবিলাসী নয়, প্রাণশক্তিতে উচ্ছল । স্বল্প কয়েকটি আঁচড়ে এত ব্যঙ্গনা, এত বর্ণাত্যতা শুধু তাঁর তুলিতেই সন্তুষ্ট । শুধু প্রকৃতির ছবি নয়, প্রকৃতির সন্তান যে মানব-মানবী—তাদের দুঃখ-দৈন্যের ছবিও জীবন্ত করে তুলতে তিনি সিদ্ধহস্ত । কখনো কখনো তাঁর লেখায় একটা mysticism-এর আভাস পাওয়া যায় :

‘স্পন্দনেথি

ধ্বনিবে জ্যোৎস্নারাতে সাদা দুই বলিষ্ঠ বলদ

চাষ করে শৃণ্য মাঠ ।

কে যেন হঠাত এসে বলে,—

‘এখানে তারার চাষ হবে’...’ (তারা চাষের স্পন্দন)

কিন্তু অশোকবিজয় শুধু স্বপ্নের মায়াঙ্গন চোখে লাগিয়ে দেশের সমস্যা ও জটিলতা থেকে দূরে থাকতে চান নি, তিনিও স্পন্দনেথেছেন স্বচ্ছ-মুক্ত সমাজের :

‘ডলু নদীর তীরে মাঠের মাঝখানে একটো মন্ত ট্রাকটো
কে চালাচ্ছে ?

হৃদের বুক থেকে উড়ে আসে এক লাল পরি
পাখা মেলে ট্রাকটোরে বসে—’ (উড়ো চিঠির ঝাঁক)

বিগত যুগের রোমান্টিক-বিমুখতার মধ্যে আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয়ে ছিলেন জীবনানন্দ দাশ,
বৃক্ষদের বস্তু, অজিত দন্ত। পঞ্চম দশকের গোড়ায় বাংলা কবিতা যখন রোমান্টিসিজমের
পরিত্যক্ত খাত দিয়ে আবার পূর্ণবেগে প্রবাহিত হচ্ছে, এই সময় জীবনানন্দের প্রভাব তরুণতর
কবিদের ওপর প্রবলভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল ; আজকের কবিতা কিন্তু সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে
সচেষ্ট। তবু কোন কোন শক্তিমান কবির লেখা আজো জীবনানন্দের সেই স্মৃতিমাহিত বেদনার
ধূসর নির্জন স্বরটুকু মনে করিয়ে দেয়। যেমন বৌরেন্জ চট্টোপাধ্যায়ের :

‘সময় বারিয়া পড়ে নির্জন হপুরে—

যেখানে বসিয়াছিলে একদিন মুখোমুখী, তোমার চুলের গন্ধ
বাসি হয়ে ধূলো হয়ে উড়ে

ক্লান্ত করে দিয়ে যায় যেখানে সুর্দের গান, তোমার

আমার সেই ছোট চিলে ঘৰে ।’ (সময় বারিয়া পড়ে)

অথবা চিত্ত ঘোষের :

‘আকাশের ছায়া দেখে মাঝে মাঝে কখনো কখনো

কোন এক সন্ধ্যাবেলা পুরুরের ছায়াত্তীরে এখনো কি এক হয়
আমাদের মন ?

এক হয়—এক হয়—ভরে তোলে জীবনের সবটুকু ফাঁক,

নীল জল, পুরুরের ঢালু পার, বেল লাইন, তুমি আর জলচর
ভাঙ্কের ডাক !’ (দেখা)

বৌরেন্জ চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় একটি সদাচান্ত আবেগপ্রবণ মনের সন্ধান পাওয়া
যায়। তাঁর কবিতার স্তরে শুধু ধূসর স্মৃতির ক্লান্ত কানা-কানি আর বিচ্ছেদের বিষণ্ণ হাহাকার।
চিত্ত ঘোষের কবিতায় ধৰনির মাধুর্য আর অভুভূতির স্থিক্ষণ মনে দোলা দেয়।

যারা জীবনের সংক্ষয় দু'হাতে বিলিয়ে দিয়ে আজ সব হারালাম, তবু জীবনের কাছে
বিনিয়য়ে কিছু পেলাম না—এমনি আশাভংগের করুণ স্তুর নরেশ গুহর কবিতায় :

‘এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম

এত পথ হেঁটে, এত জল ঘেঁটে কী তবে হলাম ?’

(খরজীবনের মধ্যবেলায়)

জীবনের প্রশংসনে তাঁর মন সততজিজ্ঞাস্ত এবং জীবনের অলিগলি হাত্তে এই
জিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে তাঁর শাস্তি নেই :

তাঁর কবিতায় আশাবাদ কথনোই পরাজয় মানে না, রহস্য স্বাধীন জীবন-যাপনের স্থপ তাঁর চোখে :

‘বগীঁ এল দেশে ; আহুক ; তবু দেশটা সজাগ,
তবু পাতায় কচি ঘাসেই ঘোর বাঁধা এ সবুজ,
তবু সকালবেলার ধানীরভের মন-কেমন,
তবু থাকব ঘরে ঘরের বট, মরদ জোয়ান ।’ (তবু)

জগন্নাথ চক্রবর্তীও সমাজচেতনায় মংগলাচরণের সমগোত্তীয়।
বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ চিত্রে ‘জটিলুড়ীর নববর্ষ, ১৩৫৩’ তাঁর সার্থক স্থষ্টি :

আজো সেই ভাঙা বেড়া, শূন্য ফেত, ছিঁড় চাল

—আরো কত কাল ?’ (জটিলুড়ীর নববর্ষ, ১৩৫৩)

বলিষ্ঠ বিপ্লবাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী আর স্বতঃসূর্য কাব্যপ্রতিভার জগে প্রগতিশীল লেখকসমাজে বিমলচন্দ্র ঘোষের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। কাব্যজীবনের আদিতে তিনিও ছিলেন রোমাণ্টিক কবি। কিন্তু প্রেমের কবিতার নায়িকা খোজার জগে তাঁকে বিদেশী সাহিত্যের কাছে হাত পাততে হন নি, দেশের মাটিতেই তিনি তাঁর কাব্যের প্রেরণা কুড়িয়ে পেয়েছেন :

‘সহস্র কাজের ফাঁকে শ্বরণের নিভৃত মুকুরে
বার বার কাঁপে সেই মুখ,
দেবদৈত্য বিজয়নী সেই তন্ত্যীতন্ত্যুর ঝজুতা,
ছুটি চোখে বিহ্বতের উজ্জল ভূমি
মনে পড়ে কৃষ্ণনাগিনী ।’ (তিলোভূমা)

পরবর্তী কালে বিমলচন্দ্র ঘোষের কাব্যে সমাজবোধের বিকাশ ও শ্রেণীচেতনার উমেষ লক্ষ্যান্বিত আংগিকের আলংকারিক দিকগুলো বর্জন করে আজ তাঁর কাব্যে সহজ ও স্বচ্ছ আবেদ অঙ্গীকৃত। সাস্ত্রিক সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে তিনিই আজ বিদ্রোহে সবচেয়ে দৃষ্টিকৃত :

‘ক্ষুধাকে তোমরা বেআইনী করেছ
ক্ষুধিতদের আখ্যা দিয়েছ বিপজ্জনক !
উদ্বাস্ত নরনারীর অবাস্থিত শোভাযাত্রা
তোমাদের নিশ্চিন্ত শাসনের ব্যাঘাত করে,
তুর্ভূগা লক্ষ্মীছাড়াদের চিংকারে তোমরা বিত্রত বোধ করো !
হে পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত মহানায়কেরা !
আহা তোমাদের কী কষ্ট !’ (ক্ষুধা)

তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে একদিকে যেমন প্রচুর ব্যংগের ছসেহ জালা, তেমনি আবার মর্মাণ্ডিল বেদনার সক্রণতা।

স্বকান্ত ভট্টাচার্য এই দশকের কাব্যজগতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার। তিনি এ যুগের তত্ত্বাবধান করি হলেও তাঁর কবিতার আবেদন আজ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রসারিত। বাংলাদেশের পাঠকেরা স্বকান্তের কবিতা ভালবাসে ‘তাঁর বলিষ্ঠতার জন্য, অকৃতোভয় সামাজিকাদ-বিবেচিতার জন্য, সামাজিক শোবণ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্বস্পষ্ট প্রতিবাদের জন্য, গভীর স্বদেশ-প্রেমের সংগে প্রগতিশীল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ের জন্য’। ১৩৫০-এর দ্রুতিক্রম আর মুত্যুর আগুনে বল্সে যে কালান্তর নতুন মূল্যবোধের দাবী নিয়ে এল, তাঁর সার্থক প্রকাশ দিনে দেখা দিয়েছিল বাংলার কনিষ্ঠতম কবির কষ্টে। সাধারণ মানুষের সংগে এমন একান্ত হ্বার অস্থুতিকেই বোধহয় মাও-সে-তুং বলেছেন : ‘transformation of sentiments, a changing over from one social class to another’। স্বকান্তের জীবনবোধের প্রতীতির সংগে তাঁর কবিসন্তার অচ্ছেত সাধুজ তাঁর কবিতাকে মহত্তর সার্থকতা দান করেছে এবং নতুন মূল্যাঙ্কনে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতার অন্ততম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকাশভঙ্গী—গঠনযুক্ত সৌন্দর্যস্থাপ্তির সংগে সহজ অথচ দৃষ্ট বাক্বিদ্যাপের সময়ে এক অপূর্ব বাংকারের স্ফটি করে। স্বকান্ত বিপ্লবী কবি, তাঁর বিদ্রোহী সত্তা আশাবাদের শিখায় সতত প্রজ্জলিত :

‘ভারতবর্ষের ’পরে গলিত সূর্য বারে আজ—
দিঘিদিকে উঠেছে আগুজাজ,
রক্তে আনো লাল,
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
উক্ত প্রাণের বেগে উন্মুক্ত আমার এ দেশ,
আমার বিদ্বন্ত প্রাণে দৃঢ়তায় এসেছে নির্দেশ !’ (বিবৃতি)

স্থবর,—

‘অন্দুর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্রদিন জরোন্মত পাখা,
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব, মুক্তির পতাকা ;
আমার বেগোক্ত হাত, অবিরাম যত্রের প্রসব,
চুচুর, প্রচুর স্ফটি ; শেষ বজ্র স্ফটির উৎসব !’ (শক্র এক)

ইকান্ত সকল অকালমৃত্যু তাঁর কাব্যজীবনে আকস্মিক ছেদ টেনে দিয়েছে। তবু জীবনের শ্রম বক্তবিদ্যু পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করে গেছেন উৎপীড়িত জনগণের হাতে হাতে মিলিয়ে। নৈতিক মানুষের জন্য শাস্তি-নীড় চচনার ঐকান্তিক ইচ্ছা তাঁর কষ্টে ভাষ্য দিয়েছে :

‘চলে যাবো—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপাণে পৃথিবীর সরাবো জঙ্গাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য ক’রে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অংশীকার !’ (ছাড়পত্র)

এই রোমান্টিক-প্রবণতার যুগে আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয়ে আছেন এঁরা—সুকান্ত-জগন্ম-বিমলচন্দ্র-মংগলাচরণ। যদিও চল্লিত দশকের তরুণতম কবিদের ওপর রোমান্টিক কাব্যের প্রভাব আজ সবচেয়ে শক্তিশালী, তবু বাংলাৰ বিশ্বৰূপ জনমনে সাম্যবাদী কবিগোষ্ঠীৰ আবেদন আজ কুমৰবৰ্মান এবং বাংলা কবিতাৰ এই দ্বিবিভক্ত ধাৰাকে কেন্দ্ৰ কৰে' কাৰ্য-উপাসকেৰা পৃথক শিৰিৰে বিচ্ছিন্ন। নয়। চীমেৰ অভ্যন্তৰ, নবগঠিত রাজনৈতিক দৃষ্টিচেতনা, দেশব্যাপী অসন্তোষেৰ আলোড়ন এবং মায়াকেভ-ক্ষি-সিমোনভ-আৱাঁগ-নেৱন্দা-নাজিম হিক্মতেৰ কবিতাৰ সংগে পরিচিতিৰ অপরিহাৰ্য পরিণতিতে বাংলা কাৰ্য-জগতেৰ ওপৰ রাজনীতিৰ দুৰ্বাৰ গঢ়াৰ কৰমেই প্ৰবলতাৰ হ'য়ে উঠছে। ফলে বাংলা কবিতাৰ বৰ্তমান রোমান্টিক-প্রবণতাৰ স্থায়ি অথবা পৱনৰ্ত্তী যুগেৰ বাংলা কবিতাৰ ধাৰা সমৰক্ষে এখন কোনো ভবিশ্যতবাণী কৰা দুঃসাধা—গৈ ধাৰালুক্রম আগামী যুগেৰ কাৰ্য-সম্পিপাস্তদেৰ বিচাৰ্য।*

দেখা

হীৱেন চক্ৰবৰ্তী—ষষ্ঠ বৰ্ষ, আঁট্স

তীক্ষ্ণ কঠিন তীব্ৰ মদিৰ তিক্ত মধুৰ চৈত্ৰে
এই বুৰি ঝি মিথুন দুটিৰ কৈশোৱে অস্থিষ্ঠ।
মন্তো দুপুৰ একলাভাবাৰ, গহন রাতে বৃষ্টি :
কী খোজে ঝি ছেলেটিৰ চোখ, বিপুল ব্যথায় পূৰ্ণ ;
কী যে মেয়েৰ চাওয়া ছিলো,—ভজদেৱই দৈঘ্য।
অবশ্যেৰে দেখায় তাৰা পেলো মানসমিত্বে।

তীক্ষ্ণ কঠিন তীব্ৰ মদিৰ তিক্ত মধুৰ চৈত্ৰে
কাছে আসাৰ প্ৰবল টানে ভালোবাসাৰ ইচ্ছে
স্বৰ্গে যাওয়াৰ আকাশ নিলো ; সমৱ-ভৱা মুৰ্ছা
হাওয়ায়-হাওয়ায়, অঙ্কুৱে, জলেৰ গানে কীৰ্তি।
কাৰা-পা-ওয়ায়, রুখে-থাকায় গক্ষে ভৱে শৃণ্য।
অবশ্যেৰে দেখায় দুজন পেলো মানসমিত্বে ॥

* রচনাটিতে যে দশকগুলিৰ উল্লেখ কৰা হয়েছে সেগুলি বাংলা সাল অনুযায়ী।

ବୃକ୍ଷଶେଷେ ବିକେଳ

ସୁଶୀଳ ଦୋସ—ସଞ୍ଚ ବର୍ଷ, ଆର୍ଟ୍-ମ୍

ବୃକ୍ଷଶେଷେ ଉଧାଓ ମେଘ ଆକାଶ ଚୁପ ନୀଳ
ମଲିନ ଦିନ ଶାନେର ଶେଷେ ହାସିତେ ବାଲମଲ
ରମଣୀ ରୋଦେ ହୃଦେର ଜଳେର ହଦୟ ଟଲମଲ
ମେଘେର ଘରେ ବନ୍ଦ ହଲୋ ଥିଲ ।
ଏବାର ତୁମି ଜାନାଲା ଖୋଲୋ, ଆକାଶେ ଚୋଥ ତୋଲୋ
ହଲୁଦ ଆଲୋ ତୋମାର ଚୋଥେ, ରମଧନୁ ରଙ୍ଗ ଆଲୋ
ମିତେନୀ ଆହା, ଲୁଟିଯେ ବୁଝି ପଡେ
ତୋମାର କାଲୋ ଏଲୋ ଚୁଲେର 'ପରେ,
ତାଥୋ ନା ଚେଯେ ରୁପୁର ପରେ ରୋଦେରା ସେବ ସହେଲୀ ହସେ ଏଲୋ ।
ମେଘେର ଘରେ ବନ୍ଦ ହଲୋ ଥିଲ
ବୃକ୍ଷଶେସ, ଆକାଶ କେମନ ନୀଳ ।

ଆକାଶ କେମନ ନୀଳ !
ବର୍କୁଲାଳ କୁଷ୍ଣଚୂଡ଼ାୟ ରଙ୍ଗେର ବିଲିମିଲ ।
ଗାଛେରା ସବ ନେଯେ ସବୁଜ, ଖୁସିତେ ଆକୁଳ ହାତ୍ତ୍ୟା
ତୋମାର ଗାଲେ ନରମ ହାତ ବୁଲିଯେ ଚଲେ ଗେଲୋ ।
ଆକାଶେ ଖୁସି, ବାତାସେ ଖୁସି, ଖୁସିତେ ଗାନ-ଗାନ୍ୟା
ବୃକ୍ଷ-ଦୋସ ସବୁଜ ବିକେଳ ସୋନାର ନାଯେ ଉଜାନ ବେଯେ ଏଲୋ ।
ହୃଦେର ଜଳେ ଏଥନ ବିକେଳ ହଲୋ
ଗାଛେର ପାତା ମନେର ରଙ୍ଗେ ଛାନ୍ୟା
ଖୁସିତେ ଆକୁଳ ହାତ୍ତ୍ୟା ।
ବଲୋନି ତୁମି, ବଲୋ ନା ଏବାର ବଲୋ
ତୋମାର ମନେର ସୋନାର ହରିଣଟିରେ
କେମନେ ଯାଯ ପାନ୍ୟା ।

সুধা-সন্ধান

শিশিরকুমার দাশ—৩৩ বর্ষ, আর্ট্স

এত মহন তবুও অমৃত বাবে না কই !

প্রশান্তনীল সাগর সলিল উচ্ছিস' ওঠে

এ বিষের জালা আর কতদিন হৃদয়ে বই !

নিঃশ্বাস' বিষবায় এই প্রাণ ধূলায় লোটে,

শোণিতে সিক্ত মমতাবিহীন মরুর মাটি ;

আবেগে অক্ষ ছুটেছি : অমৃত যদিবা জোটে !

কত যুগান্ত হ'ল আরো কত যাবে বা কাটি'

বনের গহনে মায়াবী মরণ তুলেছে ফণা

তবু পাবো তা'কে তাইত' চলেছি পথেতে হাঁটি ।

শিহরিত হয় কৃষ্ণপঙ্কে কুম্ভন্ধা

তারা নিতে যায় মহরগতি মেঘের রাশে

জ্যোতিহীন পথ : তবু যদি মেলে অমৃত কণা ।

শাণিত দন্ত শাপদেরা আজো হিংস্র হাসে

কত নদীহৃদ পার হয়ে আমি এসেছি কবে

তবু তারা আজো যত্যুর বিষ সাথেতে আসে ।

বিরাট বেদনা ব্যাপ্ত আকাশে—বক্ষে লবে'

কে আজ বহন করবে নিবিড় বিষের জালা

নীল সমুদ্র কত উত্তরোল আরো বা হবে !

এত মহন তবুও অমৃত বাবে না কই !

প্রশান্তনীল ফেনিল সলিল উচ্ছালি ওঠে

এ বিষের জালা আর কতদিন হৃদয়ে বই !

দেখ, দিগন্তে সোনালি সন্ধ্যা, রাত্রি নামে

সেখানে শান্তি, আকাশ-আশ্রিত অমৃত বাবে

দিনের ক্লান্ত ক্লিষ্ট তরণী সেখানে থামে ।

সেখানে শান্তি, আকাশ-প্রসাদ অমৃত বাবে

এখানে বিষের ভীষণ নিবিড় কি যে সে জালা

নিঃশ্বাস' বিষ-বিলাসী বাতাস মাঝুষ মরে ।

ତାଇତ' ବୁକେର ଜାଳା ଦିଯେ ଗାଁଥି ଜୀବନ-ମାଳା
ଅଧାରେଇ ଚଲି ଯୋଜନବିହୀନ ପଥେର ଧାରେ
ଯୁତ୍ତାର ମେର ପାର ହସେ ପାବୋ ସୁଧାର ଡାଳା ।

କ୍ଷାପୁକ ରାତ୍ରି ତବୁ ଓ ଯାତ୍ରା ସାଗରପାରେ
ଏତ ପ୍ରାଣ ଦିଯେ ମହନ ସାର ଏଦିନଓ ଚଲେ
ତା'କେ ପେତେ ଚାଇ ବିଷ-କୁଞ୍ଚିତ ପ୍ରାଣେର ଧାରେ ।

ଆରୋ ମହନ, ହୋକ ଆରୋ ଜୋର ସାଗରଜଲେ
ନିଃଶୀମ ନୀଳ ଆକାଶ ହତେଇ ବାରବେ ମଧୁ
ପିଯୁଷ-ପିଯାମୀ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣ-ପର୍ଣ୍ଣ ଦଲେ ।

ଶ୍ରୀଯୋପୋକ

ଦୀପୋତ୍ତନାଥ ବନ୍ଦେତ୍ୟପାଧ୍ୟାୟ—ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ, ଆଟ୍-ସ

ଜମାଦାର ଏସେହେ !

କଥାଟା ବିହାତେର ମତ ଚାରଦିକେ ରଟେ ଗେଲ । ଏ ବାଡ଼ି, ଓ ବାଡ଼ି ; ଏ କୋଣ, ଦେ କୋଣ ଥେକେ ଅନେକେଇ ଏସେ ଭୀଡ଼ କରଲ ଉଠୋନେ । ବାପ ବାପ କରେ ଖୁଲେ ଗେଲ ଜାନଲାର ପାଣ୍ଠା । ଛାଦେର କାନିସେ ଉକି ମାରଲୋ ନାନା ଆକାରେର ଅନେକଙ୍ଗଲୋ ମାଥା ।

ଆଜ ବୁଡ୍ଗୋ ମାହସେର ଦ୍ୱାତେର ମତ ନଡ଼ବଡ଼ କରଛେ ଦତ୍ତଦେର ବାଡ଼ି । କିନ୍ତୁ ଏକକାଳେ ଓରାଓ ଯୈବନ ଛିଲ, ଶ୍ରୀ ଛିଲ, ଛିଲ ଛାଦ । ବନେଦୀ ପରିବାର । ଟାକା ମେଇ, କିନ୍ତୁ ମାନ ସାଯ ନି ତାଇ ବଲେ ।

ଉଠୋନଟ୍ୟ ଛୋଟ୍ । ତାର ଏକଦିକେ ବଡ଼ ଶରିକେର କଳ, ଚୌବାଚା ଆର ପାଇଥାନା । ଅନ୍ତଦିକେ ତାଳା ଲାଗାନୋ ରାନ୍ଧାର । ସାମନେ ବେଶ କିଛୁଟା ଜମି । ଏକଟା ବିରାଟ ଶିଉଲୀଗାଛ ଅନ୍ଧାର ଡାଳପାଳା ମେଲେ ତାର ଆଧିଥାନା ଅଂଶ ଜୁଡ଼େ ଆଛେ । ବାକି ଆଧିଥାନାଯ ଗୋଟା ଆଟେକ କଳା ଆର ଏକ ବାଡ଼ ଚିନେ ଜବା ଛଡ଼ାନୋ ।

ଚାର ଦିକେ ଶୁଶ୍ରୁ ବାଡ଼ିର ପର ବାଡ଼ି, ଇଟେର ପର ଇଟ୍ । ଶ୍ର୍ଵ୍ୟ ଚୋଥେ ପଡ଼େ ନା । ମଧ୍ୟ କମକାତାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶେ ଏହି ଏକଫଳି ସବୁଜ ଜମି ଦେଖିଲେ ସତିଜିଇ ଅବାକ ଲାଗେ । ଗ୍ରାମେର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯାଏ ।

ତାଇ ଅନେକ ଇତିହାସ ଆଛେ ଏଥାନକାର, ବିଶେଷ କରେ ଶିଉଲୀ ଗାଛଟୁକୁର ।

ଜମାଦାର ଏସେହେ, କେ ଯେନ ବଲଲେ ଆବାର ।

আরো অনেকে ছুটে এসে ভীড় করল উঠোনে। তারপর অন্তত দৃষ্টি মেলে তাকাল পরস্পরের দিকে।

গিন্নী দাঁড়িয়েছিলেন চৌবাচ্চার গা দেঁয়ে। কপালে মাথায় টকটকে সিঁদুর। লাল রঙের চওড়া পাড় সাড়ি। মাথার চুলে পাক ধরেছে। অপলক চোখে গাছটাৰ দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

ফেলু আৱ জিতে দু গাছা মজবুত রসি এনে বেঁধে ফেলেছে গুঁড়ি। তারপর মুখ ধৰে চলে গেছে দূৰে, দুই কোণে। গাছটা ভেঙ্গে যেন মাঠেৰ ওপৰেই পড়ে, পাশেৰ বাড়িতে নয়—তাই এই সতৰ্কতা। ঠিক কুড়োল নয়, কাটাৱিষ নয়—অন্তত ধৰণেৰ একটা দা এনে গাছেৰ গোড়ায় কোপ দিচ্ছে জমাদার।

অথচ ভাবতেও কেমন অবাক লাগে। বিশ্বাস কৰতে কষ্ট হয় যে এই গাছ কাটা হবে কোনদিন, কি কাটা হচ্ছে আজ। বিয়েৰ পৰ স্বামীৰ ধৰ কৰতে এসে প্ৰথমেই যাদেৰ সঙ্গে পৰিচয় হয়েছিল, এই গাছটাও তাদেৰ একজন। বৃষ্টিৰ মধ্যে ওৱাই তলায় দাঢ়ি কৰিয়ে দুবে আলৃতা সেৱে বৈ বৱণ কৰেছিলেন খাণ্ড়ী। কথায় কথায় বলেছিলেন : বৌমা ! তোমাৰ শ্বশুৰ এ বাড়িৰ ভিত্তিশাপন আৱ শিউলীৰ চাৱা রোপণ একই দিনে কৰেছিলেন। এ গাছেৰ ছাউনী আৱ এ বাড়িৰ আশ্রয়ও একই দিন পাছ। ভুলোনা এ কথা।

অৱদা নিজেও ভোলেন নি তা। মাথাৰ চুল গ্ৰায় নেড়া। একটা ছেঁড়া ময়লা থান কোন রকমে কোমৰেৰ সঙ্গে লেগে আছে। পিঠ্টা ধৰুকেৰ মত সামনেৰ দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সোজা হয়ে দাঢ়াতে পাৱেন না তিনি। কোটৱে বসা চোখেৰ চাৱপাশে ঝুলছে মুখেৰ চামড়া। কপালে গভীৰ রেখা। একটিৰ দাত নেই। হাত-পা সুৰ। কথা বলতে কষ্ট হয়, দৃষ্টি শক্তি কমে এসেছে।

ছাদেৰ ওপৰেই আছে এক চিল্লতে কুঠৰী। বুড়ীৰ আস্তানা আৱ রাধামাধবেৰ মন্দিৰ। পূজো কৰছিলেন, গোলমাল শুনে বেৱিয়ে এসেছেন।

কোনদিকে একটানা একটুখানি তাকালেই বুড়িৰ চোখ ঝাপসা হয়ে গুঠে। লালাৰ মত চঢ়চঢ়ে জল পড়ে। অৱদা ধৰে ধৰে আলসেৰ কাছে এসে দাঢ়ালেন। তাকিয়ে রইলেন নীচেৰ দিকে।

সে দিন জমিটা ছিল উত্তৰ দিকে ছড়ানো। স্বামী হৱিদ্বাৰ থেকে তীৰ্থ কৰে এলেন। সঙ্গে অনেক কিছু আৱ একটা শিউলীৰ চাৱা। বললেন : অৱ, ধৰ্মস্থানেৰ শৃতি। আমাৰ মাটিতে বেড়ে উঠবে। ছায়া দেবে, ফুলও। পাণ্ডা বলছিল একটা অশ্ব গাছেৰ শেকড় আনতে। কিন্তু আমি রাজি হই নি।

স্বামী ছিলেন বিলাসী। জমিদাৰ বংশেৰ ছেলে। গান ভালবাসতেন, কবিতা ও লিখতেন। গাছটা তাঁৰ কাছে নিছক বিলাসিতা বা সৌন্দৰ্যচৰ্চাৰ উপকৰণ হলেও অৱদাৰ কাছে ছিল তা ধৰ্মেৰ উপাদান। এমনকি এই বয়েসেও।

আজ সেই জমি ছোট হয়েছে ক্রমাগত। নতুন বাড়ি উঠেছে অন্য লোকের। ভেঙ্গে পড়েছে নিজেদের ভিটে। কিন্তু আজও তিনি শিউলীর ফুলে বাধা-মাধবকে না সাজিয়ে জল গ্রহণ করেন না। শরীরগতিকে যেদিন সিঁড়িভাঙ্গা অসম্ভব হয়ে দাঢ়াল, সেদিন থেকে তিনি নাতি ছুটিকে অনুময় করেছেন রোজ ছুট। ফুল এনে দেবার জন্যে। কিন্তু তারা এতটুকু সম্মান করেন না তাদের ঠাকুরমাকে। হাসে, ব্যঙ্গ করে, গালাগালি দেয়। ঠাকুরের ফল চারি করে খেয়ে নিলে অন্নদা যখন ছেলেকে বলে দেবার কথা বলেন, তখন এমন কি বুড়ীকে মারার ভয়ও দেখায় তারা। সেই থেকে পাড়ারই ছুট। একটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে তিনি আপোয় করেছেন। তারা পরের বাড়ি ফুল তুলতে আসে। বাধ্য হয়েই কিছুটা ভাগ দেয় বুড়ীকে। কারণ কৈলু আর জিতে নিজেরা ঠাকুরমাকে মানে না, কিন্তু অন্য কেউ তাঁকে অসমান করলে ছেড়ে দেবার পাত্র তারা নয়। অন্নদাও তাদের আদর করে বসান। ফুল দেওয়া নেওয়া হয়ে গেলে খেতে দেন ঠাকুরের প্রসাদ।

এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া সে পাড়ার ছেলে মেয়েগুলো বুকে হাত চেপে ঝন্দি নিখাসে দাঢ়িয়ে ছিল। শ্রাবণের মাস থেকে মাঘের গোড়া পর্যন্ত রোজ সকালে এ বাড়িটায় মেন মহোৎসব পড়ে যায়। মাটিটা ভরে উঠে সাদা ফুলে। আর তারা আসে দল বেঁধে। ফুল ঝুঁড়োয়, বাগড়া করে নিজেদের ভেতর, আড়ি দেয় চিরতরে। আবার ভাব। একজন গাছে উঠে ঝাঁকানি দেয়, আর সবাই ফুল তোলে। তার সাজিতেও দিয়ে দেয় কিছু। শুঁয়োপোকা লাগলে আঁশ ছাড়ায় যত্ন করে।

চলচল করছিল পাশের বাড়ির মিঠুর চোখ। সে ভেবেছিল এবার ফুলের বোটা শুকিয়ে বাসন্তী রঙে তার সাড়ি ছুপিয়ে নেবে। তারপর সরমতী পূজোর সময় তাদের কাছের ফাংশনে গাইবে সেই “গোড়ে গোড়ে”র বাংলা গানখানা।

কিন্তু খুব খুসি হয়েছে চলন, মিঠুরার বছর চারেকের ভাই। ঘূড়ি ওড়ানোয় শিঙ্কা-নিশি করছে সে। কিন্তু একটুখানি উঠেই তার ঘূড়ি রোজ আছাড় থাবে ত্রি শিউলী গাছের মাথায়। টকা দিয়ে দিয়ে কখনো তা ছাড়ান যায়, কখনো যায় না। স্বতো ছিঁড়ে গেলেই কৈলু আর জিতে লক। মেরে, গাছে উঠে তা পেড়ে নেয়। বলে, এতো কাটা ঘূড়ি। কেন দেব?

আর সে ভয় রইল না।

পাড়েও খুসি। সাত মহল্লার ক্ষেত্রে শয়তানরা বছরের কটা মাস নিত্য ভৌড় জ্যাবে এ বাড়িতে। গৃহকর্তার ঘূম তখনো ভাঙ্গে না বলে দরজাও খোলা থাকে না। পশ্চিমের পাঁচিল টপকে এরা মাঠে ঢোকে। ভাঙ্গা দেয়াল আরো ভেঙ্গে যায়। মনিব গালাগালি করে পাঁচড়েকে। ভোর বাতে ঘূম থেকে উঠে পাহারা দেয় সে। তবু কি বিছুদের সঙ্গে পারার যো আছে?

আর সে সতর্কতার অয়োজন থাকবে না।

এবং উল্লাস পাশের বাড়ির মোক্ষদা বাম্বীর। মাগো। গাছটায় ফি বছর গোটা ছায়েক কাক বাসা বাঁধবেই। ডিম পাড়বে, বাচ্চা হবে। আর সেগুলোর জালায় মাছের কাঁচা, মাংসের হাড়, বাঁটার কাঁচি এবং এ ও তা ছিটকে পড়বে চারপাশে মোক্ষদার বারান্দায়, আধ শুকনো সাড়িতে এবং নয় কোথায়? আর ছেলে মেঘেগুলোর হৈ-হন্নায় রোজ সকালে যে তিনি একটু মন দিয়ে মালা জপ করবেন, তাও কি পারেন? বহুদিন তিনি সব অনাস্থির মূল এই গাছটাকে মনে মনে গাল দিয়েছেন। কিন্তু এভাবে যে তার মূলোৎপাটন হবে, তা যেন ভাবতেও পারেন নি কখনো।

শিউলী গাছের আধখানা মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে নতুন ওঠা চাকু সরকারের বাড়িতে। স্ববিধে এবং অস্ববিধে—হইই তাদের সমানে ভোগ করতে হয়। তাদের উঠোনও ফুলে সাদা হয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আসে শুঁয়োপোকা। একটা নয়, দুটো নয়। অজন্ম। সাড়ি মেলা থাকলে, জুতো শুকোতে দিলে, চুল বাছতে বসলে—কখন কোথা থেকে যে ওরা এসে তেতরে দেঁধোয়, তা টের পায় কার সাধি। দেয়াল বেয়ে এগিয়ে ওরা বিছানা, আলনা এমন কি মাঝে মাঝে রাখা ঘরে পর্যন্ত চুকে পড়ে। কারণ ছোট জায়গায় বড় বাড়ি। সবই গায়ে গায়ে।

আর তাই প্রায়ই চেঁচামেটি ওঠে চাকুসরকারের বাড়িতে। ছেলে বুঢ়ো, মেয়ে, পুরুষের। শুঁয়োর আঁশ লেগেছে। পোত্তা ব্রেড, বা বৃড়ো শিউলী পাতা দিয়ে জায়গাটা চেঁচে ফেলা হয়। তবু লাল হয়ে ফুলে ওঠে সেখানটা।

কিন্তু ততটা অস্ববিধে নেই নীলাম্বর দন্তের। কারণ জমি আর গাছ থেকে তাঁদের অন্দর কিছুটা দূরে। তাছাড়া বড় শরিকের কল, পায়খানা, চৌবাচ্চা আর বাইরের তো ব্যবহারই করা হয় না।

কিন্তু তবু তাঁরা রেহাই পান না। বিশেষ করে ঘূড়ি ধরতে আর কাকের বাসা ভাস্তে গিয়ে ফৈলু, জিতে প্রায়ই আহত হচ্ছে। এমন কি শেষে একদিন জরও করে বসল তারা।

চাকু সরকার ঠাট্টার ছলে অভিযোগ করেন: মশাই, আপনার গাছের জন্য আমরা পরিবার শুরু ভুগে মরব নাকি? দিন জন্মল সাফ্ফ করে।

একদিন ফৈলু আর জিতেও ধরে বসল নীলাম্বরকে: বাবা, সকলেই বলছে গাছটা কেটে ফেল।

শুনে খুব রেগে গেলেন নীলাম্বর বাবু, ধমক দিলেন ছেলেদের, গাল দিলেন প্রতিবেশীকে। কিন্তু তার কদিন পরেই স্বী সৌদামিনী একই অভিযোগ জানালেন শুঁয়োপোকার নামে। এ অত্যাচার চিরকাল আছে। চাকু সরকার না হয় নতুন, ছেলে দুটো না হয় বকাটে। কিন্তু তিনিও যেন আজ আর সইতে পারছেন না। শুনে গন্তব্য হয়ে গেলেন নীলাম্বর বাবু।

তার কদিন পরেই পিঠ চুলকোতে চুলকোতে শুঁয়োপোকার চোদপুর্যকে গাল দিয়ে নীলাম্বর জানালেন: না। গাছটা কেটে ফেলাই ঠিক করলাম।

গাছ কাটা মোটামুটি স্বারা। এখন দড়ি ধরে টান দিলেই তা ভেঙ্গে পড়বে। ফৈলু একটা খেলনা মশাল জালিয়ে ছুটে এল। গাছের ডালে জাষগায় জাষগায় আলপনার মত চাক বেঁধে রয়েছে অজন্ম শুঁয়োপোকা। উপনিবেশ বেঁধে। জমাদারের অঙ্গের আঘাতে দু-একটা ছিটকেও পড়েছে মাটিতে। জিতে জুতোর তলা দিয়ে চেপে চেপে সেগুলো মারতে লাগল। আর ফৈলু এগিয়ে দিল তার মশাল এক একটা চাক লক্ষ্য করে। পট্পট করে লোম পোড়ার আওয়াজ হল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে কুঁকড়েনো এক একটা শাড়া শুঁয়োপোকা মরে থারে পড়তে লাগল নীচে। কেমন একটা কটু গন্ধ উঠল চারপাশে।

সৌদামিনী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। ছেলে ছুটো ফুর্তিতে ধেন লাফাছে। কিন্তু ওরা এত প্রাণ পায় কোথা থেকে?

নিয়মিত খাওয়া নেই। বাড়িতেও সকাল বিকেল খাকেই না। দুপুর কিংবা রাত্রেইবা সৌদামিনী কি এমন অযুক্ত তুলে দেন তাদের পাতে! সঙ্গতির অভাবে দিনে বাজার আমছেন এক টাকার, আর কেড়ে নিচ্ছেন স্বামী পুত্রের স্বাস্থ্য। তাই অনেক ভেবে গাছ কাটায় সম্মতি দিয়েছেন সৌদামিনী। উত্তুরে বাড়ির বাঙালদের সঙ্গে গোপনে ব্যবস্থা তিনি করেছেন। এই গোটা মাঠে চাষ করে দেবে তারা। ফলনের সামান্য তাদের ভাগ দিলেই চলবে। আর বাকিটা সৌদামিনী তুলে দেবেন তাঁর পুত্র এবং স্বামীর পাতে। দিনে এক টাকা করে বাঁচবে, মাসে তিনিশ, বছরে তিনিশো ঘাট। আন্দালত থেকে সময় দিলে বছর তিনের মধ্যেই ধার শোধ করে বড় শরিকের হাত থেকে এ বাড়ির অর্ধস্বত্ত্ব আবার কিরে গাওয়া যাবে। তাচাড়া টাটকা সব্জি, যা পচা মাছ আর অপুষ্টিকর খাটের সব বিষক্রিয়া ঝরে দেবে। এবং হয়তো ফিরিয়েও দেবে তাঁর প্রিয়জনদের স্বাস্থ্য।

কিন্তু তখনই অগ্য কথা ভাবছিল ফৈলু। জিতে তার কাণে কাণে চাপা হাসির সঙ্গে বল: দাদা, শালা শুঁয়োপোকার নামে বাবাকে বেশ জুক দিলি মাইরি। ব্যাডমিন্টন গাউচ্য কিন্তু পশ্চাত্ত ঠিক করে ফেলতে হবে। স্বত্ত্বান্দা বলছিল ওদের ক্লাবের স্বাইম্বা ট্র্যাম্পেটের...

চূপ্মার। ফিলফিশিয়ে তর্জন করল ফৈলু: বাবা আসচে।

ওরে ছেড়েদে, এবার ছেড়েদে তোরা। মীলাস্বর দন্ত ছেলেদের বললেন: আর কত যাবি? জমাদারের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ফৈলু হঠাতে বাধ্য ছেলে হয়ে গেছে। এক কথায় সে মশাল নিয়ে সরে গেল। মীলাস্বর বাবু মনে মনে ভাবলেন এই শুঁয়োপোকা মেরে আর কি স্বরাহা হবে? আসল শুঁয়োপোকা—যা তাঁর দেহ নয়, বুককে দংশন করছে—তার খবর কি রাখে এই শিশুরা?

বাড়ির এক মুখ ধরেছে ফৈলু আর জিতে, অগ্য মুখ জমাদার নিজে। উঠানের এদিকে যাই এসেছে ভীতটা। জানলা, ছান্দ আর চারপাশে উত্তেজিত আলোচনা। এইবার, এইবার নিশ্চেষ হয়ে যাবে।

সব শেষ হয়ে যাবে ! নৌলাস্বর বাবু ভেবে পেলেন না কি জবাব তিনি দেবেন স্বীকারে, কি বোঝাবেন তাঁর ছেলেদের। কেমন করে জানাবেন আদালতের রায় তাঁদের বিপক্ষে গেছে। বড় শরিক অধিকার পেয়েছে গোটা বাড়িটার। গৃহত্যাগের জন্য দয়া করে সমন্বয়ে একমাস। নৌলাস্বর শেষ সম্পত্তি এই জমিটিকু বিক্রি করে কিনেছেন গোয়াবাগানের এই বস্তী, নিজের থাকতে পারবেন, আর পাবেন ভাড়া। প্রাপ্ত ধারণের দিন তো বহুকাল গেছে এবার যদি জীবন ধাপন করা যায় কোনোরকমে। নতুন মালিকের সঙ্গে চুক্তি মতই গাছ কাটিয়ে সাফ করে দিতে হচ্ছে এই জমি। অথচ—আর একটু সময় যদি পেতেন, ছেলেগুলো বাহ্যিক অবধি যদি...

সামালু সামালু। চেঁচিয়ে উঠল ফৈলু।

আঃ সরে বা, সরে বা না তোরা। বলল জিতে।

জমাদার ভাষাহীন চীৎকারে ইঁক দিয়ে উঠল তারপর দড়ির টানের সঙ্গে সঙ্গেই মড়মড় করে ডেঙ্গে পড়ল গাছটা।

সৌদামিনী তাকালেন নৌলাস্বরের দিকে, নৌলাস্বর তাকালেন সৌদামিনীর দিকে। তারপর হজনেই মুহূর্তের জন্য ঘাড় নাবিয়ে তাকালেন ওপর দিকে। ছাদের আলমেয়ে ধূকের মত দৈঁকে তখনো বুঢ়ী অন্নদা দাঁড়িয়ে। মরা মাছের মত ঘোলাটে চোখ ছুটো মেলে তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নৌচের দিকে !

আমেরিকা আবিষ্কার

(অনুবাদ গন্ধ)

অরুণালি দাশগুপ্ত—দ্বিতীয় বর্ষ, আর্টস

‘তাঁর খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছে,’ মাস্টলের চূড়ে। বেঁসে যে-নাবিকটি দাঁড়িয়ে, তাঁর উল্লিখিত কষ্ট সারা জাহাজটাকে ঝাঁকুনি দিল বেগে।

কত না শ্রম আর নাটকীয়তায় এ-অভিযানের প্রত্যেক অক্ষ রসোজ্জল ; কলম্বাস ভাবেন, এসব আজ খেমে যাবে। অদূরে স্থল রেখায়িত রূপ নিয়েছে। কম্পিত হাতে কলম্বাস দুর্বীন চোখে লাগালেন।

‘বেশ বড় একসারি পর্বত দেখতে পাচ্ছি,’ কলম্বাস সম্পীদনের বললেন, ‘কিন্তু কী আশ্চর্য ওদের গায়ে যেন অসংখ্য জানলা তৈরী করা ! এমনতরো ব্যাপার এই প্রথম চোখে পড়ল !’

‘নেটুরো মৌকো করে আসছে,’ অদূরে কোন নাবিকের উত্তেজিত শ্বর শোনা যাব। পালকতরা টুপি হাওয়ায় উড়িয়ে জাহাজের সবাই একজোট বাঁধল ডেকে। তাড়াহড়েতে ওদের অস্ত্রাভিক ভারী পোষাক বেগ দিল বড় কম নয় !

হ'জন নেটিব জাহাজে পৌছেই বেশ বড় একখণ্ড কাগজ তুলে দিল কলম্বাসের হাতে, নিঃশব্দে। আশ্চর্য সবুজ পোষাক তাদের পরণে।

‘তোমাদের দেশ আমি আবিষ্কার করতে চাই’, কলম্বাসের কঠে উচ্ছিত গর্ব, ‘স্পেনের বাণী ইস্বাবেলার নামে এই নতুন দেশ....’

‘তাতে কী ঘায় আসে,’ একজন নেটিব তাঁকে থামিয়ে দিল তাড়াতাড়ি, ‘প্রথমে আমাদের এই প্রশংসনির সঠিক উত্তর লিখে দিন। আপনার নাম, উপাধি, বিষে হয়েছে কী হয়নি, আপনার দেশ ও জাতি সম্পর্কীয় খুঁটিনাটি তথ্য—সবই লিখবেন। আমেরিকান শরকারকে শাসন্যুক্ত করবার কোনরকম মতলব আছে আপনার এবং আপনি কী পুরোপুরি নির্বোধ, এসবেরও নিতুর্ল উত্তর প্রয়োজন।’

কলম্বাসের মনে ততক্ষণে যুক্ত ঘনিষ্ঠে এসেছে। কিন্তু অবিলম্বে শাস্ত করলেন তাঁর মনকে, কারণ বুদ্ধিতে তিনি নেহাঁ কাঁচা নন।

‘নেটিবদের ক্ষেপিয়ে তোলা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না,’ কলম্বাস সঙ্গীদের দিকে ক্ষিলেন, ‘ওরা ছোট ছেলেদের মতো। হয়ত বা ওদের অস্তুত নিয়ম-কানুন থাকতে পারে। অভিজ্ঞতা হোক, পরে সব বোঝা যাবে।’

‘বিটার্ন-টিকিট আর পাঁচশ’ ডলার আছে আপনার?’ নেটিবটি ভাবাস্তর দেখাল না।

‘ডলার! ডলার কাকে বলে?’ কলম্বাস স্বীকৃতিমত বিশ্বিত হন।

‘ঞ্চিতাত্ত্ব প্রশ্নে বললেন আপনি নির্বোধ নন, আবার পরক্ষণেই বলছেন ডলার জানিনে। এদেশে আসবার পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে আপনার, কোন মতলব?’

‘আমি আমেরিকা আবিষ্কার করতে চাচ্ছি।’

‘ভালো কথা, আপনি বিজ্ঞাপন চাচ্ছেন?’ নেটিবটি বিজ্ঞাপন কথাটির ওপর যথেষ্ট জোর দিল।

‘বিজ্ঞাপন!’ কলম্বাসের চোখে মুখে বিশ্বর ফুটে উঠেছে। এমনতরো কথার মন্দে তিনি আজ্ঞম অপরিচিত।

নেটিবটি তাঁর পাঁথেকে মাথা অর্দি চোখ বুলিয়ে নিল নিশ্বে। তাঁরপর হতাশস্বরে জিজ্ঞেস করল, ‘বিজ্ঞাপন বুঝতে পারছেন না?’

—‘ন্না।’

‘তবুও আপনার আমেরিকা আবিষ্কার করার বাসনা! আপনার সঙ্গে কথা বাড়িয়ে শাস্ত নেই, চলি।’ নেটিবটি ঘুরে দাঁড়াল।

‘মানে আপনি আমায় অতটা ক্ষমতাবান মনে করেন না, এই তো?’ তাঁর ঘরে দৃঢ়তা আর অসহায়তা একই ঘোগে প্রকাশ পেল।

কিন্তু নেটিবটি অনেক এগিয়ে গেছে তখন। মুছ ভাবে, যেন আপন মনেই, বলছে, ‘বিজ্ঞাপন বাদে উন্নতি অসম্ভব।’

এতক্ষণে ছোট্ট জাহাজগুলো বন্দরে ভিড়তে স্কুল করেছে। এখানকার শরৎকৃত মন-মাতানো। আকাশে সূর্য দীপ্তিময়, 'সী-গাল'রা পোতের চারিদিকে ঘূরঘূর করছে। নতুন দেশে প্রথম পদার্পণেই কলম্বাস চমকিত হলেন। তাঁর এক হাতে দুর্ভ স্পেনিশ প্যাকেট, ভরসা ছিল, ওর বদলে সোনা বা ইঁতির দাঁত খিলবে অন্যান্যে। অন্য হাতে স্পেনের জাতীয় পতাকা। যেদিকে তাকান, মাটি তাঁর নজরে পড়ে না, শুধু পাঁথর, কংক্রিট, লোহা অঙ্গ ধারে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। পুরনো ইউরোপে ঘাস গাছপালার সঙ্গে কলম্বাসের পরিচয় আজীবন এবং অন্তরঙ্গ; এখানে সে-সবুজ সৌন্দর্যের আভাসমাত্র নেই।

একদল নেটিব, হাতে তাদের পেস্কিল, নোটিবই আর ক্যামেরা, কলম্বাসের গাঁচুঁয়ে চলে গেল। কাছাকাছি কোন জাহাজ থেকে এইমাত্র বিখ্যাত এক বক্সার নেমেছে, সবই তাকে ধিরে দাঁড়াল। নবাগত নেটিবটির কানছটো ফুলকপির মতো বিরাট, নাকটা আস্বাভাবিক ভোঁতা। আশেপাশের উৎসাহী নেটিবরা তাঁর প্রত্যোক কথা লুকে নিছে।

অথচ, কলম্বাস ভাবেন, তাঁর দিকে কারো সামান্য নজর নেই। শুধু ক্রজ-লিপষ্টিক-পাউডার ভূষিত দুই নেটিব তরঙ্গী তাঁর সামনে এগিয়ে এল।

—‘বহুরূপীটিকে তো চেনা যাচ্ছে না!’ একজনের বাঞ্ছ।

‘মনে হচ্ছে কোন স্প্যানিশ রেস্টোরাঁর জীবন্ত বিজ্ঞাপন!’ আরেকজনের বাঁকা হাসি।

তাঁরপর তারাও সেই বক্সার নেটিবটির আকর্ষণে দ্রুত ভিড়ে মিশে গেল।

প্রত্যোকেই নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত। তাঁরা যে আবিষ্কৃত হয়েছে, সে-সত্যের নিকে তাঁরা নিলিপ্ত, ভৃক্ষেপহীন।

একজন নেটিব দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখে কলম্বাস ভরসা খুঁজে পেলেন। মুখোমুখি হয়ে সর্গর্বে বললেন, ‘আমি খুঁস্টফার কলম্বাস।’

‘বুর্লুম না, আবার বলুন।’

‘খুঁস্টফার কলম্বাস।’

‘নামটা বানান করুন,’ নেটিবটির কঠে স্পষ্ট অসহিষ্ণুতা। কলম্বাস যথারীতি বানান করলেন তাঁর নাম।

‘একটু যেন মনে পড়ছে,’ নেটিবটি বললে, ‘হাল্কা যন্ত্রপাতির কারবার করেন না আপনি?’

‘আমি আমেরিকা আবিষ্কার করেছি,’ মৃত্যুরে জবাব দিলেন কলম্বাস।

‘সে কী! কখন করলেন?’

‘এইমাত্র। মিনিট ছয়-সাত আগে,’ কলম্বাসের স্বর বিনীত, দৃঢ়তা শিমিত, ‘আমার মনে হয়, এর জন্যে কিছু খ্যাতি আমার প্রাপ্য।’

‘আপনার আগেভাগেই তাঁর করা উচিত ছিল,’ একটু ভেবে নেটিবটি পরামর্শ দেয়। ‘ওমনিভাবে কোন কাজ হয় বলুন? যদি একান্তই কোন দেশ আবিষ্কার করতে চান, প্রথমেই

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেবেন। আর তৈরী রাখবেন দু'চারটে মজার গল্প, উন্মগ সাংবাদিকদের কাছে রসিয়ে বলবার জ্যে। কয়েকখানা ফটোও মজুত রাখতে হবে। আসলে যা দুরকার তা হল বিজ্ঞাপন।'

ফের হেঁচাট খেলেন কলম্বাস। ভাবলেন, এটা এদেশীয় কোন ধর্মাচ্ছান্ন, নয় তো পৌত্রিক সমাজবীক্তি। তাই আয়ুপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিজস্ব অনুমানটা পেশ করলেন খেমে খেমে।

নেটিব সচচরটি তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরল। চোখে তার সমবেদন।

'ছেলেমাহুষি করবেন না, মিস্টার কলম্বাস,' তাঁর স্বরে কোমল ভর্মনা, 'বিজ্ঞাপন মানে বিজ্ঞাপন। আপনার জ্যে কিছু করবার চেষ্টা করব বরং। সত্যি দুঃখ হচ্ছে আপনার কথা ভেবে।

কলম্বাসকে সে এক বিরাট হোটেলে নিয়ে এল তারপর। ষে-ঘরটা ভাড়া নিল, সেটা পঞ্জির তলায়। খানিক পরে নেটিবটি বিদায় নিলে কলম্বাস নিঃসঙ্গে বসে রইলেন দেখানে। যাবার সময় সে ভরসা দিয়ে গেল, যতটুকু সন্তুষ্ট, ততটুকু সে করবে তাঁর স্বার্থে।

আব্ধাটাটাক হবে, এমন সময় ফের দরজা খুলে যায়। সেই নেটিবটি ফিরে এসেছে, সঙ্গে এদেশীয় দু'জন অপরিচিত তরুণ। একজন কৌ চিবিয়ে চলেছে অবিরাম, অন্য জনের দখলে একটা কাঠের স্ট্যাণ্ড, তাঁর সঙ্গে ঝোলানো এক ক্যামেরা। কলম্বাসের মুগ্ধামুগ্ধি একটু দৃঢ়ক্ষাক করে বিনা ভূমিকায় দে বললে, 'এবারে একটু হাস্তন তো মিস্টার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হাস্তন। সে কৌ, বুতে পারছেন না? আচ্ছা, তা হলে আমি ধা করি তাই কুন। হাঃ হাঃ হাঃ।' নেটিবটি দাঁত বের করল। কিন্তু আর ধাই হোক, সে-দন্ত-বিকাশকে হাসি বলা চলে না।

কলম্বাস হতবাক। তারপর অবুঝের মতো হাসলেন এক পশলা। তারপর বিদ্যুৎ-বলক, ক্যামেরার শব্দ 'ক্লিক'। নেটিবটি সত্যিকার হেসে তাঁকে ধন্যবাদ জানাল।

এবারে অন্য নেটিবটি কলম্বাসকে শিকার করলে। তখনও সে চিবিয়ে যাচ্ছে। একহাতে পেন্সিল চেপে তাঁর সামনাসামনি এসে বললে, 'আপনার নাম বলুন।

'কলম্বাস।'

'ধন্যবাদ, নামটা ঠিক বুঝে নেওয়া সবচেয়ে বেশি দরকারী। এবারে বলুন মিঃ কোলম্যান, কখন আমেরিকা আবিক্ষার করলেন? আজকেই? বেশ বেশ! আমেরিকা কেমন লাগছে আপনার?'

কলম্বাস এই আশ্চর্য দেশের পর্যাপ্ত পরিচয় পাননি। তাই উত্তরও পর্যাপ্ত হল না।

নেটিব সাংবাদিক গভীর ভাবনায় পড়ল।

'তা বটে,' সে বললে, 'আচ্ছা, বলুন তো, বোধ হয় এটা পারবেন, নিউ ইয়র্কের কোন চারটে জিনিস আপনাকে সবচেয়ে বেশী মুক্ষ করেছে?'

কলম্বাস অক্ষমতার জ্যে মাপ চাইলেন।

এবারে সে গভীরতর ভাবনায় পড়ল। বক্সার আর ফিল্মস্টারদের সঙ্গে কথাবার্তায় সে অভ্যন্ত। কলম্বাসের মতো সাদামার্ট। লোকের সঙ্গে তার খাপ খায় না।

অবশেষে ফের আঘাত হয়ে সে একটি আশৰ্য মৌলিক প্রশ্ন তুলে ধরল, ‘আমেরিকার মেয়েদের আপনার কেমন লাগে মিট্টার কোলার্ড? বোঝা গেল, প্রশ্নটি গবেষণা করতে সে প্রচুর মানসিক বল খরচ করেছে।

এবারে সে উভয়ের প্রতীক্ষা করলে না। কলম্বাসের হাবভাব একটু লক্ষ্য করেই সে লিখে চলল পুরোদমে। অলস্ট সিগারেটটা মুখ থেকে খসিয়ে নিঃশব্দে ঝাঁকুনি দিল বহুবার, সে সময়ে পেপিলটা মুখে পুরে ঘন ঘন তাকাল ওপরে। লেখাটুকু শেষ করে সে লজ্জিত কলম্বাসের গায়ে টোকা দিল মৃহুভাবে, তারপর হাত নেড়ে টুক করে বেরিয়ে গেল।

পরদিন খুব ভোরেই সহস্র মেটিবটির আবির্ভাব। হাতে খবরের কাগজ। তার পঁচাশি পাতায় হতবাক কলম্বাস আবিষ্কার করলেন তাঁর প্রতিকৃতি—শ্রীহীন হাসিতে অনাবশ্যক ক্ষীত। ছবির তলায় ক্যাপশন লেখা, আমেরিকার মেয়েদের দেখে তিনি বিস্ময়বিমুক্ত। নিঃসংশয়চিত্তে বিখ্যাস করেন, এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে মনোজ্ঞ স্থষ্টি। এবং হার্বার্ড যুনিভার্সিটিতে তিনি ভূগোল সম্বন্ধে রত্নগর্ত বক্তৃতা দেবেন।

প্রত্যেকটি কথা কান্নানিক, কলম্বাস শপথ নিতে প্রস্তুত। এমন সময় নতুন কয়েকজন নেটোব ব্যবসায়ীর আগমন হল।

‘বিজ্ঞাপন’ ফল দিচ্ছে যাদুর মতো। কলম্বাস হলিউডে আমন্ত্রিত হলেন।

‘আপনি স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছেন মিস্টার কলম্বাস,’ নবাগত মেটিবরা অস্বাভাবিক নতুনায় বলে চলল, ‘আমেরিগে। ভেসপুচি নামে যে ঐতিহাসিক ছবিটি তোলা হচ্ছে, তাতে আপনি অধান চরিত্রে অভিনয় করবেন। আমাদের ধারণা, জনসাধারণ এতে মনের খোরাক পাবে যথেষ্টই। অবশ্য, এর সংলাপ হবে ব্রডওয়ের চলতি ভাষায়। বুঝতে পারলেন না? তাহলে প্রথম থেকেই বলি। আমাদের একটা চিত্রনাট্য তৈরী করা আছে, সেটা দুমার কাউট অব মটেক্সিস্টোর ছায়াবলম্বন করে, অবশ্য এটা মুখ্য কথা নয়। আসল কথা হল, আমরা এর মধ্যেই আমেরিকা আবিষ্কার অংশটুকু চুকিয়ে দেব স্থির করেছি।’

কলম্বাসের মাথা টলতে আরম্ভ করেছে। টেঁটুচ্ছে নিঃশব্দে কাঁপছে। স্পষ্টত: প্রার্থনা করছেন। এদিকে তাদের অমায়িকতা উভেজনায় বাঁক নিয়েছে, ‘ভেসপুচিকে স্পেনের বাণী গভীরভাবে ভালোবাসেন, আবার ভেসপুচিও সমানভাবে রাখান রাজকুণ্ঠ গ্রিস্কার প্রেমাস্তু। কিন্তু কার্ডিনাল রিশল্যু ভাস্কো-ডা-গামাকে ঘৃষ দিয়ে বশ করেছেন এবং লেডি হামিল্টনের সঙ্গে রফা করে আপনাকে, মানে ভেসপুচিকে, আমেরিকা পাঠ্টিরে দিয়েছেন। যা হোক, এখানে তাঁর চক্রান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট। সাগরপথে জলদস্যুরা আপনাকে আক্রমণ করেছে। আপনি সিংহের মতো লড়েছেন। এটুকু তিন হাজার মৌর দীর্ঘ হবে। আপনি হয়ত অভিনয় করতে জানেন না, তাতে আটকাবে না। শুটা আসল কথা নয়।’

‘আসল কথাটা কী?’ কলম্বাস কথ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

‘বিজ্ঞাপন! জনসাধারণ আপনাকে ইতিমধ্যেই চিনেছে এবং আপনার মতে। বার জলদস্থাদের সঙ্গে লড়াই করছে শুনে শুরা দেখবেন ভেঙে পড়বে দেখতে। এইটেই হচ্ছে আসল আকর্ষণ। সাগরপথে যুক্তের ছবি তুলতে যে সরঞ্জাম দরকার, সমস্ত স্তুতি মন্ত্রে মন্ত্র আছে। এখন দাঢ়ি গোফ কামিয়ে সোফ হয়ে নিন, তাঁরপর ছ’সপ্তাহের জন্যে কন্ট্রাক্টে মই করন। রাজি?’

‘ঠিক আছে।’ অবচেতন স্বরে যেন উচ্চারণ করলেন কলম্বাস। সমস্ত শরীর তার কাঁপছে রীতিমত।

সেদিন গভীর রাত্রে নিজের ডেকে বসে কলম্বাস একটি লিপি লিখলেন স্পেনের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে :

সারাজীবন ভরে দেশবিদেশ ঘুরেছি। দেখেছি বিচিত্র দেশে বিচিত্রতর মানবলী। কিন্ত এই নবাবিকৃত ভূ-খণ্ডে এমন এক শ্রেণীর নেটিব বাস করে যারা শুধু অদৃষ্টপুরুষ নয়, জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রে মৌলিকও বটে। নীরবতা এদের কাছে অসহনীয়, তাই যত্থানি সন্তুষ হৈ-হল্লা লুটাবার জন্যে এখানকার নগরের বুকে অদ্ভুত সড়কের সমারোহ দেখা যায়। লোহার থাম দিয়ে এদের উচ্চতা বাঢ়ানো হয়েছে। এর অরূপামী হয়ে রাতদিন লোহার গাঢ়ি ঘুরে বেড়ায়। তাতে প্রচণ্ড শব্দের স্ফটি হয়, আর সে শব্দকে প্রাণভরে উপভোগ করে এই নেটিবরা।

এরা পৌত্রিক, এবিষয়ে আমি নিঃসংশয়। বহু অবতার মানে এরা। নেটিবদের আবাসস্থলে তাদের নাম আলোর অক্ষরে খোদাই করা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এরা সবচাইতে বেশি পূজো করে দেবী কোকোকোলা আর কাফেটেরিয়া এবং ‘গ্যাসোলীন’ হ্রাসের তীর্থক্ষেত্র ফোর্ডকে। ফোর্ড যেন নেটিবদের জিউস।

নেটিবরা ভয়ানক পেটুক এবং এরা কিছু-না-কিছু চিবোতে থাকে সবসময়ই।

দুর্ভাগ্যের কথা, এখনও এরা সভ্যতার স্পর্শবিরহিত। স্পেনের ড্রত জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় এদের চালচলন কত্তে স্থিমিত্বেগ। এমন কী পায়ে-হেঁচে-চাকেও এরা অস্থাভাবিক ড্রত মনে করে; তাই একে এড়িয়ে যাবার জন্যে তারা নতুন এক ধরণের আশৰ্য বস্তুর প্রচলন করেছে—তাদের বলে ‘অটোমোবাইলস্।’ এগুলো চলে শামুকের মতো, আর তাইতেই ওদের অপরিমেয় আনন্দ।

এই আশৰ্য দেশ সমন্বে আরো অহসন্নান চালিয়ে যাব, যাব আরো গভীরে। বিপদের আশঙ্কা নেই। আর যা-ই হোক, নবাগতের প্রতি নেটিবরা অত্যন্ত বিনয়, সহজয় এবং আন্তরিক।*

ইংরিয়া ইলফ ও ইটজিন পেট্রোভ লিখিত গল্পের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

ଭୋଯାତିଭିକ୍ଷୁ

ଅଲୋକରଙ୍ଗନ ଦାଶଗୁପ୍ତ—ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ, ଆର୍ଟ୍-ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ

ଓରେ ମନ, ଆଜ ସ୍ପନ୍ଦେର କୁଳେ ଜାଗୋରେ ଜାଗୋ,
ଓରେ ମନ, ଆଜ ସ୍ପନ୍ଦେର କୁଳେ ଅକାଲ ଜରା—
ଏହି ସକାଳେର ଚାରଣବାଲକ ମିଛେଇ ବଲେ :
'ମିଛେ ହଲୋ ଆଜ ଅରୁଣବରଣ ସକାଳ ବାରା,
ଜାଗଲିନେ ତୋରା, ତୋରେର ତୋରଣେ ଜାଗଲିନା ଗୋ,
ଦେଖିଲିନା ମୁଖ ତାର ସାଯରେ ସୁନୀଳ ଜଲେ !'

ଦେଉଲିଯା ଓରା, ସମସ୍ତ ରାତ
ପ୍ରେତେର ଛାୟାର କୁଟିଳ କରାତ
ଛିନ୍ନ କରେଛେ ବାସନାର ମନି,
ତାଇ ଜେନୋ ଏବା କେଉ ସୁମୋଯନି ।
ଫଣା ତୁଳେ-ତୁଳେ କାଳୋ । ସଂଶୟ
ମୁଛେ ନିଯେ ଗେଛେ ଆଲୋର ଅଭୟ,
ମୁଖ ଦେକେ ଆଛେ ମୌନ ସରଣୀ,
ତାଇ ଜେନୋ ଏବା କେଉ ସୁମୋଯନି ।
ଚୋଥ ବୁଜେ ଶୁଦ୍ଧ ପ'ଡେ ଆଛେ ସେଇ ଛାୟା ଭରା,
ମିଛେ ହଲୋ ତାଇ ଅରୁଣବରଣ ସକାଳ ବାରା ।

ଏକଟି ସମ୍ପ ଦେଖେଛିଲୋ ଓରା ରାତର ଶେଷେ :
ସୁନୀଳ ସାଯରେ ଅବଗାହନେର ନେଶାୟ ଭେସେ
ନିର୍ଜନ ବୁନୋ ହାଁସେର ମତନ ହାଜାର ଭେଲା ।
ଜଳ କେଟେ ଚଲେ—ଏକ ମୋହାନାର ମତ୍ତେ ମେଶେ
ଜଳବିହଙ୍ଗ ଆଖିନ ଦୋଲେ ସକାଳବେଳା ।
ହଠାଏ କଥନ ଶରବନେ ଢାକା ପ୍ରେତେର ଛଲେ
ଏକଟି ହାଁସେର ଡାନା ଛିଁଡେ ଥାଯ, ରତ୍ନଜମା
ପଦ୍ମପାତାଯ ଶୟ୍ୟ ବିଛାଲୋ ବିହଙ୍ଗମା,
ହଲୋ ନା ମିଲନ ମହାମୋହାନାର ଜୋଯାର ଜଲେ ।

মিলিত ঘুমের শান্তি পালংকে
 প্রেতের ছায়ার কুটিল করাত
 ছিঁড়ে দিয়ে গেল উত্তল মনকে
 সমস্ত রাত, সমস্ত রাত !
 সেহলির প্রেমে বাসি হয়ে এল পদ্মলতা,
 মায়াবিনী হলো প্রথম রাতের ছায়াঞ্জনা—
 রক্তের দাগে পুণ্যহারানো শিশিরকণা
 পবিত্রফুলে বুনে দিয়ে গেল বিষণ্ণতা ।

তবু-যে বুন্দো ভোরের নক্কা রক্তে গড়া,
 পাল-তুলে-দে'য়া হাওয়ার বালর দুলবে তাতে ;
 যুগ-কেটে-যাওয়া এই ধূলিতেও স্বয়ংবরা
 আঁকা হবে ব'লে নিজেকে ভুলিনি বেগুম রাতে ।
 এ-আকাশ তবে ছবি-আকা সেই ক্রপকথা হোক,
 স্বপ্নের কুলে আবার সবাই জাগবে ব'লে,
 আমি হবো আজ শুভ উষার চারণবালিক ;
 পর্যাপ্তার শয়াও আজো ব্যথার দোলে
 ব্যর্থপ্রেমের পূর্ণপ্রতীক হাসের পালক,
 তাই নিয়ে যাবো মহামোহনার চেউয়ের কোলে ॥

দিনের কবিতা

অর্চিনা রায়ণ উট্টাচার্য—বিত্তীয় বর্ষ, আর্টস

স্বচ্ছন্মীল আকাশের পটভূমিকায়
 ফুটে ওঠা উচ্চ-নীচ বাড়ীদের সারি
 ভাস্ত্রের হুরন্ত হুপুরে ।
 ফুটপাতে তন্ত্রাতুর দেবদাক গাছ
 গলানো সোনায় সেরে স্নান ।
 জানলার পাশে এলে চোখে জাগে ধূসর শহর
 রহস্যের আবরণে লেখে ব'সে দিনের কবিতা ।

ধোঁয়াভরা অলিতে গলিতে
 প্রাচীরের পাশে আর সবুজাভ মাঠে
 আকাশের বক্ষভেদী চিম্নীর চূড়াদের পাশে
 গ'ড়ে ওঠে দিনের কবিতা।
 মাকড়ের জালে ঘেরা অন্ধকার কোণে
 জমকালো রেস্তোরাঁর বুকের উপরে
 আলো আর ছায়ার মায়ায়
 জানি তার ছন্দ গাঁথা আছে।
 উপরেতে শুধু নীল আকাশের বুকে
 চিলেদের কালো কালো পাখা।
 খুসর শহর নীচে কবিতার পাঁওলিপি লেখে
 ভাদ্রের এ দুরস্ত দৃশ্যে।

“উত্তর-স্বাক্ষর”

বরুণ ভট্টাচার্য—পঞ্চম বর্ষ, আট্টম

কাব্যের অঘৃত অঙ্কুর,
 মুকুলিত হলো,
 অক্ষাৎ।
 বিপুল সম্ভাবনা তার।
 জড় পিণ্ডের স্তুপে
 প্রথম হলো প্রাণ সঞ্চারিত।
 প্রতিধ্বনিত হলো
 আদিম প্রাপ্তের
 অহচারিত বাণী।
 অপরিচয়ের যবনিকা
 গেল সুরে,
 কবির আত্ম-পরিচয়ে।
 ফুলে ফলে তার
 বসন্ত সম্ভার,

তৃঃসহ আনন্দের আবেগে
মরে কেঁপে,
রৌদ্রনেহ-তপ্ত শিশুগাছটাৰ মত ।
পাতায় পাতায়
পল্লবিত হয় কত বাণী ।
অজান্তে কবি লিখে ধায়
উত্তর স্বাক্ষৰ,
কাব্যে গানে স্ফটিতে ।
ভবিষ্যতের চিৱন্তন
প্রতিক্ষা—
এই বাণীৰ তরে
স্ফটি ও শ্রষ্টার সাৰ্বকতা
নিখিলেৰ ঘৰে ।

সমাজবিজ্ঞানের গোড়াৱ কথা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়—ঘষ্ট বৰ্ধ, আট্ট-স

Sociology-ৰ ঠিক বাংলা সমাজবিজ্ঞান কিনা জানি না তবে বোধহয় এই কথাটোকে বাঞ্ছ। প্রতিশব্দ হিসেবে দেওয়া চলতে পারে। সমাজবিজ্ঞান জিনিয়টী কি এ সম্বন্ধে সাধাৰণ ছাত্রেৰ মনে একটী অসাধাৰণ ভুল ধাৰণা আছে। আমাদেৱ কলেজ পাঠ্যগারে অৰ্থনীতি বাজনীতিৰ বই থাকে সমাজবিজ্ঞানেৰ বইয়েৰ তালিকাৰ মাৰখানে। ফলে অনেক ছাত্রেই ধাৰণা সমাজবিজ্ঞান বুঝি আৱো পাচটা সামাজিক বিজ্ঞানেৰ সমষ্টিমাত্ৰ। আমাদেৱ বিশ্বিশ্বালয় কৰ্তৃপক্ষ এদিক দিয়ে অনেক বেশী প্ৰগতিশীল—তাঁৰা সমাজবিজ্ঞানকে বাজনীতিৰ একটী বিশেষ শাখা বলে সব গোলমাল মেটাবাৰ চেষ্টা কৰেছেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান এৱ কোনোটাই নয়।

সমাজবিজ্ঞান কাকে বলে এ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দেওয়া একটু শক্ত। Sociology নামটা কোঁতেৰ আবিষ্কাৰ কিন্তু প্ৰায় প্ৰত্যেক সমাজবিজ্ঞানীৱই সমাজবিজ্ঞানেৰ স্বৰূপ সম্বন্ধে নিজস্ব একটী ধাৰণা আছে। এৱাই ফলে কোন এক বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কোনো এক সময়ে মন্তব্য কৰেছিলেন—পৃথিবীতে যত জন সমাজবিজ্ঞানী ঠিক ততগুলিই সমাজবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞানীমাত্ৰকেই স্বীকাৰ কৰতে হৰে যে সমাজবিজ্ঞানেৰ সীমাৰেখা এখনো ভালভাৱে

নির্ধারিত হয়নি যার ফলে যতক্ষণ না সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে একটু পরিচয় হচ্ছে এবং সমাজবিজ্ঞানের নানা ভাগ সম্বন্ধে একটু জানা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে 'সমাজবিজ্ঞান কি?' এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুক্তি।

এই কারণে একদল লোক সমাজবিজ্ঞানের অস্তিত্বই অস্থীকার করতে চান—কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে—সমাজবিজ্ঞানীর মধ্যে যে এত গ্রন্থে সেটীই তাঁর অস্তিত্বের মস্ত বড় লক্ষণ। সমাজবিজ্ঞানী পরিচয়ে বহু আনাড়ী যে নিজের মতবাদ সমাজবিজ্ঞানের মূলস্তুত বলে চালিয়েছেন এটী সত্যিকথা এবং এর ফলে দেখা গেছে যে সমাজবিজ্ঞানের তথাকথিত দুর্বোধ্যতার পেছনে রয়েছে এই সব তথাকথিত সমাজবিজ্ঞানীদের লেখাগুলি।

'সমাজ' এই কথাটী আমরা সকলেই জানি এবং মনে মনে ভাবি কথাটীর মানেও আমরা জানি। ফলে, সমাজবিজ্ঞান কথাটী যথনই শুনি তথনই মনে হয় যে সমাজবিজ্ঞান জিনিষটী কি সেটোও জানি—আসলে কিন্তু সমাজবিজ্ঞান জিনিষটী অর্টটা সহজ নয়। সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও একদল আছেন যাঁরা সমাজবিজ্ঞানকে পদার্থবিদ্যা রসায়নবিদ্যার সাথে প্রোদ্ধস্তর এক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলে তার মূলস্তুত বাঁব করতে চান। আরেক দল সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদী সমাজবিজ্ঞানীদের লেখা বিশ্লেষণ করে তাঁদের লেখার মধ্যে মিল খুঁজে বাঁব করে সমাজবিজ্ঞানের স্তুত বাঁব করতে চান, এঁদের মধ্যে সোরোকিনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সমাজবিজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে সমস্ত মতামতকে নয় ভাগে বিভক্ত করতে গম্রহ হয়েছেন।^১

আজকের দিনের সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক ম্যাক আইভার এবং লিওপোল্ড ফন উইস। অধ্যাপক ম্যাক আইভারের নাম অর্থনীতি রাজনীতির ছাত্রাব সকলেই জানেন—তাঁর মতবাদ বুঝতে হলে সমাজবিজ্ঞানের মূলনীতি জানতেই হবে। জার্ষান সমাজবিজ্ঞানী উইসই প্রথম সমাজবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরূপে দেখবার চেষ্টা করেন এবং সেইভাবে গবেষণা চালান। উইসএর মতে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সমন্বের আলোচনা ("A study of interhuman relations")। মানুষ হচ্ছে সমাজের প্রথম এবং প্রধান উপাদান—কাজে কাজেই সমাজবিজ্ঞানেরও বটে। কিন্তু মানুষের সমস্ত আচরণই সমাজবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না। মানুষের খাওয়া খুমানো প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণমিতিক কাজের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের কোন ঘোগ নেই। কিন্তু যখনই মানুষ অন্য মানুষের সংস্পর্শে আসে তখনই সে হয় সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণার বস্ত। মানুষের এই দিকটার নাম সমাজবিজ্ঞানীর কাছে 'সামাজিক' (ইংরেজীতে যাকে বলে সোসিয়াল)। এই সামাজিক নিয়েই সমাজবিজ্ঞানের যত কিছু কেরামতী—সমাজবিজ্ঞানের ইউনিট হচ্ছে এই সামাজিক। অ্যাডাম স্মিথের ইকনমিক ম্যানেগ্র মতোই সামাজিকও অস্তিত্বীন তবে

গবেষণার স্বিধার জন্য সামাজিকের অস্তিত্ব স্বীকার করা হব। সামাজিক যা করে তা হলো সামাজিকতা (প্রতিশব্দ ডিসেম্বেন) ।

একটা উদাহরণ দিলে বোধহয় জিনিষটী একটু পরিষ্কার হবে। মনে করুন আপনি চলেছেন অনেক দূর—টেনের কামরায় আপনি একলা তখন সমাজবিজ্ঞানীর কোন সম্পর্ক নেই আপনার সঙ্গে। কিন্তু যখনই আরেকজন লোক কামরায় এসে ঢুকলেন—আপনি কোতুংগী প্রকৃতির হলে মনে জাগবে আপনার হাজার প্রশ্ন—সমাজবিজ্ঞানীর কাজ স্বৰূপ হবে তখন খেকেই। আপনি আলাপী প্রকৃতির হলে আলাপ জমাবার চেষ্টা আরম্ভ করবেন, উমরিগড় দিয়ে বলবেন, এতদিনে বোধহয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের মাথায় স্বরূপীর উদয় হলো—তাবৎপর I. F. A.র সংসাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন। আপনার সহযাত্রীটি আপনার মতো মিশুক প্রকৃতির লোক হলে আর ভাবতে হবে না, অলঙ্কণ বাদেই আপনারা পৃথিবীর আদর্শ বন্ধুযুগল হয়ে দাঢ়াবেন। বহু স্মরণীয় প্রেমকাহিনীর স্তুতিপাত এই ভাবেই হয়েছে বলে শোনা যায়। এখানে আমরা দেখলাম এক সামাজিক আরেক সামাজিকের সংস্পর্শে এবং তাদের মধ্যে এমন এক সম্পর্ক স্থাপিত হলো যা কাছে টানে। সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এর নাম ডিসেম্বেন।

কিন্তু এর উন্টেটিও হতে পারে—ধরুন আপনি যেই I.F.A.র প্রশংসা স্বৰূপ করলেন আপনার সহযাত্রীটি সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে খামিয়ে বলে উঠলেন—‘এত বাজে বকেন কেন?’ হলেই এরকম অভ্যর্থনা পেয়ে আপনি ঘাবড়ে গিয়ে বাকী সময়টা ঝুপ করেই কাটাবেন। এখানে যে সম্ভবটা স্থাপিত হলো সেটা দূরে নিয়ে যায়—এর নাম ডিসেম্বেন।

আর এক সময়ে দেখি আমাদের পারস্পরিক ব্যবহারটি কিছুটা অ্যাসোসিয়েটিভ, কিছুটা ডিসেম্বেটিভ,—এর নাম মিশ্র প্রক্রিয়া। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা এই তিনি প্রক্রিয়া নিয়েই। আমরা যদি আমাদের নিজেদের সামাজিক ব্যবহার বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব আমাদের মধ্যে এই তিনি প্রক্রিয়া অহোরাত্র কাজ করছে। আমরা বন্ধুকে দেখলে এগিয়ে আসি, পুলিশ দেখলে পালাই আর বেশীর ভাগ সময়েই ছুটে। মিশ্রিয়ে ফেলে কাজ করি, কাছেই ব্যবহারটা দাঢ়ায় তৃতীয় বা মিশ্র পর্যায়ে।

সমাজবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে এই অ্যাসোসিয়েন এবং ডিসেম্বেন প্রক্রিয়ার ভাল ঘাবে বিশ্লেষণ করা এবং এই ছই প্রক্রিয়ার ফল কি দাঢ়াবে সে সম্পর্কে গবেষণা করা। একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ার ফলেই উদ্বৃত্ত হয় নানারকমের লোগুগু যেমন পরিবার সভ্য ধর্মসম্প্রদায়, রাষ্ট্র প্রভৃতি এবং শেষোক্ত প্রক্রিয়ার বিষময় ফল দিয়ে দেখা দিতে পারে বিশ্যুক। সমাজবিজ্ঞানীর কাজই হচ্ছে এইসব ফল সম্পর্কে গবেষণা করা এবং সভ্যতার ওপর তার কি প্রভাব হতে পারে সে সম্পর্কে আলোচনা করা।

একটি কথা মিশ্চয়েই ধরতে পেরেছেন যে মনস্ত্বের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের যোগ নিবিড়। যাই কথা বলতে কি, মনস্ত্বের সাহায্য ছাড়া সমাজবিজ্ঞানের একপাও চলা মুক্ষিল। তাই

বার বার সমাজবিজ্ঞানীকে মনস্তত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যক্তিবিশেষের মনস্তত্ত্ব থেকে স্থুল করে জনতা-মনস্তত্ত্ব পর্যন্ত সবই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে—সমাজবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। গত দান্ডার সময় একটি জিনিয় লক্ষ্য করেছেন অনেকেই—যেই শোনা গেল “ওই এসে গেল” কে এসে গেল, কোথায় তারা এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেই সকলে উর্দ্ধশাসে ছুটতে লাগলেন—তা তাদের যতই বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক না কেন। এই নিজের ব্যক্তিত্বের সাময়িক বিলোপ জনতামনস্তত্ত্বের একটি প্রধান বিশেষত্ব। আমাদের জনপ্রয় বিধানসভা আইনসভা গ্রন্তিতে সমাজবিজ্ঞানীর চোখে একধরণের জনতাবিশেষ। বিখ্যাত নেতাদের জনপ্রয়তার পেছনেও এই জনতামনস্তত্ত্বের দান অনেকখানি।

সমাজ বিজ্ঞান তার দলের আর পাঁচটা সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে ন্তুন এবং সবচেয়ে সন্তানাপূর্ণ। ন্তুন হলেও সমাজবিজ্ঞানের স্থচনা গ্রীকদেরও আগে থেকে। সমাজের উৎপত্তি সমস্কে গবেষণা প্রায় সমাজের উৎপত্তির মতোই পুরাতন। তবে কিছুটা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা স্থুল হয় গ্রীকদের সময় থেকেই। সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক রূপ উনবিংশ শতাব্দীর চেয়ে পুরানো নয়। উনবিংশ শতাব্দীতেও সমাজবিজ্ঞানীরা মাত্র কয়েকটি সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ধারা হচ্ছে—সমাজবিজ্ঞানকে প্রগতিবাদ এবং ইতিহাস দর্শনের সঙ্গে এক করে ফেলার চেষ্টা। সমাজবিজ্ঞানকে যায় প্রগতিবাদ ভাবতেন তাদের সকলের নামই আপনারা জানেন—কোঁতে, স্পেসার, হেগেন মার্ক্স। কোঁতেকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের জন্মদাতা বললেও অতুল্কি হয় না। কিছু তিনিও তাঁর সময়ের দোষ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, ফলে তিনি বাবে বাবেই ফিরে গেছেন অর্ডার এবং প্রোগ্রেসের প্রশ্নে। কোঁতের ধারণা, সেই সমাজই শ্রেষ্ঠ সমাজ যে সমাজ অর্চর এবং প্রোগ্রেস এই ছয়ের স্থুল সমস্য। কিন্তু এখানে প্রশ্ন থেকে যায় অর্ডার কি এবং প্রোগ্রেস কি? অর্ডার বলতে কি আমরা বুঝে আইনালোচনার চলা—কিন্তু সমস্ত আইনকে মেনে নেওয়া কি বাঞ্ছনীয়—সেটা জাগ্রত মনের অভাব বোঝায়—সেটা যত্নের লক্ষণ। আর অর্ডার বলতে যদি আমরা বুঝি আমাদের মধ্যে যা ভাস্ত জিনিয় বর্তমান তাকে পুরোপুরি রক্ষণ করে এবং প্রোগ্রেস বলতে বুঝি তাকে উন্নততর করার প্রচেষ্টা, তাহলে অর্ডার আর প্রোগ্রেস এই তফাংটি থাকে কোথায়?

অর্ডার এবং প্রোগ্রেস ছাড়া আর যেসব প্রশ্ন নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানে ভেবেছেন তাদের মধ্যে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র এবং ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র নিয়ে বন্দেহ হচ্ছে প্রধান এই সমস্যা নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল কার্ল মার্ক্স। কিন্তু মার্ক্সবাদীর সংখ্যা দেশে এত বেশী যে তাঁর সমস্কে কিছু বলতে যথে বাতুলতাবাই নামান্তর।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানের আরেকটা বিশেষত্ব—সমাজবিজ্ঞানের হচ্ছে আবিস্কারের জন্য সমাজবিজ্ঞানীর আপ্রাণ চেষ্টা। এই সমস্ত মিলিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর

সমাজবিজ্ঞান খুব পরিষ্কার একটী রূপ নিতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে আজ আমরা দেখতে পাই উনিশ শতাব্দীর সেইসব মতবাদ বর্জন করা হয়েছে এবং আর পাঁচটা বিজ্ঞানের মতোই সমাজবিজ্ঞানও একটী বিজ্ঞানসম্মত পথ নিয়েছে।

যুক্তিভর পৃথিবীতে আজ যে সমাজবিজ্ঞানীর প্রয়োজন করতানি তা কোনো বুদ্ধিমান যাক্তিকেই বুঝিয়ে বলতে হবে না। খাত্ত সমস্যা, বেকার সমস্যা, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন সমস্যা, অন্নবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধবৃক্ষি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আজ প্রায় প্রত্যেক দেশকেই। আজকের পৃথিবীর সমস্যা যত বাড়ছে সমাজবিজ্ঞানীর সমস্যাও ততই বেড়ে চলেছে। সমাজবিজ্ঞানীর সমস্যার তুএকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে আজকের দিনের সমাজবিজ্ঞানীর কাজ কত জটিল হয়েছে।

শুনতে অন্তুত হলেও, কোন সমস্যাটী সামাজিক আর কোনটী নয় এটীই সমাজবিজ্ঞানীর প্রথম সমস্যা। আগেই বলেছি সমাজবিজ্ঞানের স্তুতি খোঝবার ঈকান্তিক একটী চেষ্টা সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায়। এই জন্য একদল সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক সমস্যার একটী নিয়ম বেঁধে ফেলবার চেষ্টায় বলেন যে, যে কোন সামাজিক পরিবর্তনই একটী সামাজিক সমস্যা। এ দলের নেতৃত্বে হচ্ছেন রোশেনকুইস্ট। এই ফরমূলা মেনে নিতে আপত্তি বিশেষ নেই কিন্তু মুশকিল এই, সমাজ যখন কোন পরিবর্তনকে সহজভাবে মেনে নেয় তখন তাকে আর সমস্যাপদবাচ্য করা চলে না যখন পরিবর্তনের পথে ওঠে প্রতিবাদ তখনই সেটা হয় সমস্যা কিন্তু তখন তাকে পরিবর্তন হিসেবে প্রতিপন্থ করা শক্ত। বাসে যখন ধূমপান নিষিদ্ধ করা হ'ল তখন কেউ প্রতিবাদ না করে মেনে নিলেন, এটী আর সমস্যা হিসাবে দেখা দিল না। কিন্তু যখন টামের রিতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক পয়সা বাড়লো তখন প্রতিবাদ উঠলো ধংঢার কঠে আর তখনই সেটা দেখা দিল সমস্যাকৃপে। এই দুটো উদাহরণেই বোঝা যাবে রোশেনকুইস্টের ভূলটী কোথায়।

আরেকদল সমাজবিজ্ঞানী মার্কিনে অভুসরণ করে বলেন যে সামাজিক সমস্যা দলবিরোধ (Group conflict) ছাড়া কিছুই নয়। তাঁরা বহু দল আবিষ্কার করেছেন—যেমন পুঁজিপতি এবং সর্বহারা, ছাত্র এবং শিক্ষক, হিন্দু ও মুসলমান। এই সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এইসব সামাজিক দলের বিরোধই হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। আপাতদৃষ্টিতে এই উত্তরটাকেই খাটী বলে মনে হয়। এই মত নিঃসন্দেহে অনেকাংশেই সত্য কিন্তু একটু ভাবলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে সব সমস্যাই দলবিরোধের তৈয়ারী নয়। আজ যদি প্রেগ দেশে মহামারীরপে দেখা যাবে সেটা নিশ্চয় সামাজিক সমস্যাকৃপে পরিগণিত হবে কিন্তু সেটা দলবিরোধের ফলে উৎপন্ন বলতে অতি বড় উৎসাহীও একটু গোলমালে পড়বেন।

আরেকদল সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামাজিক সমস্যাগুলির বিভিন্ন নাম দিয়ে তার কারণ শির্ষে করাই আদর্শ পষ্ট। কিন্তু এ প্রথার গোল অনেক। একটী সামাজিক সমস্যার নাম দেওয়া গেল দারিদ্র্য। কিন্তু কারণ অভুসর্কান করতে গিয়ে হয়ত জানা যাবে দেশে বিধবার

সংখ্যাবৃদ্ধি এই দারিদ্র্যের মূল কারণ। এখানে দেখা গেল যে সমস্তার নাম আমরা দিয়েছিলাম দারিদ্র্য তা আসলে হচ্ছে মৃত্যুহারণী সমস্ত।

এতক্ষণে যদি ধারণা হয়ে থাকে যে সামাজিক সমস্তা বলে কিছু নেই তবে দোষ বিশেষ দেওয়া চলে না। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর কাছে সামাজিক সমস্তা কি সে সমস্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দেশে প্রত্যোক সমাজে প্রত্যেক সময় একটা সর্বজনসম্মত সমাজ আছে। সেই সমাজব্যবস্থা হয়তো কালের সঙ্গে সঙ্গে বদলিয়েছে কিন্তু সবসময়েই একটা সমাজব্যবস্থা সকলেই চেয়েছেন। যখনই সেই সর্বজনসম্মত সমাজব্যবস্থা থেকে কোনো বিচ্যুতি ঘটে তখনই হয় সামাজিক সমস্তার স্ফূর্তিপাত। যখন প্লেগ মহামারীরপে দেখা দিল তখন সেটি সর্বজনসম্মত সমাজব্যবস্থা থেকে একটি বিচ্যুতি ঘটল এবং সেই কারণেই সেটি সামাজিক সমস্তা। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সেই সর্বজনসম্মত সমাজব্যবস্থা পৃথিবীতে কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নি বা হবেও না; ফলে সামাজিক সমস্তা চিরকাল ছিল এবং থাকবেও।

পরিশেষে এইটুকু মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে সমাজবিজ্ঞানীর কাজ তথ্যান্তর্কান আর বিশেষণ। কোনো বিশেষ সমস্তার নৈতিক দিক সমাজবিজ্ঞানের সীমার বাইরে। দেশে ছাত্রদের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা যদি বেড়ে যায় সমাজবিজ্ঞানী তার কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন; হাজার রকমের প্রতিকার বাস্তুতে পারেন কিন্তু পরলোকে এর বিষয় ফল সমস্কে গবেষণা করা তাঁর পক্ষে অনধিকার চৰ্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি কি হওয়া উচিত এ সমস্কে কোনো কিছুই বলবেন না—তাই যিনি বলতে চান তিনি নিজেকে সমাজ দার্শনিক বলে পরিচয় দিন তাতে তিনি কাউকেই ঠকাবেন না অন্তত নিজেকে তো নয়ই। আজকের সমাজের অবস্থার পর্যালোচনা করে সমাজবিজ্ঞানীর যদি মনে হয় সাম্যবাদের প্রবর্তন অবধারিত সত্য তবে সেটুকু বলেই সমাজবিজ্ঞানীর কাজ শেষ। এসপৰ্কে বিষাদগ্রস্ত হওয়া বা উৎসাহ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে শুধু অশোভন নয়, অগ্রায়। আগবিক শক্তির গবেষণাপর্ব চলে ল্যাবরেটরী ঘরের চার দেওয়ালের মাঝে। আর তার ধ্বংসলীলার প্রয়োগস্থল হয় বাইরের বিশ্ব। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসেবে এ প্রয়োগ সমস্কে নির্বাক থাকতে হবে গবেষককে। সমাজবিজ্ঞানও এমনি একটি বিজ্ঞান—সমাজবিজ্ঞানীও একজন বৈজ্ঞানিক—তাঁরও কর্তব্যের পরিধি টানা রয়েছে ওখানেই। সমাজবিজ্ঞানীর সঙ্গে Ethics এর সম্পর্ক খুব কম।

মানব হিসাবে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা অবশ্য সকলেরই আছে। আর এটি তো মানতেই হবে এই রকম বিগতস্মৃহ হয়ে মানবের পক্ষে চার ঘটার বেশী থাকা সম্ভব নয়, বাকী কুড়ি ঘটা সমাজবিজ্ঞানী সাধারণ মানুষ। সমাজবিজ্ঞানী যেখানে সাধারণ মানুষ তাঁর মতে মূল্যও সেখানে সাধারণ। যেখানে তাঁর কথার উজ্জ্বল ভারী, যেখানে তাঁর তথ্যবিশেষণ অব্যাপ্ত সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত একেবারেই অবাস্তব। সেখানে সমাজবিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞান দলনিরপেক্ষ তাঁর কাজ, মতনিরপেক্ষ তাঁর বিশেষণ আর অমোঘ সত্য তাঁর সিদ্ধান্ত।

ইতিহাস-বিজ্ঞান

বিনয় চৌধুরী—পঞ্চম বর্ষ, আর্ট্স

প্রাগিতিহাসিক আৰ ঐতিহাসিক যুগেৰ সীমাবেধে আজ প্রায় ঘুচে যেতে চলেছে—প্রাগিতিহাসিক যুগেৰ সীমান্ত পেৱিয়ে থাবাৰ ছাড়পত্ৰ মিলেছে ঐতিহাসিকদেৱ নিৱলস অমুসন্ধানেৰ মূল্যসুৰূপ। কিন্তু ইতিহাসবোধেৰ দিক থেকে আমৱা যেন এখনও প্রাগিতিহাসিক যুগেৰ আধ-আলো আধ-ছায়াময় পৱিবেশে—আবিষ্ট সেখানে আমাদেৱ চেতনা, বিভাস্ত আমাদেৱ বুদ্ধি। প্ৰকৃতিৰ খামখেয়ালীগনাকে মাঝুষ পায়ে বেঢ়ী পৱিয়েছে—কিন্তু আপন সামাজিক পৱিবেশ সম্পর্কেই সে বড়ো বেশী রকমেৰ বেওয়াকিফহাল। তাৰ হালচাল কিৱকম বেগতিক ঠেকে। ইতিহাসকে আমৱা যেন সচেতনভাৱে স্থষ্টি কৰতে পাৱছিন। আমৱা যেন ইতিহাসেৰ হাতেৰ পুতুল—আৱ পুতুলনাচেৱ ইতিকথাকে আমৱা ইতিহাসেৰ উকি পৱিয়ে জাতে তুলছি। বিজ্ঞানেৰ জগত মাঝুষ-প্ৰকৃতি দৰ্শনেৰ পটভূমিকায় মাঝুষেৰ চেতনাৰ সন্তোষিৰ ইতিহাস। যুক্তিশৃংখলা আবিক্ষাৰ কৰে বিজ্ঞান পৰ্যবেক্ষণ ও পৰীক্ষা নিৱীক্ষাৰ মধ্য দিয়ে আৱ ব্যবহাৰিক জগতে তাৰ প্ৰয়োগেৰ দ্বাৰা সে জ্ঞানেৰ বিকাশ সন্তোষ হয়। বিজ্ঞানেৰ এ প্ৰক্ৰিয়া বিশেষ এক বোধেৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত—বিজ্ঞান বিশ্বাস কৰে আমাৰ চেতনাৰ রংঝেই পান্না হয়ে উঠে না সবুজ, চূলী হয়ে উঠে না রাঙা—চেতনাৰ বাইৱে এক বস্তুবিশ্ব পাৱন্পৰিক অছেত্য সম্পর্কেৰ মধ্য দিয়েই দৰ্শনেৰ ভেতৱে নৃতন নৃতন রূপে বিকাশ লাভ কৰছে, বিজ্ঞান তাই বিশ্বাস কৰে। নিউটনীয় পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ যান্ত্ৰিক বিকাশ ও যাথাৰ্থ্যেৰ স্থানে আজ বিৱোধেৰ মধ্য দিয়ে গতিময় প্ৰকৃতিৰ বিকাশমানৱৰপ্রই স্বীকৃত—যেখানে যাথাৰ্থ্যকে দেখা হয় সন্তোষ্য বিকাশেৰ বিশেষ একটা অংগ বলে। বস্তুৰ এ দ্বাৰিক অভিব্যক্তিৰ ফলে পৱিমাণগত বিকাশ থেকে গুণগত বিকাশে উত্তৱণ—বিজ্ঞানে আৱ একটা স্বীকৃত সত্য। তাই বিজ্ঞান বস্তুৰ গতিপ্ৰবাহে অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য কৰে। বস্তুৰ স্বৰ্গ আপন বিকাশে—একথা বিজ্ঞান বিশ্বাস কৰে বলে অতিপ্ৰাকৃত কোনো শক্তিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ইতিহাসকে যদি বিজ্ঞান হতে হয়, তাহলে সমাজেৰ বিকাশেৰ মূলনীতিকে আবিক্ষাৰ কৰতে হবে। ইতিহাস সমগ্ৰ সমাজেৰ ইতিহাস বলে প্ৰকৃত ইতিহাস সামগ্ৰিক সমাজ-বিশ্বেষণেৰ পদ্ধতি দিয়ে সুৰক্ষা হবে—প্ৰয়োজনীয় ঘটনাৰ ধাৰাবাহিক বিশ্বেষণে নয়। এই বিকাশকে যদি সমাজেৰ দৰ্শনেৰ, বিৱোধেৰ মধ্য দিয়ে নৃতন রূপেৰ ইতিহাস বলে দেখা যায়, তাহলে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলা যেতে পাৰে। বিজ্ঞানেৰ জগতে মূলনীতিৰ সন্তোষ্যতাৰ উপৰই আজকাল বেশী জোৱ দেওয়া হয়—আংকিক ফৱমূলাৰ দস্তৱকে কোনো রকমেই আজ মানা হচ্ছে না। ইতিহাসেৰ জগৎ প্ৰকৃতিকে ছাড়িয়ে ও তাকে ঘোগ কৰে একটা স্বতন্ত্ৰ

জগৎ। বিকাশের ধারাও তার জটিল। তাই এখানে ভবিষ্যতের যে ইংগিত দেওয়া তা কোন সঠিক বিকাশের নিভূল ইংগিত হতে পারে না। আজকে আমরা ইতিহাসের করেকট মৌলিক নীতি বুঝতে পারি—যেগুলোর আসল চেহারা সিদ্ধান্ত হিসাবে—ঝুঁ মূলনীতিগুলো মাঝে তখন বুঝতে পারে নি। বিজ্ঞানের জগতে যেমন জ্ঞান আর প্রয়োগের নিবিড় সম্পর্ক—ইতিহাস-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হ্যানি। প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানের যে ধারণা ও প্রক্রিয়া, ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনুরূপ ধারণা ও প্রক্রিয়া যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলতে আপন্তি থাকেনা—বিজ্ঞানের নিয়মনীতি ইতিহাস-বিজ্ঞানের নিয়ম-নীতির চেয়ে টের বেশী সত্য ও যথার্থ কিনা—তার প্রশ্ন একেত্রে উঠেন। একেত্রে যা বিচার্য তা হল এই যে ইতিহাস শুধু যুক্তিবিজ্ঞান থেকে অনেক বড়ো পরিধির মধ্যে আপনার এলাকাকে প্রসারিত করতে পারে।

ইতিহাস ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা গেছে ভাববাদ বা যান্ত্রিক বস্তুবাদকে আমদানী করা হচ্ছে। ভাববাদীদের মতে ইতিহাস হোল একটা অস্তিত্ব ভাবের আজ্ঞ-প্রকাশের রূপ—ইতিহাসে পটপরিবর্তন এ ভাবের দ্বন্দ্বের ফলেই। অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে যেন ইতিহাসের ম্য দিয়ে। হেগেলের Absolute idea, ফিশারের লিবার্টি, টয়েনবির ধর্ম—প্রধানত ভাববাদী দর্শনের, বিভিন্ন দিকের প্রতিভূ। কিন্তু ইতিহাস যে বিজ্ঞান তা কোনটারই দ্বারা প্রমাণিত হ্য না। হেগেল ইতিহাসে গতিবাদের কথা বলে ইতিহাস-বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু হেগেল যখন বলেন যে মাঝের রাজনৈতিক ইতিহাসের চরমতম রূপ হোল প্রাশিয়ার ১৮৬৮ সালের শাসনস্তুত, তখন অসংগতিটা চোখ এড়াতে পারে না। আগে থেকেই নির্বারিত কোন লক্ষ্যের অভিযন্তে ইতিহাসের গতিধারা নয়। প্রধানত সামাজিক মাঝের কার্যকলাপই ইতিহাসের বড়ো কথা বলেই যদি ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসাবে মর্যাদা দিতে হয় তাহলে বস্তুবিচ্ছিন্ন এ ভাবকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। ফিশার লিবার্টি কি তা স্পষ্ট ভাষায় কথনও বলেননি। অথচ তিনি বলেছেন যে যুরোপীয় ইতিহাসের আসল রূপ এ লিবার্টির ধারণার ক্লপায়নের ইতিহাস। লিবার্টির ধারণা আপোক্ষিক। সামন্ততাত্ত্বিক যুগে যে লিবার্টি, ধনতাত্ত্বিক যুগে তা সম্পূর্ণ পৃথক। আবার একই যুগে, যেমন ধনতাত্ত্বিক যুগে, বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে যা খোদ স্বাধীনতা সর্বহারাদের কাছে তা হল পারের বেড়ো। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে ইতিহাসে এ লিবার্টির ধারণার বিবর্তন বেশ প্রয়োজনীয় একটা অংগ। কিন্তু স্বয়ংভাবের বস্তুবিচ্ছিন্ন বিবর্তনকে ইতিহাসের মূল নিয়ামক বলে মেনে নেওয়া ইতিহাসের ব্যার্থ সরলীকরণ। ইতিহাসে গুণগত বিকাশকে ব্যব্যায়া করা যায় না এ তরের দ্বারা। টয়েনবির ব্যাখ্যাতে বিভিন্ন সভ্যতায় পরস্পরের উপর উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে আবিক্ষিয়ার প্রভাবকে জ্ঞের দেওয়া হয়ন। যদিও ভৌগোলিক কারণে এ ঘোগাঘোগ অনেকক্ষেত্রে স্পষ্ট হ্যনি, তথাপি এটা ইতিহাসের একটা স্বীকৃত সত্য। আবার কোন দেশের ইতিহাসকে সংস্কৃতি

বিবর্তনের ইতিহাস মনে করে টয়েনবি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সংগে সংগে সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশে যে পরিবর্তন আসে তার দিকে মোটেই নজর দেন নি। ঐতিহাসিক কারণেই রাশিয়ার ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার উপর বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সমাজ-তাত্ত্বিক রাশিয়ার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে পুরোনোদিনের পরিমাণগত ধারাবাহিকতা মনে করা ইতিহাসের বিকাশকে অস্বীকার করা। বিজ্ঞানের সব চাইতে বড়ো কথা এ বিকাশের ধর্ম। মাঝের সাংস্কৃতিক জীবনের মধ্যে যে পরিবর্তন, তা কি করে ব্যাখ্যা করা যাবে—প্রাগান যুরোপ থেকে শ্রীষ্টীয় যুরোপে উত্তরণ, রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাবকে ব্যর্থ করে প্রোটেস্ট ধর্মের জয়যাত্রা কি করে ব্যাখ্যা করা যায়? আর ইতিহাসে কি গুণগত বিকাশ আসে এ সংস্কৃতির পরিবর্তনে? অন্যদিকে ভৌগোলিক পরিবেশ দিয়ে, অর্থনীতির তথাকথিত চিরস্তন নীতিসূত্র দিয়ে ইতিহাসব্যাখ্যা একান্তভাবেই যান্ত্রিক। ভৌগোলিক পরিবেশ অপরিবর্তনীয় থাকলেও ইতিহাসে পরিবর্তন আসে। সামন্ততন্ত্রের ক্ষেত্রের পর নৃতন অর্থনীতির প্রবর্তন ইটালীয় ঐতিহাসিকদের মাঝের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ভাবিয়ে তোলে—তাঁরা সম্পূর্ণ ইতিহাসকে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বলে মনে করেন। এ অর্থনীতির সংগে রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক জীবনবৈধের সম্পর্ক কোথায়—তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। অথচ ইতিহাস হল সামাজিক মাঝের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সামগ্রিকতা। ব্যক্তির প্রাধান্য দিয়ে ইতিহাস-ব্যাখ্যার চেষ্টা সম্পূর্ণাংগ হতে পারেনা। ব্যক্তির সংগে সমাজের সম্পর্ক, এতে পরিষ্কার করে বলা হয় না—ইতিহাসের বিশেষ একধাপে জন্মগ্রহণ করেন বলে ব্যক্তির প্রতিভাও তার দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। ইতিহাসের গতিধারাকে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় পরিবর্তিত করতে পারে না। আবার ব্যক্তির ইচ্ছা বিভিন্ন সময়ে ব্যর্থ হয়—ব্যক্তি দিয়ে ইতিহাসের সামগ্রিক অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করা যায় না—নেপোলিয়নের দ্বারা তদানীন্তন যুরোপের কয়েকটা রাজনৈতিক ঘটনাকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—কিন্তু তদানীন্তন সামন্ততাত্ত্বিক শক্তির পূর্ণাবর্ফয়, ফিনান্স ক্যাপিটালিজমের অভ্যন্তর, জাতীয়তাবাদের উন্নয়ন, ব্যালজাকের অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টি—এর কোনটাই প্রমাণিত হয় না। ব্যক্তির প্রভাব ততটুকু যতটুকু সে ইতিহাসের গতিধারাকে এগিয়ে দেবে বা পেছিয়ে দেবে। বিরাট সমাজের সাধারণ মাঝুষ কি ভাবে ইতিহাসে কাজ করে তার কোন দুবিষ্টই পাওয়া যায় না। ইতিহাস বিকাশ—ইতিহাস পুনরাবৃত্তি নয়—স্পেংগলারীয় দর্শন তার সোজাস্থজি বিরোধিতা। মানাকারণে সমাজে প্রগতির দ্বারা ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু বিকাশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্পূর্ণভাবে অবৈত্তিহাসিক। কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে—পুনরাবৃত্তি হতে পারে কিন্তু যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করা যায়—তাহলে এটা আবার টেঁকেন।

মননের জগতে বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রগতি, অর্থনীতির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন, দর্শনের জগতে হেগেলীয় ডায়ালেকটিক্স সমাজের বিকাশ সম্পর্কে আমাদের ধারণাতে বেশ

কিছুটা স্বস্পষ্টতা আনতে পেরেছে। মধ্যযুগে এ ইতিহাস-বিজ্ঞান স্ফটি সন্তু হয়নি নানা কারণে। চার্টের প্রভাবে মাঝে ইতিহাসে অলৌকিক শক্তির প্রভাবকে স্বাভাবিক বলে মনে করত। ধর্মস্থষ্টি এ মুচ্চতাকে বিজ্ঞান তথনও আঘাত দেয়নি। সামন্ততান্ত্রিক জগতে মাঝের মনের পরিধি সীমাবিত ছিল টুকরো টুকরো ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে। অতীতের সংগে বর্তমানের যোগাগ পরিস্কৃত হওয়া সন্তু ছিলনা—যার ফলে মনে হোত সামন্তত্ত্ব যেন মৃত্তিমান বিশ্বখন। বর্তমান ধনতান্ত্রিক জগৎ মনের জগতে মাঝের এ ঘেরাটোপকে ভেঙ্গে দিয়েছে—বিরাট পৃথিবীর সমগ্র রূপ আজকে স্ফটি হয়ে দেখা দেয়। বর্তমান ধনতান্ত্রিক জগতে উৎপাদন পদ্ধতির নিয়ত বিকাশ—বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উৎক্ষেপ সমাজের চঙ্গল গতিপ্রবাহ সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পরিষ্কার করেছে। কিন্তু আধুনিক যুগেও কেন ইতিহাস-বিজ্ঞান স্ফটি হয়নি?

শ্রেণীসমাজে অবক্ষয়ের যুগে চিন্তা আর কর্মের মধ্যে বিরোধ খুব স্বস্পষ্ট হয়ে উঠে। ইতিহাসের দিক থেকে শ্রমবিভাগ সামাজিক প্রয়োজনেই স্ফটি হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে কারও কারও চিন্তার একচেটিয়া অধিকার, আর কারও কারও কর্মের দাসত্ব করার অধিকার প্রধানত এ সমগ্র সমাজের প্রয়োজনের বিরোধী। শ্রম হল সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিস্তার প্রকাশ—মাঝুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বের উপর জয়ী হবার জন্য মাঝের বিশেষ একটা হাতিয়ার—কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে মুষ্টিমেরের স্বার্থে—এখানে তাই সাধারণভাবে ভাবাদর্শ শাসকশ্রেণীর পরিপোষক হয়। শ্রম আর চেতনার এ বৈরিতার ফলে ঐতিহাসিক সামাজিক জীবনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। আবার ধনতন্ত্রকে একটা পাকাপোক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে মনে করা হয়—ইতিহাসকে যদি বিজ্ঞান বলে মেনে নেওয়া হয়—তাহলে ধনতন্ত্রের অবসান অনিবার্য একথা মানতে হবেই। কিন্তু বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা তা স্বীকার করেন না। আসলে ইতিহাস হোল অতীতকে বর্তমানের মধ্যে দেখার বিশেষ এক ভঙ্গী। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা অতীতকে বিশেষ এক বিশ্বখন বলে মনে করেন—যার একমাত্র দাওয়াই বর্তমানের সমাজ ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই যে অতীতের জীর্ণ সমাজব্যবস্থা আধুনিক কালের সমাজব্যবস্থার জন্য পথ করে দিল—ঐতিহাসিকেরা তা দুঃখে পারেননা। শ্রম আর চেতনার এ বিচ্ছেদের ফলে ইতিহাসের যে ব্যক্তিকরণ আর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চিরস্থন মনে করা সব সময়ে সচেতন নয়। অথচ শ্রম আর চেতনার বিরোধের ফলে সাধারণ মাঝুষকে মর্বানা দেওয়া বুর্জোয়া ঐতিহাসিকের পক্ষে সাধারণতঃ সহজ হয় না। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা ইতিহাসে হিরোর সন্ধান করে বেড়ান—কেমনা বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা সামাজিক ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাকে ডিঙ্গে উঠে সবরকম সামাজিক সম্পর্ককেই অঙ্গীকার করার সামিল। বুর্জোয়া চিন্তান্ধারকের সমাজের সংগঠনকে সাধারণত স্বীকৃতি দেবেন না। এর কারণগুলুপ বলা যেতে পারে মুনাফাহস্তির জন্য বুর্জোয়া শ্রেণীর আসল হাতিয়ার হল কোন বকম রাষ্ট্রের বিধিনিষেধকে অঙ্গীকার করা।

এই প্রধান শ্রেণীর ভাবাদৰ্শ সমগ্র সমাজের আদর্শ হয়ে পড়ে। গর্কি বলেছেন শ্রেণীসমাজে মানুষের স্বাভাবিক ব্যক্তিসম্ভাবনার প্রকাশকে এমন আড়ষ্ট করে রাখা হয় চারদিক থেকে যে মানুষ নৈরাজ্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। এ সামাজিক সংগঠনকে না মানার জগতেই সামাজিক সংগঠনের মূলে যে সাধারণ মানুষের বাঁচার ইতিহাস আছে তা সম্পূর্ণ বাদ পড়ে। বুর্জোয়া-শ্রেণী দ্বারা সংগঠনকে স্বীকার করে ততটুকু যতটুকু তাদের মুনাফাতে সতর্ক প্রহরা দেওয়া যায়। এভাবে সামাজিক চেতনাবোধ বিক্রিত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বুর্জোয়া-দর্শনের কোন বিশেষ দিক ইতিহাস রচনার methodকে প্রভাবিত করেছে। পজিটিভিজম—ধার গোড়ার কথা জ্ঞানের সীমাহীন সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা—বস্তুকে অঙ্গের মনে করা—বিচ্ছিন্ন ঘটনাকেই প্রধান মনে করা—ইতিহাস রচনাপ্রক্রিয়ে কোনও কোনও দিকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। তাই ইতিহাসে ঘটনার সমাবেশই প্রধান হয়ে উঠে। মোট কথা একটা সামগ্রিক দর্শন সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের আলোচনাকে বাহ্যিক করেছে। আসলে ইতিহাস যে বিজ্ঞান হতে পারেনি তা বুর্জোয়া সংস্কৃতির অবক্ষয়ের লক্ষণ—তাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের শাখার মধ্যে ঐক্যের বদলে বিরোধিতাই যেন স্পষ্ট। ঘেরে তু মানুষের ইতিহাস সবকিছুকে মিলিয়ে, সে কারণেই স্বাভাবিক ভাবে ইতিহাসের মধ্যে এই ঐক্যবোধের অভাব।

আসলে যদি মানুষের সামাজিক সংগঠনের উৎপত্তি বিকাশকে বুঝতে পারি তাহলে দেখা যাবে ইতিহাস বিজ্ঞান—ইতিহাসের যাকিছু আকস্মিক ঘটনা, ব্যক্তির যা কিছু ব্যর্থতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবেন। সামাজিক গতিপ্রবাহ থেকে। ইতিহাস হল মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় সংঘবদ্ধ সমাজবন্ধ মানুষের সামগ্রিক সংগঠনের বিকাশের ইতিহাস—প্রকৃতির সংগে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে মানবিক করে তোলার সংগে নিজেকে পরিবর্তনের ইতিহাস। ফরাসী বিপ্লবের দ্বার্শনিক যাই ভাবন, সামাজিক সংগঠনকে অস্বীকার করে সামাজিক প্রগতি সন্তুষ্ট নয়—যা দুরকার তা হল সংগঠনের সামাজিক প্রয়োজনের বনিয়াদের উপর গড়ে তোলা—যাতে তা বিশেষ কোন শ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষক না হয়। আসলে সংগঠনের বিকাশ মানুষের মুক্তিকে খর্ব করা নয়। এ সংগঠনের গোড়াকার কথাই হল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যা মানুষ-প্রকৃতি দ্বন্দ্বকে ঘৃঢ়িয়ে দেবার প্রাথমিক উপায়। ইতিহাসে গুণগত পরিবর্তন তা উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে মানবিক করে—তোলার ফলেই। পুরাতন প্রস্তর যুগে পাথরের ব্যবহার নৃতন প্রস্তর যুগে কৃষিকার্যের প্রবর্তন, ব্রোঞ্জ যুগে তামার আবিষ্কার, লৌহযুগে মূল্যবান তামার বদলে লৌহ-গলানোর পদ্ধতি আবিষ্কার, মধ্যযুগে জলীয়শক্তিকে কাজে লাগানোর কৌশল উন্নতাবন—আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বাসকর অগ্রগতির ফলে শিল্পবিপ্লব ও অর্থনীতির জগতে বিপ্লব—এ হল বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অগ্রগতির রূপ, যার গোড়াকার কথা হল অর্থনীতিতে। রাজ-রাজড়ার বিবাদ-কোনোদলের ইতিহাস আসল ইতিহাস নয়, সমাজাতীত কোন ভাবের বিকাশের ইতিহাস,

ইতিহাস নয়। উৎপাদনপদ্ধতি সংঘবন্ধ বলে উৎপাদন সম্পর্কের প্রশ্ন আসে। সাধাৰণত উৎপাদনপদ্ধতি উৎপাদন সম্পর্ককে নিয়ন্ত্ৰিত কৰে—স্বতৰাং সংঘবন্ধ মাঝেৰ পারম্পৰিক সম্পর্ক মোটামুটি ভাৱে অৰ্থনীতিক কাৰ্যকলাপেৰ দ্বাৰাই নিয়ন্ত্ৰিত। সামন্ততাত্ত্বিক যুগেৰ ভূম্বামী আৱ ভূদৰ্সদেৰ সম্পর্ক ধনতাত্ত্বিক যুগে আৱ নেই—এখনে ধনিক শ্ৰেণী আৱ সৰ্ব-হাৱাৰ সম্পর্কই আসল সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্কও উৎপাদনপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্ৰিত কৰতে পাৰে। সামন্ততাত্ত্বিক যুগেৰ উৎপাদন সম্পর্ক নৃতন সম্ভাৱনাময় বুজোয়া উৎপাদনপদ্ধতিকে ব্যাহত কৰেছিল—আধুনিক যুগে ধনতাত্ত্বিক উৎপাদন সম্পর্ক বিভিন্ন ভাৱে উন্নততাৰ উৎপাদনপদ্ধতিৰ সম্ভাৱনাকে ব্যাহত কৰেছে।

ইতিহাসেৰ ক্রমবিৰত্তনেৰ পৰিকাৰ ধাৰাটি স্বচ্ছ হয়ে উঠে বন্দি আমৰা উৎপাদন-পদ্ধতিৰ আৱও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কৰি। পুৱোনো একটা সমাজব্যবস্থা সম্পূৰ্ণ অৰমুণ হয়ে গেলেই যে একটা নৃতন উৎপাদনপদ্ধতি বিকাশ লাভ কৰবে তা নৱ—পুৱোনো সমাজব্যবস্থাৰ মধোই এ বিকাশ স্বৰূপ হৰ—পৱে দেই সমাজেৰ মধ্যে ফাটল ধৰিয়ে দেয়। কেননা মাঝেৰ নৃতন উৎপাদনপদ্ধতিৰ আবিক্ষাৰ পুৱোনো উৎপাদনপদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কেৰ দ্বাৰা আংশিক নিয়ন্ত্ৰিত। প্ৰচীনেৰ সংগে প্ৰথম খাপ খাইয়ে নেওয়াৰ প্ৰশ্ন আছে, পৱে সামাজিক প্ৰয়োজনেই নবীনেৰ স্থষ্টি সম্ভব হয়। পুৱোনো সমাজেৰ ক্ষীয়মান উৎপাদনপদ্ধতিৰ মধ্যেই নৃতনেৰ বৌজ লুকিয়ে থাকে—পৱে তাৰ শাখা-প্ৰশাখাকে প্ৰমাণিত কৰে দেয় দেউলিয়া। সমাজব্যবস্থাৰ গভীৰে—তাতে জীৰ্ণ সমাজব্যবস্থা দীৰ্ঘ হয়ে যাব। আৱাৰ ইতিহাসেৰ ধাৰাই হল এমন যে ভবিষ্যতেৰ কৃপটা কি হবে তা সঠিক বলা সম্ভব হয়না। সামাজিক প্ৰয়োজনেই নৃতনেৰ জন্ম—সে নবজাতক কোন শক্তিকে আহ্বান কৰে আনবে তা জানা সম্ভব হয়না।

এ উৎপাদনপদ্ধতিৰ বিকাশ মাঝেৰ রাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক সংগঠন ও অ্যাগ্ৰাং ভাৰাদৰ্শকে প্ৰভাৱিত কৰে—মাৰ্ক' এ কথা বলেছেন 'ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইনসিম'ৰ ভূমিকাতে। রাজনৈতিক সংগঠন আইনকাৰুন প্ৰভৃতি যে নৃতন উৎপাদনপদ্ধতি ও সম্পর্কেৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত, ইতিহাস থেকে তাকে সহজে প্ৰমাণ কৰা চলে। প্ৰাক-ফ্ৰান্সী বিপ্লবেৰ সময়কাৰ সামন্ততাত্ত্বিক স্বার্থে পৰিচালিত রাষ্ট্ৰিক সংগঠন ও আইনকাৰুন বিপ্লবোত্তৰ বুজোয়া ফ্ৰান্সে অচল—তাই নৃতন আইনকাৰুনেৰ স্থষ্টি। আৱ তথনকাৰ যুগেৰ ভাৰাদৰ্শও এ নৃতন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ দৰ্শন। ব্যক্তিৰ মূল্কি আসলে সামন্ততাত্ত্বিক বিধিবিধানেৰ জঞ্জাল থেকে ব্যক্তিৰ মূল্কি—সে ব্যক্তি তো মন্দল গ্ৰহেৰ কোন জীৱ নৱ—তথনকাৰ যে বাস্তব সমাজ সংগঠন তাৰ মাছৰ—এক-কথায় সামন্ততাত্ত্বিক বিধিবিধান থেকে নৃতন উৎপাদন সম্পর্কেৰ মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মূল্কি। কিন্তু উৎপাদন-পদ্ধতি ও ভাৰাদৰ্শেৰ সম্পর্ক যাত্রিক কোন বৰকমেই নয়। আসলে এ হল দ্বাৰিক সম্পর্ক। নৃতন ভাৰাদৰ্শ যখন স্থষ্টি হয়, তখন তাৰ একটি বিশিষ্ট গতিবেগ স্থষ্টি হয়। সে ভাৰাদৰ্শ উৎপাদন শক্তিৰ উপৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। বিপ্লবেৰ সময়কাৰ ফ্ৰান্সী দৰ্শন তথনকাৰ

মধ্যবিত্তদের বুকে বল জুগিয়েছিল ; আবার এ ভাবাদর্শ উৎপাদনপদ্ধতিকে ব্যাহত করতে পারে—মধ্যযুগের চার্চের প্রচারিত ভাবধারা মাঝুমকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। যুরোপজোড়া রোমান ক্যাথলিক সাম্রাজ্যের কথা ঘোষণা করে ন্তন অর্থনৈতিক উপর গড়বার সম্ভাবনা নিয়ে যে নেশন রাষ্ট্রের স্ফুর তাকে ব্যাহত করেছিল। টাকা লেনদেনকে পাপ বলে চালিয়ে মার্কেন্টাইল ধনতন্ত্রবাদের বিকাশকে কণ্টকিত করে তুলেছিল। আবার দেখা যাবে যদিও উৎপাদন শক্তির উন্নতি বা বিকাশ অব্যাহত তবুও ধর্মের ভাবাদর্শে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা বা রাজনৈতিক সংগঠনে অনুরূপ ব্যর্থতার পরিচয় মেলে। এর কারণ স্ফুর বলা যেতে পারে যে উৎপাদন সম্পর্ক মাঝুমের বুদ্ধি ও অরুভূতিকে, এক কথায় মাঝুমের ব্যক্তিস্তার প্রকাশকে ব্যাহত করছে। ন্তন উৎপাদনপদ্ধতি স্বরূপ হবার সময় উৎপাদন সম্পর্কের সংগে বেশ একটা ছন্দ বজায় থাকে। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্ক যখন উৎপাদনপদ্ধতির সংগে বেহুরো হয়, তখন ঐ প্রতিক্রিয়াশীল উৎপাদনপদ্ধতিকে জীবিয়ে রাখার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের স্ফুর হয়—রাষ্ট্র জোর করে আইনকানুন দিয়ে এ উৎপাদন সম্পর্কটিকে রাখতে চায়। তবে এটুকু সাধারণভাবে বলা চলে যে বস্তু থেকেই চেতনার বিকাশ—মাঝুম-প্রক্রিতি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মাঝুম আপনার সংগঠনকে গড়ে তোলে ; গড়ে তোলে সাহিত্য ও শিল্পকে ; গড়ে তোলে মাঝুমের ধর্ম। তাই ইতিহাস আলোচনা করার সময় আমরা মাঝুমের ভাবাদর্শকে গতিবান সমাজের প্রয়োজনীয় স্ফুর বলে মনে করব।

ইতিহাসে যখন বিপ্লব হয়, তখন এই উৎপাদন ও ভাবাদর্শের সম্পর্কটা স্ফুর হয়ে উঠে। ইতিহাসে বিপ্লব হয় তখনই যখন উৎপাদনপদ্ধতি আর উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক জগতে দেখতে পাচ্ছি, যারা উৎপাদন করছে সে সর্বহারাদের সংগে মালিকের স্বার্থের নিয়ন্ত বিরোধ। এ মালিক, সর্বহারা উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক অগ্রগতিকে ঝন্দ করছে। তাই ন্তন সমাজব্যবস্থা স্ফুর জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন। তেমনি করে ইংলণ্ডে ১৬৪৮ ও ১৬৮৮ এর বিপ্লব, ফরাসী দেশের বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে জয় করে ন্তন উৎপাদনপদ্ধতির আত্মপ্রতিষ্ঠা। তেমনি সোভিয়েট দেশে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ককে জয় করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন। এই বস্তুজগতের দ্বন্দ্বের একটা বিশেষস্ফুর ভাবাদর্শের লড়াইয়ে দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক জগতে রাষ্ট্রীয় সংগঠন দিয়ে, আইনকানুনের মারপ্যাচ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ দিয়ে ন্তন শক্তির স্ফুরকে ব্যাহত করতে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ন্তন বিকাশমান শক্তির মধ্যে আবার ন্তন ভাবাদর্শের স্ফুর হয়—এবং পুরোনো ভাবাদর্শের সংগে তার সংঘর্ষ আসে। পুরোনো অর্থনৈতিক বনিয়াদের ধর্মসের পর স্বত্বাবতই পুরোনো ভাবাদর্শ আপনার শক্তি হারিয়ে ফেলে—আবার ন্তন ভাবাদর্শ বিজয়ী হয়।

তাই ইতিহাসকে যদি সংবন্ধ মাঝুমের ইতিহাস হিসাবে দেখা যায়, উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের ইতিহাস হিসাবে দেখা যায়, মাঝুম-প্রক্রিতি দ্বন্দ্বের বিশেষ অভিব্যক্তি, ভাবাদর্শের

ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস হিসাবে দেখা যায়, যার সংগে উৎপাদন পদ্ধতির অলক্ষ্য ঘোগাযোগ রয়েছে, যদি ইতিহাসের মধ্যে গুণগত পরিবর্তনকে সামাজিক জীবন ধারণের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ফলস্বরূপ দেখা যায়—তা হলে ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ইতিহাসের গতিকে অরুদ্ধাবন করে, শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অভিবাস্তিকে বুঝে আমরা ভবিষ্যৎ ইতিহাস-বিকাশের ইংগিত দিতে পারি—সচেতনভাবে আমরা ইতিহাস স্পষ্ট করতে পারি। আজকের দিনে তার পরিকার রূপ আমাদের সামনে। ক্ষবিপ্লবের পর, পূর্ব যুরোপের অনেক রাষ্ট্রে ও নয়াচৌনে নয়াগনতন্ত্রের বিজয়ের পর মাঝ্যের কাছে ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতিপথ খুবই স্পষ্ট। অঙ্ককার পথে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে তাকে আর এগুতে হচ্ছেন। সে সংগ্রামের রূপ আজকে দেখছি উপনিবেশে উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদী চক্রাস্তের স্থগিত কোশলকে বানচাল করার জন্য মেহনতী মাঝ্যের সংঘবন্ধতায়—বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সব মুখ্যেস আজকে খুলে পড়েছে—তাই উপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামের ধারা আজ নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে, যা ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রের দিকে এগুবে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মাঝ্যের স্থানকে রূপ দেওয়ার জন্য আজকে ইতিহাসের নৃতনভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এক কথায় মাঝ্য প্রাণীগতিহাসিক ধুগ থেকে ঐতিহাসিক ধুগের তোরণে এসে দাঢ়াচ্ছে—প্রয়োজনের জগৎ থেকে মুক্তির জগতে মাঝ্যের উত্তরণ থেকেই হল আসল ইতিহাসের স্বরূপ।

বাঁশীর সুর

সংগৱেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রথম বর্ষ, বিজ্ঞান

আলোচালা চাঁদনী রাত। বাঁশের বাঁশী হাতে চলেছিলেম মাঠের পথ ধরে। কাজ তখন পড়েছে ঘুমিয়ে, স্বর হয়েছে কাজভাঙ্গানোর রাজত্ব। ঘুমের মাঝে দু-একটা পাথী এক-একবার উঠছে ডেকে। চারিদিকে বিরাজ করছে অপূর্ব শান্তি, নীরব শিথুতা। জ্যোৎস্নাতরা এই পূর্ণিমা রাত্রি—এ যেন কি ষাটু রেখেছে লুকিয়ে, বারে বারে মনকে টেনে নিয়ে আসে ইটকাঠিপাথরের বক্সন থেকে সীমাহীন শ্যামলিমার মাঝে। বাঁশী দিলেম বাজিয়ে; তার স্বরের বক্ষার আকাশ-বাতাসে জাগিয়ে দিল কাঁপন, সে স্বরের রেশ গিয়ে পৌঁছল স্বর্ণ প্রকৃতির হৃদয়ের প্রতিটি কোণে। মনে হ'ল, বাঁশীর স্বরে এখনি মায়াপূরীর কোন বাজকত্ত্ব উঠিবে জেগে, স্বর হবে কৃপকথার রাজত্ব। সে বাঁশীর স্বরে সাড়া দিল পূর্ণিমারাত্রির মূরু শিথু প্রকৃতি। চাঁদ বললে, ওগো বাঁশী, তুমি যে আমারই একান্ত আপন। তোমার স্বরে আমারই অন্তরের কথাগুলি পেয়েছে প্রকাশ। বললে অনন্ত আকাশের নিবিড় নীলিমা—ওগো বাঁশী, তোমার স্বর যে সীমাহীন অনন্ত নীলিমার গান, তোমার স্বরে আমি স্পষ্ট শুনতে পাছি

আমার হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া। ছায়াঘন শামলিমা বললে, বাঁশী, তোমার সুরের মাঝে আমাকেই যে তুমি জানালে আহ্বান, আমার প্রাণ দিলে মাত্রিয়ে, ও যে আমার হৃদয়ের নিবিড়তম গান। মাটি তাকে বললে ডেকে, ওগো বন্ধু, তোমার সুরে যে বিশাল ধরিত্বার ব্যথা উঠছে বেজে, মাটি-মাঝের বুকভাঙা দীর্ঘশাস্তুরু তুমি যে নিয়ে নিয়েছ তোমার সুরের মাঝে, তোমার গান যে যথার্থ মাটির গান।

বাঁশী শুনে বললে হেসে, “ওগো বন্ধুরা ! আমার সুর যে তোমাদের সকলেরই প্রাণের আনন্দ-বেদনের সুর। আমি যে গান গাই শুধু অনন্তসুন্দরের, তাই তার সুর বাজে তোমাদের সকলের হৃদয়ে। এ গান জ্যোৎস্নার গান, নৌলিমার গান, মাটির বুকের গান, এ স্মিন্দ শামল প্রকৃতির গান—এ যে সুন্দরের আবাহন। তাইতো আমার সুরে বিশ্বপ্রেম ওঠে জেগে, তাইতো এ সুর আনন্দের সাড়া জাগায় তোমাদের সকলের প্রাণে। সবারই যে প্রাণ সুন্দরের সাথে বাঁধা আছে আনন্দের যোগসূত্রে।

ଆମାଦେର କଥା

ଛାତ୍ରପରିଷଦ :

କାଜ କରାର ଅନୁରକ୍ଷ ଉଂସାହ ଓ ଉଦ୍ଦିଗ୍ନା ନିଯେ ପରିସଦେର କାର୍ଯ୍ୟର ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲାମ । ସଂଗ୍ଠନ-ମୂଳକ କାଜେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ପରିସଦେର ଧାରାବାହିକ କର୍ମଜୀବନେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନବାର ଇହା ଛିଲ ଆମାଦେର । ଆମାଦେର ମେ ଚେଷ୍ଟା କତନ୍ତର ସଫଲ ହେଁଛିଲ ତା ବଲତେ ପାରବେଳ ଆମାଦେର କଲେଜେର ଛାତ୍ରାତ୍ମୀୟଙ୍କ କିନ୍ତୁ ନିଜେରେ ଦିକ୍ ଥେକେ ଏହିକୁ ବଲତେ ପାରି ବେ କାର୍ଯ୍ୟକେତେ ଆନ୍ତରିକତାର ଓ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ବଟେ ନି କୋନଦିନ ।

ଏବାର ଆମାଦେର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍-ମସ୍ତାହେର ଉତ୍ସୋଧନ ହେଁଛିଲ ବିରାମ-ପୀଟିକା ବିଭାଗେର ଉତ୍ସୋଗେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୀର୍ଘବିଧି ପାର୍ଟି ଦିଯେ । ଏବାରକାର ଦୀର୍ଘବିଧି ପାର୍ଟିକେ ଆଗେର କ୍ଷେତ୍ରର ବସନ୍ତରେ ତୁଳନାଯା ଅନେକ ବେଳୀ ଛାତ୍ରାତ୍ମୀୟ ମେଗଦିନ କରେଛିଲେନ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ମୁଣ୍ଡଭାବେ ମ୍ପାଦନାର ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀଅନାମିନାଥ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଆମାଦେର ଧାରାବାହିକ ପାଇ । ୧୯୪୬ ଜାନୁଆରୀ ବାଂଗାର ବିଧାନମନ୍ଦାର ଶ୍ରୀକୋର ଶ୍ରୀଶେଖରମୁଖ୍ୟାର୍ଜୀ ତାର ବିଦେଶ ଭାରତେର ଅଭିଜ୍ଞତା ଚଳନ୍ତିରେ ମାହାତ୍ୟ ଆମାଦେର କାହେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ । ଆମାଦେର ନିଜ୍ୟ କୋନ ହଲ ନା ଥାକାଯ ଆମାଦେର କଲେଜେର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିରକଳ ବାଇରେ କୋନ ହଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଁ ଅମେଷ । ଏହି ସକଳ ଅନୁବିଧା ଦୂର କରିବାର ଜନ୍ମ ଆସରା ମାତ୍ରେ ପ୍ରାଣେଲେ କରେ ପ୍ରାଣ ଅଟିଶ ଲୋକେର ବସନ୍ତର ବସନ୍ତ କରେଛିଲାମ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବୋଗେର ଫଳେ ଆମାଦେର ପରିକଳନା ଆଶାନ୍ତରପନ୍ଦାବେ ଦକଳ ହୟ ନି । ୧୯୪୬ ଜାନୁଆରୀ ଜନ୍ମଦିନ ଶ୍ରୀନାଥ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାର, ଶ୍ରୀମୁଣ୍ଡଭାବେ ଶ୍ରୀଶେଖରମୁଖ୍ୟ ପରିଷଦାର ମନ୍ଦିରର ଭାବାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀମାନବେଦନ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାର, ଶ୍ରୀମତୀ କଳାଙ୍ଗି ରାୟ, ଶ୍ରୀମହାପୁରୁଷ ମିଶ୍ର ପ୍ରୟୁକ୍ତିକ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଅଶ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ । ବିଭିନ୍ନ ଦିନେ ଜନ୍ମଦିନ ମାତ୍ର କଲେଜେର ଛାତ୍ରାତ୍ମୀୟ ଅଶ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରେବ । ଏହିଦେଇ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅମିତ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀପ୍ରତି ଚୌଧୁରୀ ଓ ଶ୍ରୀରୋତ୍ତମ ମରକାରେର ପାନ ବିଶେଷଭାବେ ମକଳକେ ଆକୃତ କରେଛି । ନାଟ୍ୟପରିସଦେର ମହ୍ୟେ ପରିଷଦାର ଏହିଦିନ ଶ୍ରୀହୁରୋଧ ବନ୍ଧୁ ଅତିଥି ନାଟକଟି ମନ୍ଦିର କରା ହେଁଛି । ଅଭିନେତାଦେର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀବିରେନ ପାନ ଚୌଧୁରୀ, ଶ୍ରୀହରିଦ୍ଵାରା ରାୟ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିଂ ଚାଟୋର୍ଜିର ଅଭିନ୍ୟନ ମକଳେ ଅଶ୍ଵମ ଅର୍ଜନ କରେ । ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର କଲେଜେର ଛାତ୍ରାତ୍ମୀୟଙ୍କ ନିଯେ ଏହିକାମ ଏକଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନାର ପାଇଁ ବୋଧହୟ କଲେଜେର ଇତିହାସେ ଏହି ପ୍ରଥମ । ଆଶା କରି ଆମାଦେର ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମବୂନ୍ଦ କଲେଜେର ଛାତ୍ରାତ୍ମୀୟଙ୍କ ଏହିକାମ ହୁବୋଗ ଦେବେନ ।

ବିରାମ-ପୀଟିକା :

ଶ୍ରୀମାର ପାର୍ଟିର ବିବରଣ ଆଗେଇ ଦିଯେଇ । ଟେବଳ ଟେନିସ ପରିଷେଷିତାର ଆଯୋଜନ କରା ଏବାର ମସ୍ତବ୍ପର ହୟ ନି ।

ନାଟ୍ୟପରିସଦ :

ନିଟ୍ୟପାଇବାର ହଲେ ଆମାଦେର ବାଂସରିକ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀରୋତ୍ତମକୁମାର ମରକାରେର ପରିଚାଳନାଯା ମୁଣ୍ଡଭାବେ ମ୍ପାଦନ ହେଁଛି । ଶ୍ରୀଶବଦିନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ରଚିତ 'ଅଧିବାନ' ଓ ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁମନ୍ଦବୁଦ୍ଧ ଭଦ୍ରେର ରଚିତ 'ମେସ୍ ନୟର ୪' ନାଟକ ମନ୍ଦିର କରାଇଲାମ ।

ରାବୀନ୍ଦ୍ରପରିସଦ :

ଶ୍ରୀଅମଲବିକାଶ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପରିଚାଳନାଯା ଏହି ବିଭାଗେ ପକ୍ଷ ଥେକେ ଏଲିଟ ସିନେମା ହଲେ ବମ୍ବ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୟ ।

সমাজসেবা-বিভাগ :

শ্রীসত্যিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অনেক দৃঢ় বাক্তিকে নিয়মিত সাহায্য দান করা হয়েছে।

বিতর্ক-বিভাগ :

সম্পাদক শ্রীশশান্ত বশুর পরিচালনায় এই বিভাগের কাজ বেশ শৃঙ্খলাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু প্রতিটাত্ত্ব-সংগ্রহের প্রাতিন ও বর্তমান ছাত্রদের মিলিত বিতর্ক সভার আয়োজন করা তার পক্ষে এবার সম্ভব হয়ে উঠেনি।

এবার পরিষদের সকল কাজে আমরা ছাত্রদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। আমাদের সকল কাজে তারা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে আমাদের সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন।

র্ধার্থ ধন্যবাদের পাত্র তাদের ব্যক্তিগতভাবে উল্লেখ করা অসম্ভব। সাধারণভাবে তাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের ব্রহ্মবৃক্ষে শেষ করছি।

শ্রীদীপকুমার দাস—সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-পরিষদ

প্রকাশনা-বিভাগ :

শামুলী-নিয়মাদিক বছরে ছুটি করে পত্রিকা বের করা আর বীরতিমত অথবা ইচ্ছামত মেয়ালী বের করা এই তো জানতুম এ দণ্ডের কাজ। সংখ্যায় এরা মাত্র ছুটি—খুবই ছেট তবে গুরুত্বে বেশ বড়। ছু-দিন পরে জানলাম এবং জ্বেনে অবাক হলাম যে মেয়ালীর দায় ও দারিদ্র্যের বেঁৰা থেকে আমাকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। সেটা চেপেচে মুঝে সম্পাদকের রোধ থাড়ে। বাকি রাইল পত্রিকা বার করার কাজ। সবাই বলল—কাঙ্টি সহজ নয়—কাগজটিকে তো প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে—তাল কাটলে বিপক্ষদের সহ করবেন কেন? র্ধার্থ কথা—নিঃসন্দেহ। কিন্তু আমারও কিছু বসবার আছে—পত্রিকার ভেতরের কোন লেখাকে বাতিল বা অবাতিল করার ভার তো আমার নয়—সে কাটাছেড়ার ভার তো সম্পাদকের। আমি তো শুঁ অখারেন টেবিলের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি—আর খুব বেশী হলে কথামত ছুরিটা কাটিব। এগিয়ে দিতে পারি।

তবে এবার কিছু নতুনত এসেছে—কাগজের আর প্রচ্ছন্দপটের শুল্ক পরিস্থগত। সবার কি রকম লাগবে জানিনা—আমাদের ভাল লেগেছে। ছুটির আগে কাগজ বেরলে ভাল হয় সত্যিকথা—কিন্তু এখার বেরলে সেটা হ'ত শূল-সংখ্যা—কারণ কালির আঁচড় থাকত না দেখানে। সামা কথায় বলতে গেলে আমরা ছুটির আগে ছাপবার যোগ্য কোন সেখ কারও কাছ থেকে পাই নি।

সবশেষে প্রচ্ছন্দপট এঁকে দেবার জন্য ইতিহাস সেমিনারের সম্পাদক শ্রীদীপকুমার যোথেকে এবং পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য এই বিভাগের বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ক্রিস্টোফেল ও শ্রীমন্তুকুমার ইন্দ্র, শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক মহান্ধনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রীজ্ঞাতির্থ পালচোধুরী—সম্পাদক, প্রকাশনা-বিভাগ

বিতর্ক-পরিষদ :

বিতর্কের রিপোর্ট লিখতে বসে এবারে কয়েকটি অভাববীয়ের উল্লেখ করতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। অথবতঃ, বাইরের বিভিন্ন আন্তর্বকলেজ প্রতিদোগিতার ধতোগুলিরই নিম্নলিখিত আমরা গ্রহণ করেছিলাম দেই

সবগুলিতেই আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধিরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এর মধ্যে শ্রীপদ্মীপ দাসই তো আধ ডজন বার পুরস্কার পেয়েছেন। বিশ্বায়ঃ, এই সব বাইরের প্রতিযোগিতার সাফল্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম বর্ষের ছাত্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিতর্কের ইতিহাসে নতুনত্বের স্থচনা করেছেন। তৃতীয়তঃ, বাহিনিবাদে এবারে অস্ততঃ একটি বিতর্কে ছাত্রীরা ঘোগ্যান করেছেন।

অবগু ক্রান্তি ও রংয়ে গেছে আমাদের কাজে। যথা, সেসবের প্রথমাবের এবারে কলেজে মাঝ ক্রান্তি প্রতিযোগিতা-মূলক ও দ্রুটি প্রদর্শনী বিতর্কের অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিল। এই সংখ্যালংকা নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত। সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত কলেজ বিতর্কটির বিষয় ছিলো, “An Economic Blockade against Pakistan is the only effective way to save the minorities there.” বিষয়টি খুবই topical হওয়ায় ছাত্রমহলে বিশেষ আগ্রহের কারণ হয়েছিলো। বাইরের থেকে এই বিতর্কে যোগ দেন শ্রীবুক্তব্যের ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত। সভাশেষে বিপুল ভোটাদিক্যে অস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় University Institute, ও বহুমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজের উদ্যোগে আস্তাকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটির বাংলা বিভাগে প্রতিযোগী হিসেবে আমরা পাঠাই প্রথম বর্ষের শ্রীঅর্জুন সেনগুপ্ত ও শ্রীঅরণ্যত দশগুপ্তকে। যে আশা নিয়ে আমরা এই অব্যবহারসিক কাজ করলাম আমাদের মে আশা বৰ্য হয় নি। শ্রীঅর্জুন সেনগুপ্ত এখানে প্রথম হলেন ও দ্রুজমের মিলিত চেষ্টায় দল হিসেবে আমাদের কলেজ বিশ্বায় স্থান লাভ করলো। কৃষ্ণনাথ কলেজের প্রতিযোগিতাটিতে আমাদের কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেন চতুর্থ বর্ষের শ্রীঅমর্জ্য সেন ও শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত। এখানের ফলাফলও অনুরূপ। শ্রীঅমর্জ্য সেন ব্যক্তিগত চ্যালিপ্যানশিপ লাভ করেন এবং আমাদের কলেজ বিশ্বায় স্থান পায়।

“প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহ” উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্রদর্শনী বিতর্কের বিষয় ছিলো “The liberation of India lies in the Chinese way.” প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত ও অধ্যাপক তাজ্জান দত্ত এবং বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে শ্রীমুখোশ দশগুপ্ত, শ্রীপার্থসারথি গুপ্ত, শ্রীমুখময় চক্রবর্তী, শ্রীপদ্মীপ দাস ও শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় অংশ এবং করেন।

এরপর পর ছুটি আস্তাকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় তৃতীয় বর্ষের শ্রীপদ্মীপ দাস প্রথম স্থান অধিকার করেন। এছাটির উদ্যোগে ছিলেন যথাক্রমে India Tomorrow Club এবং B.E. College Students' Institute, বিশ্বায় বিতর্কটিতে দলগত চ্যালিপ্যানশিপ ও আমাদের প্রতিযোগীর জিতে আনেন। শ্রীসুত দাসের সহযোগী হিসেবে এখানে ছিলেন প্রথম বর্ষের শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়।

মার্চমাসে আমরা একটি বাংলা বিতর্কের আয়োজন করি। বিষয় ছিলো, “বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গিতে বৰীন্মসাহিত্য অন্যাধুনিক।” ছুটম ছাত্রী—শ্রীভারতী সেনগুপ্ত ও শ্রীমীনাক্ষী বসু এই বিতর্কে যোগ দেন। সভাপতির অভিভাষণে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য উপাগ্রহে প্রস্তাবের এবং বিতর্কের মানের সমালোচনা করেন।

এই মাসেই অনুষ্ঠিত তিনিটি বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় আমাদের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। প্রথমটি পুরুষ India Tomorrow Club-এর উদ্যোগে। উভয় পক্ষের শ্রেষ্ঠ বক্তাৰা এখানে পুরস্কৃত হন। আমাদের প্রতিযোগী শ্রীপদ্মীপ দাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসাবে পুরস্কার পান। ল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিশ্বায় আস্তাকলেজ বিতর্কটিতে শ্রীপদ্মীপ দাস আবার প্রথম হলেন। দলগত চ্যালিপ্যানশিপের জন্য দ্বাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রদের সংগে আমাদের দলের “lie” হয়। আমাদের দলের বিশ্বায়জন ছিলেন শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। তৃতীয় বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় ফল ও সন্তোষজনক হয়েছিলো। এতে যোগ দেন শ্রীমুচিত্র চক্রবর্তী ও শ্রীপদ্মীপ দাস। উভয়দের শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসেবে এৰা দ্রুজনেই পুরস্কৃত হন।

গ্রীষ্মাবকাশের টিক আগে একটি প্রদর্শনী বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এটি বর্জন করতে হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের পরে জুলাই মাসে “For the purposes of human progress what is needed is not a denial of religion but its renovation.” এই দিক্ষান্তের ওপর প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। মহার্হিংত শ্রীগার্থসারথি গুপ্ত ও শ্রীঅমর্ত্য সেন এতে যোগ দেন। পরের মাসে এক বিপুল জনসমাগমের মধ্যে “Individual liberty does not and cannot exist in any form of society today,” এই বিষয়ে বিতর্ক সম্ভাৰ হয়। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শেষ পর্যন্ত দাঢ়িয়ে থেকেও আগ্রহভৱে এই প্রদর্শনী বিতর্কটি শেষেন। প্রথ্যাত বক্তাদের মধ্যে এই বিতর্কে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অঞ্জন দত্ত, শ্রীমধ্বংশু দাসগুপ্ত ও শ্রীবিজু মুখোপাধ্যায়।

পরের সপ্তাহেই আম্যান আমেরিকান ছাত্রদের একটি দলকে আমরা এক সিমপোনিয়ামে আমন্ত্রণ করি। আমাদের কলেজ দল গঠিত হয় শ্রীঅমর্ত্য সেন, শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত ও শ্রীগার্থসারথি গুপ্তকে নিয়ে। আমেরিকানদের মধ্যে Mr. Jack Mackeene ও Miss Vivien Robinson-এর বক্তৃতা ধারালো হয়েছিলো। আলোচনা প্রদলে উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধিতার চূনায় অধ্যাপক অমিয় মজুমদারের চেষ্টাতে মিটমাট ঘটে। এরপরে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা একটি বিতর্কের অনুষ্ঠান করেন।

সেপ্টেম্বর মাসে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বাণিজ্য-বিভাগের ছাত্ররা একটি আন্তঃকলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতা আয়োজন করেন। চতুর্বর্ষের শ্রীপদ্মীপ দাস ও শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত এখানে আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন। শ্রীজ্যোতির্ময় দাস যষ্টব্যার প্রথম পুরস্কার পেলেন আর টিম চ্যাম্পিয়নশিপ শিল্প আমাদের হাতে এলো।

বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে একারের কাৰ্যক্রম শেষ করা হলো। বাংলা ও ইংরেজী উভয়ের প্রতিযোগিতাই একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। বাংলা বিতর্কের বিষয় ছিলো, “ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ একটি ক্ষয়িকু শ্রেণী।” তৃতীয় বর্ষ এতে জয়ী হন। যতিথত ভাবে কৃতিত্ব দেখান তৃতীয় বর্ষের শ্রীশিল্পকুমাৰ দাস (প্রথম), দ্বিতীয় বর্ষের শ্রীদীপেন্দ্ৰনাথ মজুমদার্য (দ্বিতীয়) ও প্রথম বর্ষের শ্রীমলয়েন্দ্ৰকিশোৰ চৌধুৰী (তৃতীয়) ইংরেজি বিতর্কের অন্তৰ্ব ছিলো, “The neutrality of India in the present-day world politics is an absurdity.” এতে জয়লাভ পেয়ে চতুর্থ বর্ষ। প্রথম হন শ্রীপদ্মীপ দাস (চতুর্থ বর্ষ), দ্বিতীয় শ্রীজ্যোতির্ময় দত্ত (চতুর্থ বর্ষ) ও তৃতীয় সংযুক্তভাবে শ্রীঅজিত রায় (চতুর্থ বর্ষ) ও শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় (দ্বিতীয় বর্ষ)।

অভ্যন্তর অভিযোগের কথা তোলা বোধহয় নির্ধক। পূর্ববর্তী সম্পাদকের বিতর্কবিভাগে অধিকতর ব্যয় পদ্ধতের দাবী করেছিলেন। এবার অবগু নির্দিষ্ট পরিমাণকেও হাস করে দেওয়া হয়েছিলো। তবে উত্তরসূর্যের প্রাণ আশা আছে। উদার নীতির স্থূলে তাঁরা মিলিত হয়েছেন। সুতরাং ইউনিয়নের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে পদু করে দেবার মনোভাব তাদের থাকবে না বোধহয়। আমরা তো কেবল অর্থভাবের জন্যই আগ্রহ-কলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে পারিনি। তা সঙ্গেও শেষের দিকে কয়েকটি ঘাটতি পূরণের জন্য যথেক্ষ মহাশয়ের দ্বারা হতে হব। প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে তিনি আমাদের খুবই উপকার করেছেন।

পরিশেষে, যে সব অধ্যাপক এবং ছাত্ররা সর্বদা বিতর্কের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাদের ধন্তব্য শনাই। শ্রীজ্যোতির্ময় দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ, আমার অনেক কাজই তিনি করে দিয়েছেন। প্রথম অধ্যাপক শ্রীঅমিয় মজুমদার, প্রান্তনছাত্র শ্রীদীপক রায় ও চতুর্থ বর্ষের শ্রীঅজিত রায়ও আমাকে নানাভাবে মার্যাদা করেছেন।

স্বাস্থ্য বন্ধু—সম্পাদক

নাট্যপরিষদ :

নিচেক গভানুগতিকভাবে বর্জন ক'রবার জন্মে এবার আমরা প্রয়াস পেয়েছি। এর একটা পরিচয় এই যে প্রতিষ্ঠানিবস উপলক্ষে বোধহয় এই প্রথম নাট্যপরিষদের তরফ থেকে একটি নাটক মঞ্চ করার ব্যবস্থা হোল। হুবোধ বহু রচিত কোর্তুক নাটক কে অভিধি'তে অনেকেই প্রতিভাব পরিচয় দেন।

বহুপ্রভাবিত বার্ষিক নাট্যনৃষ্টি নাম্পায়িত হ'য়েছিল ১৮ই আগস্ট বিউএস্পারার প্রেক্ষাগৃহে। বিষয়বস্তু—শরদিন্তু বন্দ্যোগ্ধ্যারের 'অগ্নিবাণ' এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'উনপঞ্চাশ নম্বর মেস'। দ্বিতীয় নাটকটিতে আমরা অভুতপূর্ব সাফল্যলাভ ক'রেছিলাম বললে বোধহয় অভিভিত্ত হ'বে না। তবে দর্শকদের হাস্তোছাসের ফলে নাটকের গতি ব্যাহত হচ্ছিল। সেটার কারণ নাটকের প্রাণবস্তুর আবেদন। তাই এতে তাঁদের দোষ রিহন। 'অগ্নিবাণ' নাটকটিতেও বিভিন্ন টাইপ চরিত্র রূপায়ণে প্রত্যেকেই কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

বাহিরের শিরীকে কলেজের আসরে আসম দেওয়ার বীতি আমরা পরিভ্রান্ত করেছিলাম। তাই আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল ছাত্রদের মধ্যে। যত্নসংগীত রচনায় প্রেসিডেন্সি কলেজ অর্কেষ্ট্রা কৃতিত্বের দাবী করে। এটি আমাদের উৎসাহে গ'ড়ে উঠেছিল—আশা। করি পরবর্তী ঘূর্ণিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় এর উত্তরোত্তর শৈর্যদ্বি হ'বে।

এবারে ধন্যবাদের পালা। নাটক পরিচালনার কৃতিত্ব একক নয়—সেটা সামগ্রিক। তাই যেসব ছাত্রবক্তু আমাকে সাহায্য ক'রেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যক্তিগতভাবে সকলের নামোন্নেব সন্তোষ্যতার বাইরে। তাই তা' থেকে বিরত রাখিলাম।

সবশেষে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীগভীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীমনোমোহন ঘোষকে—যাঁদের সহায় উপদেশেই ছিল আমাদের যাত্রাপথের শ্রেষ্ঠ পাঠেয়।

গোত্তমকুমার সরকার—সম্পাদক, নাট্যপরিষদ

গাল্স কমন্স :
পাল্স কমন্স :

পত্রিকায় ছাপাবার মত মন্ত কোনও কাজ আমরা এবার করিনি। এ বছরে আমাদের কাজ ছিল অধ্যানতঃ দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগগুলোর প্রতিবিধানের চেষ্টা করা। জলের অভাব মিটেছে—ছাত্রীদের কমনক্ষম ম্যাগাজিন আসে। অবগ্নি কমনক্ষমের আয়তন সম্বন্ধে আমাদের যে অভিযোগ দেটা দূর হয়নি—অদুর ভবিষ্যতে হবে এমন আশাও নেই। তবে ছাত্রীদের তরফ থেকে একেবু দাবী নিশ্চয় করতে পারি যে এছেরের ছাত্রীরা কলেজের সব কাজেই অংশগ্রহণ করেছেন। ইউনিয়নের নির্বাচনে গত বছর পূর্বৰী বহু নির্বাচিত হয়েছেন, গোরী দাসগুপ্ত অভ্যন্ত যোগ্যতার সংগে দর্শন দেখিনারের সেক্রেটারীর কর্তব্য করেছেন, মলি ঘোষ খেলাধূলার বিভাগে ছাত্রী প্রতিনিধি হিসেবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বিশেষতঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভ্যার্থনা সভায় ছাত্রীদের সহযোগিতা লক্ষণীয় ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ছাত্রীদের কমনক্ষমের তরফ থেকে শুধুমাত্র ছাত্রীদের একটি বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক অমিয় মজুমদার। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ভারতী সেনগুপ্তা, সম্পাদিক।

গণিত সেমিনার :

হাঁৎ-না-বলে-চলে-যাওয়া সম্পাদক অমিয় মাইতি সারা বছর কি করেছেন জানিনা—তবে বিছুদিনের জন্ম সেমিনারের কাজ পেয়ে আমরা দুটি কাজ করেছি—ছাত্র-ছাত্রীদের বই দিয়েছি সেমিনার লাইব্রেরী থেকে—আব বিদ্যায় দিয়েছি আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ডক্টর সনৎকুমার বশুকে। তাঁর চলে যাওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীরা হারিয়েছে

আমাদের কথা

একজন মনীষীর সাম্রিধ্য—শৈযুক্ত বহুর সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক আমাদের গড়ে উঠেছিল তা যে এত শাশ্বত ভেটে বাবে আগে ভাবতেও পারিনি।

ছুটীর কিছুদিন আগে ডক্টর বশুকে বিদায় অভিনন্দন দেবার আয়োজন করা হয়। ডক্টর বশু নিখারিণ্ড সময়ের সম্মোহন না এসে পোছুলে বাস্তু হয়ে কয়েকজন ছাত্র অভিনন্দন-পত্র নিয়ে ডক্টর বশুর বাড়ী যান। ডক্টর বশু সেখানে যাঁ বলেন তা' সত্যই মর্মপূর্ণ। তিনি বলেন, "আজকের দিনে তোমাদের প্রেছের দান আমি কোনও বক্তব্যই ভুলতে পারবনা। তোমরা যে আমাকে এত ভালবাস্তে তা কোনওদিন কমনাও করতে পারিনি।" ডক্টর বশু প্রতিশ্রূতি দিয়েছেন ছুটীর পর আবার একদিন এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।

হ্রন্তীল পাল, বণ্ডিঙ গোপ

ইতিহাস সেমিনার :

আমাদের সেমিনারের কাজ বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে। সেমিনারের এবছরের কাজের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল Seminar Constitution-এর আমূল পরিবর্তন। এই নতুন ব্যবস্থাকে Under-graduate এবং Post-graduate সেমিনার ছুটি এক সংযুক্ত সংস্থায় পরিগত হয়। এই সঙ্গেই আমরা উদ্বোধন করেছি আমাদের একটি প্রাচীরপত্রের। শ্রীবৰুণ দে ও শ্রীমুকু রায়ের সম্পাদনার প্রাচীরপত্রের কাজ ভাস্তই চলেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববঙ্গলিকে অবলম্বন করে আমরা একটি প্রবন্ধমালার আয়োজন করেছিলাম। এর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবন্ধ পড়েন, শ্রীঅঞ্জনকুমার ভাদ্রাড়ী (চতুর্থ বর্ষ), শ্রীঅনিল দাশগুপ্ত (ষষ্ঠ বর্ষ), শ্রীপার্থসনারাধি গুপ্ত (পঞ্চম বর্ষ) ও শ্রীদীপ্তেজ্জনোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ষষ্ঠ বর্ষ)। এছাড়াও আমাদের আমদ্দেশে শ্রীদেবেশ দাস এক বিশেষ অধিবেশনে Romance of Rajasthan শীর্ষক একটি ফুললিপি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতীয় ইতিহাসের গৰ্যাচলমন সম্পর্কে আর একটি অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীবৰুণ দে (পঞ্চম বর্ষ)। সেমিনার লাইব্রেরীর নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তোলার জন্য আমরা একটি Seminar fund-এর স্থাপনা করে কাজ আরম্ভ করেছি।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে চারবার আমরা সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছিলাম। জানুয়ারী মাসে বিদ্যায়ী চতুর্থ বর্ষকে এবং অক্টোবর মাসে বিদ্যারী ষষ্ঠ বর্ষকে আমরা সমর্পন জানিয়েছি। জনপ্রিয় অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্তের শিখ যাদ্রায় ইতিহাস সেমিনার তার এক দরবী বকুকে হারিয়েছে। তাঁকে বিদ্যায় অভিনন্দন জানাতে আমরা এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। এছাড়াও আমাদের প্রাক্তন ছাত্র মিলনী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পঞ্চ জন প্রাক্তন ছাত্র এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য অনেকের কাছেই ঝণী। এই সঙ্গে বিশেষভাবে ষষ্ঠ বর্ষের শ্রীগৃহ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমুকু প্রদন মলিক (ষষ্ঠ বর্ষ)

শ্রীদীপ্তেজ্জনোহন দোষ (চতুর্থ বর্ষ)

অর্থনৈতি দপ্তর :

পরিষদের কর্মপরিচালনার ভার আমার হাতে আসার পর আমাদের সেমিনারে উল্লেখযোগ্য মাত্র তিনটি মাছ হয়েছে: ছুটি রচনা পাঠ ও ডক্টর ভবতোষ দত্তকে তাঁর বিদ্যায় উপলক্ষে অভিনন্দন জাপন। রচনা ছুটির দ্বিতীয় ছিল 'India's Five Year Plan—Its promises and how far they will be realised' এবং 'Dynamic fluctuation in an underdeveloped economy.' প্রথমটি পাঠ করেন শ্রীঅধীপকুমার শ্রবণ এবং বিতীয়টি শ্রীমিহিরকুমার রক্ষিত। ছুটি বৈঠকই খুব উপভোগ্য হয়েছিল।

এক গাণ্ডীর্যপূর্ণ সভায় ডক্টর ভবতোষ দত্তকে আমরা সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। সভার শেষে উপস্থিতি মাইকে জন্মাগো আপ্যায়িত করা হয়।

কলেজ লাইব্রেরী থেকে অনেক বই এবার আমাদের সেমিনারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এজন্তে অধ্যাপক যোগায়লকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

সেমিনার কুম সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ বহুদিনের। ঘরটা অক্ষকার, সাঁতদেতে। শুনেছি সেমিনারটিকে কলেজ গৃহের অন্ত কোন অংশে স্থানান্তর করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অমুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু এ পর্যাপ্ত কোন ফলই পাওয়া যায়নি।

হৃগাদাম রায়,—সম্পাদক অর্থনীতি সেমিনার

রাজনীতি সেমিনার :

সেমিনারের উপকারিতা দ্বিবিধ, প্রথমতঃ বই আদান-প্রদান ও দ্বিতীয়তঃ আলোচনার স্থোগদান। দ্বিক দিয়েই বোধহয় আমরা পুরো স্থোগটা নিতে পেরেছি।

তৃতীয় বৰ্ষ পাঠক্ষেত্রে কাছ থেকে কয়েকখানি অতি প্রয়োজনীয় বই পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরীর থেকেও অনেক নতুন বই আনা হ'য়েছে।

তৃতীয় বৰ্ষ পাঠক্ষেত্রে কাছ থেকে কয়েকখানি অতি প্রয়োজনীয় বই পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া লাইব্রেরীর থেকেও অনেক নতুন বই আনা হ'য়েছে।

তৃতীয় সভাটিতে New York School of Social Research-র অধ্যক্ষ Dr. Saul K. Padover History of Political democracy in the U. S. A-র ওপরে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। প্রশ্নেভরের ব্যবস্থা থাকায় সভাটি বিশেষ মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠেছিল।

আমাদের পুর্জোর বক্সের আগে আর একটি কাজ ছিল—অর্থনীতি দপ্তরের অধ্যাপক শিক্ষকতোষ দত্তকে বিদ্যায় সন্তান্য জানানো।

বন্ধব্য শেষ করার আগে ধন্যবাদ জানাই সভাপতি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয়কে তাঁর মূল্যবান উপদেশের জন্যে। দপ্তরের অগ্রান্ত অধ্যাপকদেরও আমাদের নানাভাবে সাহায্য করার জন্যে জানাই অরুণ ধন্যবাদ—বিশেষ ক'রে অধ্যাপক তাপস মজুমদারকে বাঁর পরিশ্রমে অধ্যাপক দত্তের বিদ্যায়ী সভা হ'য়েছিল আনন্দ আর বেদনায় মুর্তি।

সুচিত্রকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক

দর্শন-পরিষদ :

বছরের শেষে দর্শন-পরিষদ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমাদের চারিটি অধিবেশনের মধ্যে প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল দর্শন ও বিজ্ঞান। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীপুরুষন মৈত্রে “যুক্তি ও ধর্ম” সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রবাসজীবন চোধুরী। তৃতীয় অধিবেশনে ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রবন্ধ পতেন শ্রীমতী মণিকা চট্টোপাধ্যায়। সভাপতির আসনে ছিলেন শ্রীপ্রবাসজীবন চোধুরী। চতুর্থ অধিবেশনে ‘জড়বাদের সমর্থন’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন শ্রীঅশোক গান্ধুলী। এদিনও সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রবাসজীবন চোধুরী।

অগ্রান্ত কাজের মধ্যে আমরা একটি বিদ্যায় সভার অনুষ্ঠান করে আমাদের পূর্বগামীদের শুভকামনা জানিয়েছি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনিবিলচন্দ্র সেন অবসর গ্রহণ করেছেন। নানাভাবে তিনি আমাদের সাহায্য করে এসেছেন। তাঁর সহনযত্ন। আনন্দ অন্তরিক্ত। তুলবার নয়। তাঁর বিদ্যায় সভায় বিলিত হয়েছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ, দর্শনবিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীর। শ্রীপ্রবাসজীবন চোধুরী তাঁর পরিবর্তে এসেছেন। তাঁকে আমরা গোরী দাসগুপ্তা, সম্পাদিকা

PRESIDENCY COLLEGE FOOT-BALL TEAM—1952

RUNNERS-UP

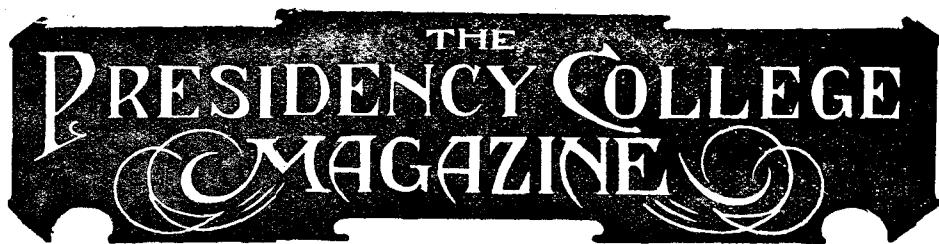
HARDINGE BIRTHDAY CHALLENGE SHIELD



LEFT TO RIGHT: (Sitting on the Ground)—M. Das Gupta, S. Bose, A. Sircar.

(Sitting on Chair)—P. Guhathakurta, S. Chatterjee, Sri N. N. Chatterjee, Principal J. C. Sengupta Prof. J. Choudhury, K. Dutta Gupta (Captain), N. Dutta (Secretary).

(Standing)—Boston (Bearer), N. Ghosh, N. Ganguly, D. Das Gupta, B. Barman, A. Chakravarty S. Chakravarty, S. Sanātānī, B. Niyogi, Chandra (Bearer).



THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

EDITORIAL

Notes and Comments

To get an issue of the college journal together is a task which though not to be described as a job of Hercules, is, nevertheless, one of considerable difficulties. People do not seem to agree as to what should be the aim of a journal like this. There are, for instance, those amongst us who hold that it is the duty of the journal to focus our attention on what our students are doing outside the class room. The ideal issue, it seems, would be an impressive collection of the reports of our different committees punctuated by about half a dozen photographs of the same. This ideal is strongly criticised by another school of opinion, which dislikes committee reports, hates group photographs, and would like to get from their journal a series of edifying articles set off to perfection with a nice sketch or two. There are people who want us to bring out an extremely progressive issue attacking all conceivable things under the sun. There are those who would read only short stories and nothing else and there are those who would like the editorial to be written in verse. All these make up that dynamic entity which we know as the Presidency College.

Subject to the ultimately determining influence of the economic factor, your journal strives, as best as it can, to act the mirror to all these different shades of opinion. Here is with you, what we trust to be, a representative cross section of the things that Presidency College does or feels. But this is no more than a cross section. The numerous bits that remain unpublished demand we make a few general comments about them. It is an obligation we owe them and it is a duty towards you that we have assumed. We are convinced that it is only by telling you what we feel about the things we got and the things we ought to have got but did not, that we can make a better job of our second issue, which—now that the first is already in print—is our main preoccupation.

A journal, if it is not to be cordially disliked by all, has to present a well balanced page of contents. But our contributors, it appeared, had made up their minds not to stand any nonsense in the shape of an editorial policy. We tried to procure a presentable one-act play. We failed. We expected some of our people to come forward with some neatly turned out opinions about the latest additions in the field of books. No one did. We felt at least a short discussion on some international topic was badly needed. Our contributors ignored our feelings. The element of variety could not be smuggled in.

People who wrote displayed a remarkable penchant for short stories and what appeared to be suspiciously like prose lyrics. The run on short stories was very unfortunate. We have to lay aside regretfully some very cute attempts in this domain. We really wish these people—very accomplished writers most of them—had tried their hands at something else. The same is true of that undoubtedly difficult subject of prose lyrics. Our contributors came out as very good writers of prose but their lyrical ambition somewhat let them down. Our scientists from whom we expected discussions on scientific subjects in a popular vein, sent in very little. And most of this little appeared to be forbiddingly technical.

Our friends, on the whole, have been exceptionally co-operative. And we hope we have done nothing to lose this co-operation. A somewhat more judicious selection of the subject matter will, we feel, make a world of difference and we shall be spared the agonizing spectacle of able contributors unnecessarily jostling with each other in an overcrowded field. And, incidentally, you will get a much better journal.

There is a very obvious topic, neglected by our contributors, which, we believe, can easily yield very satisfactory results, if handled brightly and judiciously. That is our college. Presidency College, these days, is displaying what one of our contributors would term, a very remarkable tendency towards 'association'. At the same time, we fancy, an acute conflict is going on amongst us between different sets of attitude. We should like to make our meaning clear. That our students are very much active outside their class rooms should be obvious. All our secretaries seem to be enthusiastic about it. We should like, however, to draw your attention particularly to a couple of things with which this journal feels connected. The activity of our study groups is a very pleasing feature in our academic life. The Third Year Study Circle is a very important body. In their third year people can take their time and study things which within a year from now it would be quite impossible for them to do. The reason is obvious but as it is not considered good form to discuss unpleasant things, we do not mention it. We on our part, however, expect great things from this study group and we are looking forward to the journal that they tell us they are going to bring out. We also

expect to hear about a First Year study circle very soon. Some of our talented friends have got together a group which they call the Poetry Association. We sincerely hope they are going to think up some very fine poetry and give it to us next time we go to press.¹

Apart from these study groups another interesting feature of our academic life is the running of a few hand-written sheets. The College wall newspaper, *Dewali*, is already an established institution. Only very recently our scientists have begun taking a hand in its shaping. This is certainly encouraging but they must always bear in mind that whatever they have to say, has to be said in a popular vein. Otherwise the purpose of that sheet will be defeated. The enterprising folks of our First Year classes have their *Prathama*, which maintains a surprisingly high standard and almost invariably manages to come out in an impeccable get up. The History Seminar Wall Newspaper has nothing to boast of in its turn-out. But it maintains a fair standard and it is the only sheet which has some of our professors and ex-students as regular contributors. Incidentally, it is interesting to note, that all the seminars of the post graduate department of our University have their own organs. The History Seminar has made a beginning which we think can well be followed up by the others. All these sheets serve the same purpose as does this journal. They enable us, moreover, to maintain a profitable lookout for possible contributors. And with the coming out of this issue, they are, we are sure, going to give us a crop of critical notices which cannot possibly be flattering but which will, nevertheless, be an invaluable aid to us.

This much about the very praiseworthy things that our friends are doing. These are all facts and no fancy. But the thing we are going to suggest next is, undoubtedly, a conclusion on our part, and if the reader himself has not felt it, it can, assuredly, be dismissed without a second thought. The general attitude of the Presidency College, we suggest, is getting more and more positive and what is singularly unfortunate, more and more narrow. All this is bound up, ironically enough, with our various progressive opinions. People are not only progressive—which is a very excellent thing—but are impatient of anything which is not. This last is not only unfortunate but dangerous. This is evident in what we are writing in the columns of the *Dewali* and the *Prathama*. This is evident in what we are saying in our seminar discussions. This is evident in the very way we speak in our debates. Our generalizations are sweeping, our assertions are categorical and conclusions, necessarily, catastrophic. A well-balanced attitude is fighting a rearguard action all along the line. But it has not lost out yet and there is still time to rally. We shall give what we consider to be a

¹ Please give us a chance to do something which may please you. When you form a study group try and tell us about it so that your journal can take up an important aspect of the academic life not covered by your secretaries' reports—R.D.

typical example. Some time back a batch of American students visited us. We met them at a symposium, the subject for discussion being Academic Freedom in Universities. Our debaters straightaway threw all caution to the four winds and plunged in denouncing American Imperialism. The standard of debate in this college is as good as ever. And when that exceptionally skilful debater, Sj. Amartya Sen, launched his scornful shafts at the American attitude towards world problems to-day, the lecture theatre shook to the sound of stormy applause. Our visitors appeared a bit taken aback. So along came the tactful rejoinder from the chair that all this does not mean that we bear any ill-feeling towards the Americans. One expected a stony silence to greet such tact. But one was really relieved to hear Presidency College obliging with another burst of spontaneous applause. That is why we say that a sane attitude is still behind its guns. If we can persuade our progressives that a thing that exists is not necessarily bad, that a generalization must have its loopholes, and that the best way to arrive at truth is to listen to what the other fellow is saying, we can still win out. Presidency College may be aggressively progressive, but Presidency College has as yet, never been bigoted.

It is very difficult to say why none of our contributors tried to tackle the topic of Education. A journal of this type, however, cannot allow itself to be presented without something being said about this subject somewhere in its pages. The topic is not easy to deal with and the pen that now is constrained to make the gallant but presumptuous attempt is far from being competent.

It is, nevertheless, possible to present a few facts which would outline some of the features of what the journalists love to describe as the Crisis in Education. That something has gone wrong is obvious but the thing that has gone wrong here with us is not the thing that worries people over there in the U.S.A., Britain or Russia. But both of them are connected. We shall try to show how.

In Britain and the U.S.A. it is held that people have different mental capacities and it is not possible to give *all* of them any very high standard of education. To determine the capacity of a student they rely almost exclusively on I.Q. tests. The concrete results so far have been that in Britain, where they accepted the principle of universal education back in 1870, the act of 1944 has acknowledged *in principle* secondary education for all with a leaving age of sixteen, and in U.S.A. they insist upon equal opportunity for all with a general uniformity up to the age of eleven. In both the countries there is a wide variation in the standard reached and in U.S.A. in particular it varies from state to state.

In Russia, they believe that it is possible to educate *everybody* and up to a *very fair standard*. It is only after this stage has been reached that the question of aptitude comes in. This attitude of theirs is based upon a

denial of the efficacy of the I.Q. testing system. They claim that data gathered on observation contradict the results given by intelligence testing and that children from unfavourable environments are adversely affected by the system. They have made seven years' schooling compulsory for all children after which the institute called Tekhnikum gives four years of vocational training. There are also special centres where higher studies in the humanities can be undertaken. By 1960 they hope to extend the compulsory schooling period to ten years. Prof. Giles is of opinion that this ten years' schooling would enable all the Russian children to reach the old matriculation standard of the London University.²

This feat of the Russian government, which can, perhaps, be described as commendable, has set the people in Western Europe, thinking. And as it happens so often, these days, when people indulge in thinking, they think politics. In the U.S.A. they are persuaded that if Russia can educate her people and if the free world cannot, then Communism will spread. Thus for an example if the Jamaicans find that after three hundred years' of British rule 80 per cent of their people are illiterate while in Russia within thirty years of their revolution they have achieved cent per cent literacy, then they may very likely commit the blunder of equating communism with education and democracy with illiteracy.³

This acute reasoning on their part has made the United States do a thing which, peculiarly enough, is not at all a bad one. They have poured out money to get the UNESCO going and the UNESCO is one of those bodies which enable us to think that all sanity is not lost yet. They are working right in our midst and they are doing good work. This brings us to our own problems and worries. The experts of the UNESCO have already undertaken studies of the educational system in Thailand, the Philippines and Afghanistan. The reports they have submitted are instructive. In Thailand, we are told, the government passed a law of compulsory education back in 1921. Between 1921 and March 1951 the Thai cabinet changed fifteen times. The Thai people got fifteen different educational policy statements. The sum spent on education rose by one per cent. And there it stopped. These are facts which some people have found amusing and others, grim. They are undoubtedly peculiar but very typical. The report about the Philippines is severely critical and that about Afghanistan is not exactly complimentary. The experts came to the conclusion that to do anything good these people have to change their social set-up a bit, regulate their finance, eliminate corruption and show some efficiency.

² Prof. Giles in the spring issue of the Anglo-Soviet Journal, 1952.

³ They may not be as clever as Prof. Dobinson, who points out that Russia could do it only through the coercive power that it exercises [British Journal of Educational Studies, May, 1953]. The force of the argument is tellingly driven home when we consider that nothing would scandalize the British Government more than any idea of using coercion in one of its colonies.

We should not of course dream of applying these observations our own country. We had our own University Commission. Scholars differ as to what has happened to the Radhakrishnan Report. Its ultimate fate is a matter of metaphysical speculation. Our government is going ahead with its scheme of spreading the light. In our Adult Education programme we are bringing our people up to the fairly high standard of class four. The new scheme of the West Bengal Government contemplates the employment of graduate teachers at eighty-five rupees a month. As a matter of academic interest we could mention that the Brooke Bond Tea Company employs labourers at not less than Rs. 120/- per month. But of course our government is not in a position to spend so much money. An irresponsible section of the students is talking about a twenty per cent budgetary allocation for education. But our authorities are persuaded that the only thing to do to these youngmen is to reorient their moral outlook, preferably through religious instructions. And there the matter rests.*

* This note was written before the students, 'apparently under the influence of external agencies', dared defy our authorities, who religiously put them down at Lucknow and elsewhere.

The Book of Psalms—An Appreciation

SANTA DAS—*Sixth Year Arts*

The Book of Psalms is an impassioned cry from the very depths of the heart of the psalmists. Through it is expressed all the faith, all the weakness and all the poetry of their souls.

Here as elsewhere in the Bible there is no philosophy, no logical argument to prove the existence of God. Faith, complete faith wipes out even the shadow of a doubt and there is nothing so simple as the calm dependence in the line “The Lord is my shepherd, I shall not want.”

In their day of weakness they pray for strength, in their hour of need they pray for comfort. In psalm after psalm this cry for help, for protection, for strength swells and swells till their souls are revealed in all their weakness, in all their nakedness. They do not utter that most difficult of all prayers “Thy will be done”.

They have not yet learnt to love their enemies and bless them that curse them. With a directness that is childlike in its frankness they pray for themselves, they plead their own cause—“Hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer”.

There is no emotion of the human heart that has not been imaged here. All the sorrows and fears, joys and pleasures by which it is tossed, have been depicted to the life.

The distress, the pain and grief of the soul fighting against temptation, succumbing to it, are revealed in the poignant cry of the sixth psalm. “O Lord, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure ; Have mercy upon me, O Lord ; for I am weak.”

Sometimes they are tortured with the thought that God has turned away from them. But their love remains as strong as ever, as sincere as ever. And in Psalm XIII there is all the love of a lover in the whispered prayer—“How long wilt thou forget me, O Lord? forever? how long wilt thou hide thy face from me?”

But over and above all is the prayer in Psalm LXI—condensing within it all the struggles of the human mind trying to reach what is good and best, aspiring and hoping for a better ideal, a greater goal—“Lead me to the rock that is higher than I”.

Nowhere else are there expressed more happily the feelings of a soul full of joy and exultation than in the psalms of thanksgiving or the psalms of praise. In every little thing, in the little details, everywhere, the psalmists see the hand of God and sing to Him with thanksgiving for covering the heaven with clouds, for preparing rain for the earth, for making grass to grow upon the mountain. Psalm CXLVIII is the utterance of a heart filled to the full with the thought of the infinite majesty of God. It is a hallelujah of all heavenly and earthly beings. The final psalm closes in an ecstasy of praise. Its utter simplicity reveals the depth of feeling running through it like an under-current. The psalmist is overwhelmed with feeling, he cannot find words enough, means enough by which he can praise God. His over-flowing heart can only simply utter—"Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord".

The Psalms are the poetry of spiritual life. Never has thought risen so high and pure. Never has the soul revealed itself in language so tender, so sympathetic and so moving. They are the records of individual experience, they express the truth of human feelings, they give voice not to the palpable and superficial but to the secret of the inmost life. Their beauty and power never fail, for the psalms consist not of theological dogmas but of human experience, of human suffering, of human emotions which remain the same throughout the ages. And in the Book of Psalms all difference of time, of country and religion is wiped away. Its appeal is universal, its strength is abiding, its beauty is a spring-time of freshness.

Stalin's Last Thesis

SUBIR CHANDRA DAS GUPTA—*Sixth Year Arts.*

Stalin's last thesis is a statement of the ways in which the economic problems of socialism in the U. S. S. R. have been sought to be tackled. We shall try to summarise the principles and the results achieved and also to evaluate them.

The principles involved are, that natural laws depend upon objective processes and that they are immutable in a particular stage of historical development. Some of the laws are eternal, although some are not. Laws of economics fall in the latter category. Natural laws cannot be transformed but their harmful effects can be isolated. One particular law of capitalistic economy, i.e., the law of value operates on a limited scale in the Soviet economy. But its harmful effects have been got rid of. The law of value still operates because historically Russia is not sufficiently advanced to do without it. Especially the agronomy is undeveloped. But Russia can claim sufficient advance in other directions. Inequality between the town and the country, agriculture and industry, manual and intellectual labour no longer exists. Due to the development of a socialist economy under Russian guidance, capitalist countries face economic collapses and will go to war against each other. And also as Socialist economy is based upon the principle of maximum satisfaction, which is sounder than the capitalist principle of profit maximisation, Soviet economy will thrive and the capitalist system will decay.

These principles in practice, Stalin states, have led to important results. As Russian agronomy was in an undeveloped state, it could not be nationalised. Agriculture is carried on on a collective basis. There are, therefore, two economic sectors, the collectivised agronomy and the nationalised industry. The theory of value, which as a natural law, depends for validity upon objective conditions, operates in the agronomy. But the accompanying ills have been got rid of. As complete nationalisation has not been a possibility, the system of commodity production still exists. But as the state is responsible for all investments, surplus value does not appear, and, capitalism does not reappear. A war between capitalism and socialism is inevitable. And the Soviet system must win. Capitalism is weakened by booms and slumps, over-production and production for maximum profit. The Soviet system is strengthened by rising production-level, continuous production and production for maximum satisfaction. Territorial expansion of socialism has led to an intensification of strife among

capitalist countries themselves. And capitalism as a whole today thrives by militarisation, rearmament and the Korean war to make up for the loss of exploitable markets. But its basis crumbles. American dollar supremacy is only temporary—England and France are prospective rebels. Germany and Japan will resent tutelage. As capitalism all over is weakening the Soviet system is getting stronger and integrating its economic sectors in a time-scale of ten to fifteen years.

It is possible to trace both a liberal and an orthodox tendency in Stalin's last thesis. The liberal tendencies are manifested in the concessions that are made to collectivism. These are elements of pragmatism, adjusting political and economic theory to historical circumstances. Unfortunately, this liberal tendency does not extend very far. If it is possible to purify the value system of its dangers in Soviet Russia, it is difficult to see why the same cannot be done anywhere else. Logical consistency demands that we admit the possibility of purifying the value system all the world over. In point of fact, capitalism today is by and large controlled capitalism and the value system operates only through checks and balances. But apart from the logical inconsistency which Stalin's last thesis entails in so far as the value system is concerned, a more fundamental criticism is possible. Stalin advocates the theory, that natural laws depend for validity upon objective circumstances, and cannot be transformed. A theory about the operation of natural laws, seems, in the first place, beside the point in this particular context. We are more interested in the effects of the operation of natural laws, if there are actually such laws, and not with the modes of their operation. But, if there are natural laws in the Stalinian sense, they can be said to undergo occasional transformation. Considering Stalin's example of floods let us suppose two situations. In a primitive stage of human knowledge floods were generally destructive, to-day, with increased human knowledge their forces may be harnessed for electrification. The natural law can be said to have undergone a transformation, for circumstances have changed by the factor of increased human knowledge. It cannot be said that a new natural law has been created for the river is the same river and the floods the same as of yore. It is hardly a case of a restriction of destructive propensities, for, that implies some unnaturalness: Rather, to-day it is unnatural that there should be floods for destruction and natural that they should be beneficial.

It is possible to comment on the lines of economic development envisaged in the Soviet Union and detailed in the thesis. It is hoped that as the State co-ordinates the two economic sectors and helps to create ultimate conditions of full socialisation, the collective system will slowly wane away. But that is only a fond hope or expectation. It is difficult to say which sector will ultimately become preponderant. The occasional necessity of using the might of the State against the stubborn peasantry forbids over-optimism. At the same time, it is possible to visualise the

Soviet system as a single monopolistic industrial concern, of which the last thesis is a policy statement, and which carries on production with the consent and co-operation of the component parts. Hence the existence of collectivisation and nationalisation side by side.

Stalin's theory about the impending collapse of capitalism seems unsound from many standpoints. Firstly, capitalism to-day operates mostly in welfare states, and is different from capitalism whose destruction Marx prophesied. As a matter of fact, American production-level shows continuous increase and no economic slump has yet followed after the Second World War. Secondly, it is improbable that England or France would go to war with America in any near future, for not only is America immeasurably more powerful, technology has almost indissolubly linked up the respective economic structures. Germany and Japan may not go to war with America because circumstances for them are different from those that Germany faced after the Versailles treaty. Finally, it is untrue and unrealistic to suggest that the socialist and capitalist economic sectors are contradictory as the former follows a principle of satisfaction maximisation and the latter one of profit maximisation. Different industries have different highest rates of profit and it is difficult to get a highest rate of profit for capitalism as such. Again, the concept of profit is not purely momentary. Human, psychological and material factors help to develop the concept. It may be suggested that an artist does not necessarily become a steel magnate or an agriculturist joins industry because of financial gains. No body, of course, would produce if returns were less than costs, but the returns need not try to reach a hypothetical maximum.

Certain difficulties are raised when we consider the ways in which Stalin proposes to remove unequal distinction between agriculture and industry, town and country, manual and intellectual labour. Labour is supposed to be the right criterion for remuneration. Labour also has an intensive aspect. A criterion of labour-expenditure, however, is very vague. The main distributive problem is that of maintaining the supply of personnel to the essential services. A too high remuneration breeds over-competition and a too low remuneration results in under-competition. Therefore, it is possible to suggest, that the right principle should be, rather, one of fixing remuneration on the basis of supplying adequate personnel to the socially desirable industries.

At one point Stalin's thesis seems to mark an improvement on the Anti-Duhring. Removal of unequal distinctions between town and country has meant more of urbanisation. Engels thought that large towns would be scarce. But Engels naturally could not have foreseen the gigantic advances of modern technology.

To sum up, the last thesis as a statement of the ways in which the Soviet Union has tried to solve its economic problems is a tribute to pragmatism in terms of practical policy. But orthodoxy lingers—and hence

the cart-load of prophecies based upon doubtful factual evidence. Communism and the Communist Internationale have always tended to show various strata of opinion and differences between the orthodox or the rigid and the more liberal group. Bolshevism began as a rigid Marxian doctrine with its insistence upon the inevitability of the class-struggle, the dictatorship of the proletariat and the theory of surplus-value. As it came to grips with reality in the Russian state, it had perforce to re-orient itself in terms of environment and circumstances. The religious question is a case in point. Marxism, certainly, is a dynamic thing, but dynamism without the essential elements of Marxism, hardly is Marxism. Of course, Marxism has to be introduced in stages, but how do we synthesise the two absolutes of flux and pattern to suggest that the stages are created to lead to a Communist Utopia? And if we suggest that the process or the dialectics should be viewed dialectically, we reach the absurd position of judging the thing by the thing itself. And finally, Bolshevism bade good-bye to Marxism the moment it assumed the role of the guardian of law and order in Russia. The revolution was to come in industrially advanced countries, Great Britain for example. Its emergence in Russia is non-Marxism. If it is the world-situation as a whole that should decide the question of the timeliness of revolutions—it is difficult to see why the country is Russia. And it is Russia because there is a strong party organisation there which means available power. Therefore, the revolution came not because of any Marxian imperative but because of the non-Marxian element of power. The stages by which Communism is sought to be established in Russia are just those stages which Russia had not passed through to make her a proper revolution-arena. Whither this revisionism of Bolshevism?

Democracy and Freedom of Thought¹

SRI AMLAN DATTA—*Ex-Student.*

The etymological platitude that democracy means the rule of the people, and, in modern states, of the representatives of the majority of the people, has, in the present century, done dubious service to the cause that it proposes to uphold. The definition of democracy as the rule of the majority is wrong as well as dangerous. It is not by counting the heads of Hitler's supporters that one must decide whether the Hitlerite regime was democratic or not. If, in a fanatical community, the majority decides to gag the voice of all minorities, the system does not deserve to be called democratic merely because its undemocratic action has the approval of the majority. Even in its narrower connotation, democracy stands for a peaceful method of political change ; and as such it stands for the right of the majority, or the representatives of the majority, to rule, *as well as* the right of the minority to try, by every peaceful means, to convert the majority. Every case of rule of a minority is a case of undemocratic rule ; but not all cases of rule of the majority are cases of democracy. Without the right of the minority to convert the majority, democracy loses its dynamic significance and is turned into its opposite.

In a wider sense, democracy is not just a peaceful method of political change, but a system representing the maximum possible opportunity for the individual to develop what is unique in him and to enrich society through the contribution of his creative uniqueness. It demands, unquestionably, the right of the individual to material security, inasmuch as such security is an essential condition of unhampered growth ; but it stands also for something more. If security were an end in itself, there would have been nothing to say against the security of detention camps. Democracy is as much hampered by the absence of "economic rights" as by the presence of these same "rights" in a form which constitutes a negation of political liberty and of other human rights. As a matter of fact, the rights of an individual as a man take precedence over all other rights, and these other rights are to be judged in terms of their effectiveness in sustaining fundamental human rights. Of the fundamental rights of the individual, the right to freedom of thought and expression is

¹ We had asked for and received this article from Sj. Datta a few months back. We intended to publish it in the second issue of our last session. But that issue itself could not be published. In the meantime the thoughts expressed here appeared as a chapter in Sj. Datta's book *For Democracy*. The article is now published here with his kind consent.—EDITOR.

amongst the most essential. This right is important in an ultimate as well as in an instrumental sense. In an ultimate sense, the peculiar glory of man lies in his power of contemplation and his incomparable capacity for externalising and communicating his thoughts and emotions. Even if it were possible in a completely regimented society to enjoy to the full the material comforts of life, the best of human spirits would feel after a time that life is not quite worth living merely for the sake of such comforts. They will feel something innermost in them being starved and their manhood will rebel against the monotony of the pleasures of a predominantly physical existence.

Not less important is the instrumental value of freedom of thought. In countries like this, where the economic problem is acute, there is a not too uncommon habit of dismissing freedom of thought as a luxury, important only for the better-off people, which can easily be dispensed with till the more pressing problem of livelihood for the million is solved. This is an entirely erroneous way of looking at the question of democracy.

It is true that only a minority of people are interested in thought. It does not follow that a minority enjoys the fruits of thought. The progress of natural as well as social sciences has been due to the efforts of a small number of exceptionally gifted men ; but the discoveries made in these fields have brought benefits to numbers far exceeding those directly connected with the acts of discovery. Progress of ideas, then, is important not for a select few, but for the community as a whole. That being the case, the important question is whether, on the evidence of history, ideas have most rapidly progressed in an atmosphere of freedom or under the rule of authority. It is no use saying that those ideas alone should be allowed to circulate which contribute to progress. If historical evidence is any guide, no group of people, however wise, is competent to settle beforehand which ideas will turn out in the long run to be most conducive to progress. Even erroneous ideas have often a contribution to make, which they yield best when they are freely discussed and allowed to withdraw themselves in the normal process of time rather than in obedience to the fiat of the state. Ideas, it has long been recognised, develop through a process of mutual opposition and interpenetration, so that to raise any set of ideas to the status of a State religion and protect it against fundamental criticism, leaving only the right of annotation and interpretation of the scripture to choice devotees, is to raise an overwhelming impediment to the progress of ideas and to deprive society of much of the fruits of such progress.

But it is not simply by arresting the advance of ideas that totalitarianism brings harm to society. Not less destructive of social welfare are the atmosphere that suppression of thought produces and the many strange creatures of that vicious atmosphere. Suppression of thought is not simply a physical process ; it is a psychological process as well. It

signifies not only the act of stopping the expression of certain ideas ; it points also to the act of hating certain ideas, and of inculcating such hatred upon the largest possible number of people. By introducing in society a specially glorified variety of intolerance, it pollutes the very sources of social solidarity. Free co-operation arises from readiness to appreciate differences. Where appreciation of differences is seriously restricted, there can only be concerted action without the spirit of free co-operation. Hatred has its counterpart in fear ; and a society urged by hatred is equally urged by fear. Where differences are not respected, people have to cultivate an instinctive caution against fellow men, lest unwittingly they should betray differences which, in the eyes of authority, merit condemnation. Few things are spiritually more degrading than an attitude of continuous caution against the people who surround us. Under modern forms of totalitarianism, there is no respite from such caution even in one's relations to one's dearest people ; for the modern State has left earlier types far behind in its mastery over the delicate art of setting loved people against one another in the service of the State. Under the rule of the dictator, there is no holiday from fear.

Modern totalitarianism has, not infrequently, introduced itself with the promise of ending exploitation. It has never failed to create a new justification for exploitation. Exploitation presupposes the will as well as the power to exploit ; presupposes, that is to say, as its subjective condition, denial by the exploiter of any but an instrumental value of the individuals exploited, and, as its objective condition, great difference of power between the exploiter and the exploited. A community ruled by dogma creates both these conditions. The individual in such a community has no intrinsic value ; he is valued only as a bearer of the faith. Denial of all value of those who oppose the faith is part of the faith itself. It is easier for "true" love to go without jealousy than for "true" faith to tolerate heresy. Where there is dogma, there, again, is hierarchy, with concentration of power in the hands of the high priest. Beyond a range, the lower down a person stands in the hierarchy the more is he, in all probability, subject to exploitation. Lowest down are the "non-conformists" or the "enemies" of the regime. Where the faith of the fanatic is leavened with the merciful presumption that even the worst sinner can possibly be won over to the way of God, hatred is tempered with pity ; where that leaven is absent, every restraint is dropped. The enemies of the people must be disposed of in the shortest possible time—with time enough, possibly, to exploit the utterances of their dying moments to add glory to the rule of the dictator. Or, else—and is not that better still when coolly considered !—they may be thrown into forced labour camps, to contribute to the society they have sinned against the maximum of surplus value that the guardians of society may wisely extract from them before they enrich the soil with their bones. Said the ruler of a totali-

tarian state, with great cogency, "The labour of those deprived of liberty is being used by us on....communal and highway tasks. We did this before, we are doing it now, and we shall continue to do so. This is profitable for society." Profitable indeed, and how else could one augment such profit to society without increasing indefinitely the number of those "deprived of liberty" !

Not only is the suspicion of the fanatical rulers of a totalitarian State turned against its own citizens, but by the very single-mindedness of their fanaticism they are rendered incapable of regarding other States with anything but suspicion, unless total submission is offered as the price of friendship. The rulers of a totalitarian State are, moreover, quick to learn that the largest possible degree of obedience can be had from its citizens only when the latter, struck by some real or imaginary fear, are anxious to be protected by the strong arm of the State ; and that one of the quickest ways of creating such panic amongst the people is to persuade them that the enemy is ever knocking at the door. The same course is suggested by another consideration, as dear to the dictator as it is necessary for him. The dictator requires to clothe himself with moral authority to suppress all his adversaries ; and one of the easiest ways in which such suppression can be carried out with the enthusiastic support of the people is to play on their herd-instinct and deceive them into the belief that the opposition to the dictator acts under instructions from intriguing foreigners. Totalitarianism will as easily allow rival opinions to grow within the country as it will treat rival powers, reluctant to accept its leadership, as anything but wicked, furiously to be guarded against. And the cost of continuous "defence", even in material terms, is high indeed ! A dictator cannot afford to give first preference to prosperity.

If freedom of thought were merely a luxury for the intellectual *elite*, if by showing democracy the door we could bring in justice and prosperity, how much of the attention paid to these ideals would have been out of place ! Democracy is not just a political system ; it is a way of life. The greatest enemy of the democratic way of life is fanaticism. Fanatics are rarely guilty of lack of idealism ; what they lack is tolerance. It is not generally realised how completely idealism may be corrupted by intolerance. In the same proportion as the fanatic is self-sacrificing in the cause of his ideal, he feels himself duty-bound to transgress the general codes of ethical conduct in his attitude to his opponents. Through his intolerance he extends the boundaries of that field in which, self-righteously, he acts in open disregard of morality. Thus, the fanatical idealist, in the very pursuit of his ideal, builds a world in which the most insistent profession of high ideals is united with thorough-going contempt for all ideals in practice.

In Defence of P. G. Wodehouse

SABYASACHI CHATTERJEA—*Fourth Year Arts.*

It is our endeavour to claim for Wodehouse, if not an exalted place in English literature, then at least a right to be considered seriously. A systematic study of growth and development of his mind goes to show that there is a serious side to his humour. The Wodehouse effusions are a faithful and vivid reflection of the growth and development of a twentieth-century mind.

One of the most fruitful sources of humour is the ridicule of the exalted. “The coming of Gowf”, one of Wodehouse’s earliest stories, marks the first phase in his career of humour. As always, his humour is with a purpose. There he lets loose for the first time a tide of raillery against the high and mighty. We are transported to a mythical kingdom of Oom, ruled by young king Merolchazzar. The setting is peaceful and serene. On the broad terrace outside his palace, overlooking the fair expanse of the Royal gardens, King Merolchazzar stands leaning on a low parapet, his chin on his hand, and a frown on his noble face. The day is fine, and a light breeze bears up to him from the garden below a fragrant scent of flowers.

In elaborating the king’s unsuccessful love-affairs—the cause behind that Royal frown—Wodehouse has a masterly dig at Royalty. This is the 20th century mind ridiculing a decrepit institution. The king’s minstrels sing inimitable eulogies :

“Oh, tune the string and let us sing
Our godlike, great, and glorious king !
He’s a bear ! He’s a bear ! He’s a bear !”

There is a light contempt for the king as a person, and a healthy one for kingship as an institution. The ridicule is extended to the servants of the king and their offices. There is a “Supreme Hereditary Custodian of the Royal Pet Dog”, an “Exalted Overseer of the King’s Wardrobe”, and a “Supreme Splendiferous Maintainer of the Twenty-four Handicap Except on Windy Days When It Goes Up to Thirty.” By a contemptuous Wodehouse, the characters are reduced to mere toys, to be played with at will.

It is a curious fact that nearly all the settings in this Wodehouse collection are almost idyllic. There is no distress in the early Wodehouse world. Peace reigns over the Wood, Hills Golf club and its ever-present

and omniscient Oldest Member. Indeed, one sees in this the reflection of the unruffled, youthful writer who says in the Preface :

"As a writer of fiction I have always till now been handicapped by the fact that my disposition was cheerful, my heart intact and my life unsoured. Handicapped, I say, because the public likes to feel that a writer of farcical stories is piquantly miserable in private life, and that, if he turns out anything amusing, he does so simply in order to obtain relief from the almost insupportable weight of an existence which he has long since realised to be a wash-out."

With the maturing of the Wodehouse mind, the contempt for royalty in particular gave way to a contempt for aristocracy in general. We find a new series of characters taking the field—prosperous, contented and eccentric earls, planted in rich and sumptuous castles. At this stage, the Wodehouse earls are eccentric rather than idiotic ; as yet, no commoner-intellect, like the valet's or the butler's, is there to set off their idiocy. The trend is there. There are efficient secretaries—witness Rupert Baxter—who are much more efficient than their masters. There are free-lance consulting agents like Psmith (spelt with a P which is silent) who prove their commoner-intellect to be superior to the intellects of their blue-blooded masters. There is a consistent effort to bring down the aristocracy from its undeserved pedestal, but as yet, not to the gutter—not yet by butlers and valets.

In the next phase, the Wodehouse earl changes for the worse. There is no venom in the raillery ; there is no rancour. But the ridicule is more pungent. The nobility is not merely eccentric ; it is decidedly foolish. And the new lords are fat, inactive and definitely less affluent.

The Earl of Emsworth and Lord Hoddesdon may be said to represent the two types. In the first place, the former has a more respectable name. Later names in Wodehouse tend to grow increasingly absurd. Secondly, where the former is merely eccentric, the latter is very much of an imbecile.

The superiority of the commoner over the aristocrat is painted in firmer lines. Hoddesdon's son, Lord Biskerton (nicknamed, incidentally, the "Biscuit"), is contrasted with Conway : the former's lethargy with the latter's alertness ; the latter's capability with the former's general uselessness. And the nobility, as hinted at earlier, is now impoverished. Biskerton is in the habit of chasing his friends for fivers. Hoddesdon is in a chronic state of bankruptcy.

It is noticed that the idyllic settings have disappeared. Much of the action takes place in busy London. There is, fittingly, a new type of character, the rich industrialist from America, typified in T. Paterson Frisby, the "T" standing, we are informed confidentially, for Torquil.

It is significant that Wodehouse is more bitter towards the millionaire than he is towards the earl. The former is presented in all his miserly

meanness, not hesitating, in the case of Frisby, to blight the happiness of his niece for the love of his bank balance. Frisby's blatant betrayal of the trust Conway placed in him is painted in garish colours.

In contradistinction, Hoddesdon and Biskerton are things apart from the dyspeptic world of Frisby. They are comic, good natured, even lovable ; only they are much too cloth-headed.

This introduction of the American millionaire into English society is a reflection of the social changes that took place in the England of the late thirties. It heralds the increasing hold of the American dollar over the English aristocrat. Wall Street financiers tend to enter the Wodehouse arena in increasingly unfavourable colours. Equally faithful is the picture of the American heiress, and her hold over the impoverished nobility of the day. Sir Arthur Conan Doyle had sung the same theme some years ago. It was already a favourite subject for journalistic banter. Wodehouse takes up cudgels with his inimitable witticisms and his unforgettable raillery.

As yet, the inferiority of Wodehouse's noble protagonist has been brought out in the domestic plane solely through domineering sisters and aunts. In later Wodehouse a new character—the butler or the valet—is introduced. This innovation serves to heighten the same effect. Mervyn Spink, a butler, is introduced as a butler who looks like a lord, while his master, a lord, looks disconcertingly like a butler. The Wodehouse butlers, and Beach is another example, identify themselves with their masters. In "Spring Fever", the earl hero in the concluding chapter is made to act the part of a butler in a Hollywood film. We leave him standing before a mirror, bowing to himself, and practising his new rôle.

Wodehouse's earl is now at his sorriest plight. The Wodehouse arena is now full of jelly-spined, cloth-headed, men-of-the-world, who are absolutely dependent on their valet-wizards. Jeeves is the prototype of these gentlemen's personal gentlemen. And in Jeeves Wodehouse has succeeded in creating a character who "lives", the essential test for a creative novelist.

It is significant that Wodehouse is the most popular lowbrow idol of present-day English literature. The years have seen in him a true reflection of the mass spirit—the general contempt for grey top-hats, the general disbelief in the intellectual superiority of the aristocrat over the commoner. Yet, an Englishman's attitude has no venom. He has an unconscious regard for age-old institutions that recall his mighty past. Wodehouse, the Englishman, has no venom either—only good-natured ridicule, and ridicule through an extremely effective medium. We see in him a rebirth of the tradition of Lambian humour, inaugurated with the much-talked-of and extremely loveable Whim Wham effusions.

One must keep in mind that Wodehouse's reflection of the mass mind remains a reflection ; at no stage does he try to propagate a philosophy.

If he presents a definite point of view, he does so unconsciously—like a true child of his age.

In an estimate of Wodehouse's treatment of aristocracy, a quotation from De Quincey will not be out of place: "England owes much of her grandeur to the depth of the aristocratical element in her social composition, when pulling against her strong democracy. I am not the man to laugh at it. But sometimes, undoubtedly, it expressed itself in comic shapes." De Quincey, it is true, could not laugh at it. But for Wodehouse, much of that grandeur has worn away, and when he laughs, he does not have to protest that he is not laughing at it, but can laugh both openly and freely.

What S. E. Maltby says of the essays of Gardiner might very well be said of the writings of Wodehouse: "They are so sensible, and they are funny without being silly." For at bottom, if we come to think of it, we find it means that his writings have shown us "something in a true light, and yet have made the vision of the truth pleasant and not forbidding."

Materialistic Interpretation of History

NRITISH SEN GUPTA—*Fifth Year Arts.*

Nineteenth century European scholarship was more than a little nervous when the iconoclastic influences of Marxism invaded the field of historical thought, as that of every other branch of knowledge, seeming, as it actually did, to go counter to all fondly-cherished historical ideas. Since then Marxian historical thought has received increasing attention from the thinking part of mankind. And to-day, in the fitness of things there is a tussle between the Marxists and the so-called Idealists in the field of historical thought corresponding to the abysmal gulf dividing men in the fields of politics and culture. While the obvious limitations make it impossible to indulge in any criticism or appreciation of Marxian historiography, the following pages are intended to sketch a bare outline of the Marxist idea of history for laymen, confused amid a multiplicity of counteracting prejudices. Those well-versed in the subject must therefore be disappointed if they expect anything to feed their intellect.

The first thing to get clear is the idea of dialectical materialism which is undoubtedly the prop of the imposing edifice that is called Marxism. The genesis of this all-important principle is to be sought in the Hellenic civilisation where materialism first took its shape at the hands of philosophers like Anaxagorus and Democritus. This was paralleled by the growth of the idea of dialectics in a crude form. Eclipsed for millennia, both were revived in modern times, materialism by Bacon, Hobbes, Lock, Diderot and others, and dialectics shortly afterwards by Hegel. It was left for the genius of Marx to integrate these two thought-currents into one organic whole. Dialectical materialism as understood by him proclaimed in the first place that change takes place through the conflict and interaction of opposite forces and in the second place stood for the pre-eminence of matter over mind, of material forces over human ideas. Thus every object (thesis) in the process of transformation gives rise to an opposite tendency (anti-thesis) and the conflict between thesis and anti-thesis results in the emergence of a third thing (synthesis). Marxian dialectics, however, reflects a conflict of material forces and is thus thoroughly different from Hegel's dialectics which means the self-realization of the eternal Absolute Idea through the conflict of opposite ideas.

This law of nature, when applied to the study of history gives birth to historical materialism which recognizes change as a fundamental fact in history. Change, again, occurs at different speed in different environ-

ments. A long spell of very slow evolution is usually followed by a violent eruption through which the long-stored forces of change find release. Marxism thus regards revolution as an agent of progress.

A further feature of historical materialism is the assertion that historical development is determined ultimately by material forces which are taken to mean the material agents of production—tools and machines—together with natural resources and the skill to operate them. Marx elucidated the entire process in the following lines. “In the social production of their livelihood men enter into definite social relations that are necessary and independent of their wills. . . . The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real basis on which is reared a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness. . . . With the change in economic foundations the immense superstructure in its entirety is more or less rapidly transformed. In considering such transformation a distinction should be drawn between the material economic conditions of production that can be determined with the precision of natural science and the legal, political, religious, artistic, or in a word, ideological forms under which men become conscious of the conflict between the means of production and the relations of production.” Thus, Marxist historical thought which has come to be known as the materialist or economic interpretation of history rejected the previous view that rested on the conception that all historical changes are rooted in the changing ideas of human beings and that political changes are the most important of all historical changes. Marx and Engels were the first to proclaim that all ideas have their origin in material conditions and these are to be laid bare in order to understand the driving force behind political and other changes.

This is, however, not to say that they totally denied the role of ideas and institutions in the course of history. Nor does Marxism regard economic factors as the only driving force behind history. “We make our own history,” wrote Engels “but under very definite presuppositions and conditions. Among these the economic ones are finally decisive, but the political ones etc. and indeed the very traditions that haunt the human mind play a part, though not the decisive part.” Thus, the ideas and institutions that sprang up under Bronze Age economy in Egypt played so important a part as a stumbling block to progress that the Egyptians clung to the older economy even long after the coming of the Iron Age which revolutionized the entire technique of production in other parts of the Mediterranean world. Historical materialism, to quote Stalin, “distinguishes between different kinds of ideas and theories. There are old ideas and theories which have outlived their day and serve the interest of moribund forces in society. Their significance lies in the way they hamper the development and progress of society. But there are new and advanced ideas that serve the advanced forces of society. Their significance lies in

the fact that they facilitate the progress of society and is the greater, the more accurately they reflect the needs of development of the material life of society. New social ideas and theories indeed arise only after the development of its material life has set new tasks before society. But once they have arisen, they become a most potent force which furthers the material progress of society. It is precisely here that the tremendous organizing, mobilizing, and transforming value of new ideas, new theories, new political institutions becomes manifest."

If history is, as Marxists hold, a dynamic process how then is change operative in it? This brings us to the well-known but often misunderstood conception of class-struggle. All history, declared Marx in 1848, has been a history of class struggles, that the moving force behind all the complicated political vicissitudes has been the division of society into classes, the domination by one of others, the resultant struggle and the final conquest of the class in power by some newly arising class. What is fundamental in this conception is not the widely held but erroneous notion that opposite classes have always been engaged in cut-throat conflicts, but rather the undeniable fact of the division of society into classes in all stages of history. These classes, on an analysis of the material environments, are found, almost invariably, to be the products of the actual modes of production and exchange in particular ages. Society is dominated by the class that controls the means of production. It thus constitutes itself as the ruling class and exploits the labour of other classes for its benefit.

The forces of production are, however, dynamic rather than static and through a slow and often imperceptible but steady process of evolution they tend to take on new shapes—so much so that the corresponding social relations are often found to be lagging behind. ‘From forms of development of the forces of production these relations turn into their fetters’ (Marx). This contradiction between the changing material forces and the moribund social relations is paralleled by the fact of the down-trodden classes engaging in a struggle against the dominant class for a re-adjustment of social relations with the changed modes of production. The whole thing in most cases culminates in a revolution with which the long-postponed readjustment of social relations comes through the victory of a revolutionary class over a reactionary ruling class. Society thus progresses through the interaction of material forces and the consequent struggle between classes, just as every object of external nature evolves through a dialectical process.

By applying all these ideas, Marxist historians have been able to trace the evolution of society through five broad historical phases—primitive tribalism, slave society, feudalism, capitalism and socialism. In the first stage, which, strictly speaking, falls within the domain of prehistory rather than history proper, the natural dangers facing man, the immense

trouble in procuring the bare necessities of livelihood and the meagre resources at his disposal forced him to live a 'communal life' based on joint effort to get food and joint appropriation of the same. Such a society, by nature, was bound to be one in which social classes could not arise. With the progress of humanity along the high road to civilization—the invention of agriculture, of pastoral farming and of the use of metals—social classes began to appear and at the dawn of history in all our known societies a smaller class of military or priestly aristocracy is found to rule over an incommensurately larger number of servile people. Slave-economy was the dominant feature of the ancient world and reached its apogee in classical Greece and Rome. The fall of the Roman Empire was more than a mere political happening ; it was symptomatic of the collapse of the classical slave-economy and the beginning of a great transition that gave birth to a new social order known as feudalism which meant the replacement of slavery by serfdom. This order "rested on the self-sufficient economy of small peasant communities which themselves produced almost all their requirements in which there was almost no exchange and which received from the arms-bearing nobility protection from without and national or at least political cohesion."

Feudalism had its climax in the 12th and 13th centuries, but thereafter it began to decline with the gradual growth of various handicraft industries, of trade and commerce both on a capitalistic basis and the consequent emergence of a new class, the so-called bourgeoisie. The discovery of the extra-European world gave momentum to this Middle class by offering a far more extensive sphere of trade and exploitation. This class gradually came to combine social wealth and social power in its hands, though for a considerable time it did not assume political power. To conquer power from the feudal nobility, it had to wage three titanic battles—the Reformation in the 16th, the English Revolution in the 17th and the French Revolution in the 18th centuries, though the rear-guards of the decadent order continued to dominate Eastern Europe even after this. Finally, the Industrial Revolution of the 19th century, itself very largely a product of the phenomenal accumulation of bourgeois wealth through the plunder of colonies made large-scale industry possible and gave the capitalist order its present shape. In Asiatic societies slave-economy had been replaced long before the corresponding change in Europe by a quasi-feudal order, technically called Asiatic feudalism which did not quite resemble European feudalism in respect of external features but differed little fundamentally. The duration of Asiatic feudalism was far greater than that of its European counterpart and it was only in the 18th and the 19th centuries that this ancient regime received its final death-blow by the impact of the expanding capitalist economy of the West.

The contradictions inherent in capitalism had meanwhile been increasingly in evidence through the increasing gulf between the capitalists

and the wage-earning classes, the periodical economic crises, the unending hunt for colonial markets and the occurrence of imperialist wars at regular intervals. The mounting discontent of the labouring classes found expression in a series of uprisings that marked the history of the 19th century. All this, in the opinion of Marxist historians, signify a crisis in the old story of class struggle. The struggle between the capitalists and the proletariat, they further hold, must end in the victorious emergence of the latter and the establishment of a classless society through the conscious efforts of this revolutionary class. History is to reveal whether, or to what extent, they are correct in reading its course.

This, in short outline is the conception of history which Marx and Engels were the first to shape and which was subsequently expanded by others including such greatmen as Plekhanov, Lenin and Stalin. This revolution in historical thought was due to the discovery of the 'laws of motion' in history. "Just as Darwin discovered the law of development of organic nature, so Marx found out the law of development of human society" (Engels). Historical materialism is the result of the application in the field of history of the general law which governs the behaviour of all matter and history as such becomes a scientific study of the evolution of human society rather than a conglomeration of isolated and accidental events. This is however not to say that historical materialism has managed to reduce history to a mechanical order. Its foremost exponent made allowances for unforeseen happenings disturbing all calculations, when he declared in 1871 that history would be of a very mystical nature, if accidents were not to play an important role. Thus though classless society is a fitting goal of history, it is by no means a goal to which history leads inevitably and fatally. It is precisely here that historical materialism lays emphasis on the role of human mind that can "set the problems of progress and solve them in conformity with the historical conditions of the epoch."

Periodisation in Indian History¹

BARUN DE—*Fifth Year Arts.*

British historians and their followers in writing Indian history have generally viewed it synthetically as a record of the subjugation of India to various forces and accordingly have grouped its eras into three major classifications—the Hindu Period, the Muslim Period and the British Period. If we accept this explanation of the nomenclature, then we find that one of the main objections to it is disposed of—that there is a discrepancy in the emphasis on each period, the first two being on a religious basis, and the third only, being on domination by some power. As a matter of fact, it appears that the older school of historians have actually named the periods after the races by which they believed India to have been ruled at that time. It is in this sense, that “Hindu” is to be interpreted, as a synonym for that hybrid stock, which held sway in Northern India till the invasions of Muhammad of Ghor, and which has been proved by A. M. T. Jackson, D. R. Bhandarkar and others to be an assimilation of the various races which have poured into India in her early history. Similarly, the term “Muslim” is convenient as denoting a religious group in which the Ilbaris, Khiljis, Tughlaks, Afghans and Chagtai Turks may be lumped. They were no more ethnologically a single group than they were in religion. Needless to say, the same disparities existed, though in a minimized form among the British rulers of modern India. But though there is no contradiction in the terms of this classification, the underlying idea that the history of India is to be explained by the implicit imperialism of various races over her is clearly untenable. It seems to have arisen from a self-justificatory attempt of the British historians to bring their actual imperialism in line with a continuous but fictitious trend. It is unfortunate that some backdated historians still try to perpetuate the legend.

Besides, we find that in each of these arbitrary periods, other race-groups like the Tamils and other southerners in the first, and the Marathas in the second, have held equal sway. The very theory of imperialism by one race-group being the dominant factor in Indian history seems negated by facts. Are we then to say that the Andhras and the Salankayanas, the Chalukyas and the Cholas and the Pallavas played no part in Indian history? For this is what it amounts to, if we do not class

¹ Originally read at a meeting of the College History Seminar on the 25th September, 1953. Slight additions and alterations have been made in clarification of certain points.

them all as Hindus, simply on the basis of their religion, which would create a contradiction (already referred to) with the other two periods. The domination of North over South is implied in the old classification and will not, we believe, be always borne out by facts.

On the other hand, if we do acknowledge the old periods on the basis suggested by their propagators, a close analysis will show that between the so-called periods, an interval of political flux has invariably intervened. A study of Dr. H. C. Raychaudhuri's interesting chapter on the Sorasa Mahajanapadas in ancient Northern India (in his "Political History of Ancient India") demonstrates that these years were a period of change from primitive oligarchical or popular democracy to simple monarchy, somewhat, though not completely, of the type we find in ancient Greece. All over Northern India, in Kasi, Kosala, Avanti and most of all in Magadha, strong men like Chanda Pradyota and Bimbisara were concentrating the sovereignty in their own hands, from the clans and sects who had so long held it in actuality. This period was ultimately to lead to the wider one of imperialism of one state, i.e. Magadha and much later, of Kanyakubja over all the others. Again this is followed by the disruption of the "Rajput" period, when various clans, each forming a monarchy in itself, wrestled for supremacy. The same process also took place in the Deccan, although under a different form of polity. This was the period, in which, as we hope to show, the beginnings of a quasi-feudal system were laid to continue through the early part of the so-called Muslim Period. Again, the period from, say, Muhammad Tughlaq, to Akbar may correspond to a similar transitional period, for reasons which will be demonstrated hereafter. So we find that the Hindu, the Muslim and the British Period are each composed of a transitional phase and one of imperial expansion. Separatism rather than imperialism is the dominant feature of Indian history, and men like Samudragupta or Akbar shine out because they are so rare in comparison to the many rulers who have aimed at local independence.

It therefore appears that the old classification of periods is untenable. Now this gives rise to a second question—what is the true criterion for the periodisation of Indian history? Three general criteria have often been suggested—religious, political and economic. A cursory analysis of the old classification may lead us to believe that Indian history has been judged by the religious criterion: in fact a writer once called the British Period, the Christian Period. But an adoption of this criterion would force us to take a false view of Indian history, and it may be discarded without further thought. The economic criterion has been used to classify European history, and it may be desirable, in some cases to apply it to India. The fact that the only major socio-economic change that India has seen is the transposition of a colonial, capitalist economy on her dying, village culture, by the British, is, of course, incontrovertible. But this

can, by no means, lead us to believe that there were thus only two major periods in Indian history, the Pre-British and the British. Though no single era may be distinguished in which violent economic changes occurred, yet we may easily see that Indian economy was slowly progressing, and in the period of the Mughals, had been divested of much of the form that it had in the Gupta age. Therefore, although we need not challenge what some scholars still cherish as the fundamental unity of Indian culture through the ages, it is up to us to demarcate its subdivisions. Since no marked economic criterion for the pre-British ages has yet been found, we must fall back on a study of the socio-polity of India, which as we hope to demonstrate, has undergone three major changes. An analysis of Indian economy will, of course, sometimes prove useful in such a study. We would therefore propose three general periods for Indian history—Ancient, Mediaeval and Modern—the names are, of course, used because they are free from any special bias for any one criterion. They have the added virtue of familiarity to all students of history, but we must not be led into the common error of drawing any parallelism between Indian and European history, simply on this ground. It is difficult to get better names and so Ancient, Mediaeval and Modern must stand for the time being. We shall show that they are by no means identical to the Hindu, Muslim and British periods.

Little light has been thrown on the dawn of the ancient period. There are indeed large scale evidences of the settled, pastoral Mohenjo-Daro-Harappa culture spread over the Punjab, Rajputana and Sind. But this seems to have been only a regional culture and cannot be definitely proved to have had any concrete influence in Indian history, except perhaps in the sphere of religion. We can, perhaps, afford to leave out the Mohenjo-Daro civilisation in a generalised discussion of trends in Indian history, until such time, when it will be conclusively proved that there has been a continuous development from Mohenjo-Daro to the present day. This has really begun with the Aryan settlement. It was the clash of the Aryan nomadic tribes, mainly hunters and warriors with the primitive Dravidian culture, which produced a sort of fixed tribal polity all over India, even down to the Godavari and Krishna, and for all we know, beyond. The primitive Aryans did not have this polity. They had enjoyed a kind of primitive communism (of course in the widest sense of the word), but their socio-economy became complicated in contact with the Dravidians. There was a process, spread over several centuries, involving the decay of democratic life, and ultimately we find tribal chieftainship yielding place to monarchy on a separatist basis, tending sometimes towards the imperialism of the Magadhas, the Mauryas, the Satavahanas and the Guptas.

A decay of the forces governing their period is visible even during the time of Harsha. Of course, as Dr. H. C. Ray has so ably shown

in his introduction to the *Dynastic History of Northern India*, the Gurjara Pratiharas were the last of the great Indian emperors, and the Rajput age properly begins after Mahipala in 916. It has therefore been acknowledged that the ancient age ends politically with the Pratiharas in the north and the Rastrakutas in the south. The question now arises whether this "Rajput" age may be classed in the Ancient Period or within the Mediaeval Period. It ought to be noted that we do not mean to ascribe any arbitrary date for this new transitional period. The germs of it are visible in the centuries between Harsa and the Pratiharas. Profound changes seem to have been taking place in Indian polity as well as in her moral and social life. Sankaracharya and later on Ramanuja are landmarks in Indian religion, and it is certain that the Gupta Age witnessed a reform in the way of life of most Indians. Besides the leaven of various invading races like the Sakas, Kushanas, Haihayas and Gurjaras had already begun to work in Indian society. One of these changes in the social polity is to be witnessed in the administrative system. We find, all over Northern India, up to the Deccan, a revival of the clan system, presided over by a chief, who was responsible for his people and his lands to his king. This is what we might perhaps term "Samantaratana" or quasi-feudal organisation. It has been interpreted by some as simple continuation of the administrative set-up of the Mauryas and Guptas. Whereas the "mahamatyas" the "rajukas" or the "ayukta" had been officials of the king, who were appointed by him for a certain tenure, the petty "Paramesvaras" or "Parama Bhattacharya Mahipala's" about whom we hear, say in the Vodamayuta Inscription of the 12th century or in the Inscriptions of the Kalacuris of Gorakhpur clearly show a feudatory system of administration, by which the clan chiefs held a certain territory, possibly in military tenure from their king, and by which petty dynasties carried on the local government, while the monarchs co-ordinated the government. A different age is definitely coming into existence. Quasi-feudalism is the basic feature of the early Mediaeval Age and continued in full swing during the best part of the so-called Muslim Period. As a matter of fact, the Chandellas and Kacchapaghatas, the Gahadavalas and the Guhilas are an earlier manifestation of the same socio-political system which we find in the epoch of the Delhi Sultanate. All the Sultans up to Alauddin Khalji rule on the lines of centralised feudal monarchs. Their Iqtas governed by Muqtis (commandants) are incipient examples of the military tenure, which developed into jagirs, in the later sense, a complete example of the mediaeval European "feud" in the landholding sense of the term. Their provincial military levies and their linking of church and state are as near an approach to feudalism as has been achieved in India. Of course the very use of the term "quasi-feudal" shows that we do not mean to explain this polity on the lines of European development but there was a certain similarity, though in India it was more a form

of polity than an economic organisation considered in its essentials. At any rate we may group the Rajput Period with the rise of Muslim imperialism in India on a quasi-feudal basis and name the whole period Mediaeval.

There is a current conception that the Mughal Empire forms part of the Mediaeval Age. This has probably arisen from the mistaken identification of the so-called Muslim Period with the Mediaeval Period and the justifiable inclusion of the Mughals in the former. An idea that all that is modern in India had its origin with the British may have resulted in the rejection of the Mughal Age from the Modern Period. Besides modern religious biases often delude students of history into the belief that all that is Muslim is mediaeval in nature.

Quasi-feudalism in India was collapsing at the time of Panipat and the forces of transition, which were to usher in the Modern Age had already come into being. A tendency towards individualism in personal thought, an "emancipation of reason", and a synthesis of culture are visible in the potent Bhakti cults, which sweeping across the whole of India, influenced Indian life much more than did religion. There was a revolt against the mediaeval subjugation to ecclesiastical authority and the overriding group consciousness as personified by caste. There was everywhere an atmosphere of discontent as may be studied in the popular message of the Bengali poet Mukundaram Chakravarti in "Kavikankan Chandi" or in Tukaram's Maratha ballads. A little thought will show us that this discontent was one of the exploited classes against the parasitical nobility.

It may be admitted that Mughal centralisation stifled the awakening of the lower class in about the same way as the bourgeoisie were kept down in France before the Revolution. But the tendencies of middle-class unrest seem to have been there. It is India's misfortune, that when she was weakened by the fall of the Mughal empire the British found in her, a fit ground for colonial exploitation. But the fact remains that in the Mughal Period, the Indian people, were, it might be unconsciously, awaking to a sense of their destiny. This period cannot certainly be classified as mediaeval and many of its achievements directly affect our lives. It is the dawn of the Modern Age.

The history of its rulers bears this out. Babar and Humayun might have followed the tradition of the Sultanate but the Modern Age really begins with Akbar. His mansabdari system was instituted to make the semi-feudal armies unnecessary and bind the nobles more firmly to their king. It dealt a blow to the jagirdar against whom Akbar fought all his life. He also struck at the mediaeval ulema and the old revenue system. Shahjahan might have followed a somewhat mediaeval policy, both ecclesiastical and military, but his was a temporary reaction. Aurangzeb's bigotry, thirst for uniformity and extension of frontiers were no less

modern than those of his contemporary Louis XIV. There is nothing mediaeval about the nationalist aspirations of Sivaji.

We cannot equate the British Period with the Modern Age. It is only a phase of the Modern Period which ended two hundred years later with the British conquest which in its entirety represents only that part which saw the rise of a colonial economy, stultifying the true course of Indian history and leaving behind a legacy of extra-national monopoly capitalism, which is even now showing signs of decay. We are, perhaps, ourselves in a period of transition of supreme unrest, which will be classed by future historians as the beginning of a new period in which liberty in its truer economic and political sense will prevail.

Sports and Presidency College

SURYA KUMAR CHATTERJI¹—Sixth Year Arts.

There is a saying that Presidency College only reads and does not play. And there are people who believe this to be true. But it happens to be a myth. Mythology is a fascinating subject and people can, pertinently, be curious as to how this myth had grown up about a College which had sent out an Abbas and a Ram Bhattacharya in football, a Probir Sen and a Nirmal Chatterji in cricket, and a Dilip Bose in tennis, to mention only a few. Of course we have our limitations but we have our strong points too. A discussion about the place of sports in Presidency College has to deal with the facilities that we have, the way we avail ourselves of them and any possible improvement that may be introduced.

Our elaborately organised sports section is obviously one of our strong points. There is a council of elected representatives from the different classes. It elects its own General-Secretary and sectional secretaries. It is expected of these secretaries that they should know their jobs thoroughly. Otherwise the interest of sports suffers grievously. But these days we find the evil spirit of party politics frequently manages to place men in charge of things for which they have neither aptitude nor enthusiasm. It is up to the students to see that right men go to the right jobs. In the field of sports that is the paramount consideration.

¹ For unavoidable reasons we could not give any report from the Athletic Committee. We hope this article will cover the ground adequately. Sj. Chatterji was the Rowing Secretary (1949-50) and the General Secretary for Athletics (1950-51). He is now a member of the Athletic Committee.—EDITOR.

The facilities that we have are ample. We have our different sections for football, cricket, hockey, tennis, rowing and the small area games. And we possess that wonderful thing that Calcutta Colleges can rarely boast of. We have our own playground. We spend a good portion of our Athletic budget each year to keep the turf of the Baker Laboratory ground in proper shape.

Amongst us football and cricket are the two most popular games. In football we generally manage to do well. We do not win trophies frequently, it is true. But in the Inter-Collegiate Leagues and knock out tournaments we are regarded as a "shock team". Only last year we fought our way up to the final of the Hardinge Birthday Challenge Shield tournament and were the runners-up. In the process we had the measure of such formidable opponents as the Bangabasi and the City Colleges. We do not have any really outstanding players but all this we did through sheer combination and teamspirit.

In cricket, too, for the last few years we have fielded a strong eleven. Our boys take a great deal of interest in this particular game and often in the cricket season crowded borders of the Baker Laboratory ground enigmatically announce the existence of deserted class rooms elsewhere.

In both football and cricket we run our inter-class tournaments which evoke keen interest. The arrangements for practice are competent. But we do wish they would do something to allow us to have some cricket practice during the Puja. The selection of players is generally fair. But, of course, pleasant relations with the powers that be can always tear huge gaps in the defence of fair play.

These days, we regret to note, Presidency College has not a single representative in our university elevens. Our standard is certainly not so bad as to merit this exclusion. We could suggest two other reasons which would explain why we are not there. The University Sports Board wants all the players to be attached to some club or other. This for our students with whom games are merely recreation, is impossible. And of course mere fitness as a player is not the only criterion by which players are selected. This is a rule we find operating everywhere and the 'Varsity Sports Board is, perhaps, no exception.

The standard of hockey has deteriorated sadly. When we were in our Intermediate classes our hockey team simply swept everything before it. There was a particular season when we remained unbeaten throughout. But that was the end of our glory. The hockey season finds our students busy with their examinations and it becomes difficult to interest them. Nevertheless, we noted with satisfaction, our hockey-secretary aroused keen interest by his untiring efforts last season.

Sport lovers of Presidency College literally reeled when at the general meeting of the Athletic Council, last year, it was resolved that the two departments of Tennis and Rowing would be kept in abeyance for

lack of popular support and enthusiasm. Both these sections have fine tradition and rich memory. The fee for tennis is Rs. 10/- a year. This is incredibly low as compared to what one has to pay in the ordinary clubs. It is difficult to believe that it is impossible to get some fifteen people together who would be interested enough to pay this trifle. About the rowing section this step is even more difficult to explain. We are paying an annual sum of a hundred and fifty rupees as registration fee. Is this money going to be wasted? It is true the boys from North Calcutta find it difficult to attend. But has not the South enough of our students to allow us to run this?

Basket ball, revived after a long time in 1950-51, has failed to evoke enthusiasm. Volley-ball and badminton carry on a quiet but nonetheless useful existence. Our annual sports meets are as colourful as ever. On this day the presence and participation of our girls are two very heartening features. Incidentally we can note with justifiable pride the excellent feats of our all round athlete Sri Probir Guha Thakurta in the Inter-Collegiate Sports Meet as well as in the Bengal Olympics.

This we believe is not at all an indifferent record. But of course there is room for improvement. The grant for our sports section can very profitably be increased. We really need it. To give only one illustration of how well the money can be spent we can point out the utility of a Coaching Scheme. Such a scheme if undertaken on an all round basis would prove invaluable. And finally, we should urge our authorities to relax the restrictions recently imposed on the process of admission. If they can not consent to the admission of sportsmen solely on the ground of their proficiency at games, they can surely stop insisting on high first division marks as an absolutely necessary qualification. We have our wonderful team spirit but the presence of a few outstanding performers can make just that difference which would enable us to place our college amongst the leaders in the sports map.

The Alumni Association

1953 has been an eventful year for the Presidency College Alumni Association. There have been a number of social gatherings in true festive atmospheres: a steamer party in March and a play presented by Sri Ramindra Maitra and other members in October (Sri Pratap Chunder Chunder's "Prajapati" in the University Institute Hall) could find even the most careworn of the alumni relaxing.

During the year the Association has gathered strength in many ways. It has now its own office room, and some very good work has been done towards compiling the College old boys' register. The membership figures are rising and they are already in the zone of seven hundred.

*But the Association has also passed through moments of poignant sorrow, when it grieved for the loss of some of its most beloved alumni; and of despair, as when the members followed in helpless anguish those fateful events in distant Kashmir, their vice-president's detention and then, the ultimate tragedy.

Those members whom we have lost during the year we have mentioned below, but the list may not be complete, for sometimes the news may not have reached us. To the departed alumni we offer our tributes of affection and respect.

Sri Hiralal Chakravarty, Sri Nirmal Chunder Chunder, Sri Phanindranath De, Sri Satish Chandra Sinha, Dr. Shyamaprasad Mukherji and Sri Kalyan Kumar Basu.

EDITORS AND SECRETARIES
PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15	PRAMATHA NATH BANERJEE, B.A.
1915-16	MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1916-17	MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1917-18	SAROJ KUMAR DAS, B.A.
1918-19	AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1919-20	MAHMOOD HASSAN, B.A.
1920-21	PHIROZE E. DASTOOR, B.A.
1921-22	SYAMA PRASAD MOOKERJEE, B.A.
1921-22	BRAJAKANTA GUHA, B.A.
1922-23	UMA PRASAD MOOKERJEE
1923-24	SUBODH CHANDRA SEN GUPTA
1924-25	SUBODH CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1925-26	ASIT KRISHNA MUKHERJEE, B.A.
1926-27	HUMAYUN Z. A. KABIR, B.A.
1927-28	HIRENDRA NATH MUKHERJEE, B.A.
1928-29	SUNIT KUMAR INDRA, B.A.
1929-30	TARAKNATH SEN, B.A.
1930-31	BHABATOSH DATTA, B.A.
1931-32	AJIT NATH ROY, B.A.
1932-33	SACHINDRA KUMAR MAJUMDAR, B.A.
1933-34	NIKHILNATH CHAKRAVARTY, B.A.
1934-35	ARDHENDU BAKSI, B.A.
1935-36	KALIDAS LAHIRI, B.A.
1936-37	ASOK MITRA, B.A.
1937-38	BIMAL CHANDRA SINHA, B.A.
1938-39	PRATAP CHANDRA SEN, B.A.
1938-39	NIRMAL CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1939-40	A. Q. M. MAHIUDDIN, B.A.
1940-41	MANILAL BANERJEE, B.A.
1941-42	ARUN BANERJEE, B.A.
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	SUDHINDRANATH GUPTA, B.A.
1948-49	SUBIRKUMAR SEN, B.A.
1949-50	DILIPKUMAR KAR, B.A.
1950-51	KAMALKUMAR GHATAK, B.A.
1951-52	SIPRA SARKAR, B.A.
1952-53	ARUN KUMAR DAS GUPTA, B.A.
1953-54	ASHIN DAS GUPTA, B.A.

Secretaries :

1914-15	JOGESH CHANDRA CHAKRAVARTI, B.A.
1915-16	PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1916-17	PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1917-18	RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A.
1918-19	MAHMOOD HASSAN, B.A.
1919-20	PARAN CHANDRA GANGOLI, B.A.
1920-21	SHYAMA PRASAD MOOKERJEE
1921-22	BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA
1921-22	UMA PRASAD MOOKERJEE
1922-23	AKSHAY KUMAR SIRCAR
1923-24	BIMALA PRASAD MUKHERJEE
1924-25	BIJOY LAL LAHIRI
1926-27	LOKES CHANDRA GUHA ROY
1927-28	SUNIT KUMAR INDRA
1928-29	SYED MAHBUB MURSHED
1929-30	AJIT NATH ROY
1930-31	AJIT NATH ROY
1931-32	NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1932-33	NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1933-34	GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI
1934-35	SUDHIR KUMAR GHOSH
1935-36	PROVAT KUMAR SIRCAR
1936-37	ARUN KUMAR CHANDRA
1937-38	RAM CHANDRA MUKHERJEE
1938-39	ABU SAYEED CHOWDHURY
1939-40	BIMAL CHANDRA DATTA, B.A.
1940-41	PRABHAT PRASUN MODAK, B.A.
1941-42	GOLAM KARIM
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	JIBANLAL DEV
1947-48	NIRMAL KUMAR SARKAR
1948-49	BANGENDU GANGOPADHYAY
1949-50	SOURINDRAMOHAN CHAKRAVARTY
1950-51	MANAS MUKUTMANI
1951-52	KALYAN KUMAR DAS GUPTA
1952-53	JYOTIRMoy PAL CHAUDHURI
1953-54	PRODIP KUMAR DAS.

